ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্য

পুথির তথ্যে আলোচনা

ডঃ সুমঙ্গল রাণা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন)

পরিবেশক :

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান :

বোলপুর পুঁথিঘর

নেতাজী রোড, বোলপুর

বীরভূম

প্রকাশক :
অঞ্জন প্রকাশনী
বোলপুর, বীরভূম

প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

মুদ্রাকর :
বৈদ্যনাথ পাল
শ্রীরাজলক্ষ্মী প্রেস
বোলপুর, বীরভূম

উৎসর্গ

৺পিতৃদেবের পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে ॥

॥ ভূমিকা ॥

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় ষোড়শ শতাব্দী বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। পূর্বের কয়েক শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষায় বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতকেই বাঙ্গালা সাহিত্য তার নিজস্ব গৌরবে বিকশিত হয়েছিল। এই যুগে চৈতন্যের আবির্ভাব ও প্রভাব বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে একটি বিশিষ্ট স্তরে উন্নীত করে। ষোড়শ শতক সম্পর্কে গবেষণার অনেক কাজ ইতিপূর্বে হয়ে গেলেও আরও অনেক কাজ করার সম্ভাবনা ছিল বলেই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। সে অনেকদিনের কথা।

গবেষণা কর্মের সূচনায় আমাদের প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল ছাপানো বই অপেক্ষা হাতে লেখা পুরানো পুথির উৎসে প্রাপ্ত তথ্যের প্রতি অধিকতর নির্ভরশীলতা। পুথি প্রধানতঃ বিশ্বভারতী সংগ্রহের। আরব্ধ কর্মের ফল অচিরেই পাওয়া গিয়েছিল। গবেষণা কর্মের প্রাথমিক স্তরে ষোড়শ শতকের খ্যাতিমান কবিদের অনেক অজ্ঞাত রচনার সন্ধান মেলে। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় সব রচনা সমান মূল্যবান না হলেও বাসু ঘোষ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ, বলরাম দাস, চন্দ্রশেখর, লোচন দাসের মতো খ্যাতিমান কবিদের যে পাঁচশ পদ উদ্ধার করে গ্রন্থের শেষাংশে 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' সংকলিত করে দিয়েছি সেগুলির মূল্য সন্দেহাতীত।

এছাড়া, নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য দ্বিজ মোহনদাসের 'ভক্তমালা' গ্রন্থখানি আমার আবিষ্কার। নাভাজীর ভক্তমাল গ্রন্থের আদর্শে গ্রন্থখানি পরিকল্পিত। বিশ্বভারতী সংগ্রহে ভক্তমালার একাধিক প্রতিলিপি থাকলেও গ্রন্থখানি বোধহয় কোনোদিনই সম্পাদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা যাবে না কারণ ভক্তমালার সম্পূর্ণ প্রতিলিপিটির পাতা আংশিকভাবে প্রায় অর্ধাংশ (আড়াআড়ি ভাবে) পোকায় কেটে শেষ করে দিয়েছে। অন্যগুলি নিতান্তই অল্প পাতার খণ্ডিত প্রতিলিপি। সাহিত্য পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সুবিশাল মোক্ষদা সংগ্রহে অনুসন্ধান করে ভক্তমালার আর কোনো প্রতিলিপি পাই নি। সে যাই হোক, ভক্তমালা ও দ্বিজমোহন দাস বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাতপূর্ব।

শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য বেগুনকোলা নিবাসী যদুনন্দন দাসের 'সংগ্রহতোষণী' গ্রন্থ-সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে মন্তব্য করেছিলেন—"পুথি একে অর্বাচীন তায় নিরুদ্দেশ; সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলা চলে না।" অথচ 'সংগ্রহতোষণী'র পুথি বিশ্বভারতী সংগ্রহে রয়েছে; সে পুথি নিয়ে আমি কাজ করেছি। 'সংগ্রহ তোষণী'র সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বীরভূম বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে। পুথিটি বীরভূমেরই। সংগ্রহতোষণী সম্পর্কে সহজিয়া-জনবর শুনেছি কিন্তু গ্রন্থখানি শ্রীরূপ গোস্বামীর অমৃততোষণী গ্রন্থের আদর্শে পরিকল্পিত। এই সংগ্রহতোষণীর সূত্রেই হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। আমার গবেষণার কাজে তিনি অনেক পরামর্শ দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক ডঃ ভূদেব চৌধুরী তখন সদ্য প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এসে বিশ্ব-ভারতীতে বাংলা বিভাগে যোগ দিয়েছেন। আমার গবেষণার নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি; কারণ তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম ঐতিহাসিক এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ।

আমার গবেষণার কাজ সম্পন্ন হয় ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে। তাঁরই পরামর্শে আমার গবেষণা নিবন্ধের আদ্যন্ত ডঃ নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী (গোঁসাইজী) কে শুনিয়ে তাঁর মতামত এবং পরামর্শ গ্রহণ করেছি। তিনি তখন পি. এম. হাসপাতালে রোগশয্যায় পক্ষাঘাতে উত্থানশক্তিরহিত কিন্তু স্মৃতিশক্তি তখনও প্রখর ছিল। তিনিই আমাকে বলেছিলেন অদ্বৈত আচার্যের নামে প্রচলিত—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করুণা সাগর

দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর। পদটি মূলে ছিল সংস্কৃত।

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের পরামর্শে গ্রাম পর্যটন করে তথ্যানুসন্ধান করার বিপুল শ্রমসাধ্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়েছিল। ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করেন। এই কাজে যাঁরা সহায়তা করেছিলেন তাঁদের নাম যথাস্থানে দিয়েছি। সব মিলিয়ে খুব আনন্দের সঙ্গে কাজ করেছিলাম। অর্থানুকূল্য ছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউ. জি সি-র।

গ্রন্থ প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি বিভাগের অধ্যাপকদের। এঁরা আমার শিক্ষক ও সহকর্মী। এই উপলক্ষে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

আমার গবেষণা নিবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। মৌখিক পরীক্ষার সময় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তিনি ইহলোকে নাই। গ্রন্থ প্রকাশের লগ্নে শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রতি প্রণতি নিবেদন করি। শ্রীমান্ শ্রীমন্ত রাণার নামও গ্রন্থে যুক্ত হলো। মুদ্রণপ্রমাদ অনেকই থেকে গেল। চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

সুমঙ্গল রাণা
বাংলা বিভাগ
বিদ্যাভবন
বিশ্বভারতী

৩০শে আষাঢ়, ১৩৫৯
রথযাত্রা

॥ বিষয় সূচী ॥

সংকেত পঞ্জী

অ. প্র প র—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী

ক ক. চ—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

গো বি—গোপাল বিজয়

গৌ বৈ সা—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা

গৌ বৈ. সা—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য

গৌ প. ত—গৌরপদতরঙ্গিণী

গৌ. বি—গৌরাঙ্গবিজয়

চি. প. স—চিঠিপত্রে সমাজচিত্র

চৈ. ভা—চৈতন্যভাগবত

চৈ. চ—চৈতন্যচরিতামৃত

চৈ. ম—চৈতন্যমঙ্গল

চৈ. প—চৈতন্যপরিকর

চৈ. চ. উ—চৈতন্যচরিতের উপাদান

প. ক. ত—পদকল্পতরু

প. ব. স—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

বা. সা. ই বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

বা. দে. ই—বাংলা দেশের ইতিহাস

বা. ই—বাঙালীর ইতিহাস

বা. বৈ. ধ—বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম

বা সা. অ—বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান

বি. ভা. পু—বিশ্বভারতী পুথি

ভ. র—ভক্তিরত্নাকর

ভা. উ. স—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়

ম. বা—মধ্যযুগে বাঙ্গালা

ম. বা. বা—মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী

শা. নি—শাখানির্ণয়

ক্ষণদা—ক্ষণদাগীতচিন্তামনি

হি ব্র. লি—হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটারেচার

C. C.—Chaitanya and his Companions

H. B. L—History of Brajabuli Literature

H. V. M. B—History of Vaisnava movement in Bengal

P. C. S. C—Post Chaitanya Sahaji Cult.

॥ সূচনা ॥

কাল নিরবচ্ছিন্ন। বুদ্ধিমান মানুষ বিশ্লেষণ করে বোঝাবার জন্য 'শতাব্দী'-এককে বিভক্ত করেছে। আমার আলোচ্য বিষয় ষোড়শ শতকের সমাজ ও সাহিত্য। অখণ্ডকালের পরিপ্রেক্ষিতে এইরকম যুগবিভাগ অর্থহীন; কিন্তু আলোচনার সৌকর্যের জন্য এইরকম যুগবিভাগ না ক'রে উপায় নাই। বাঙ্গালাদেশের ষোড়শ-শতক এই দৃষ্টিতে কোনো বিচ্ছিন্ন কাল-বিভাজনের মধ্যে পড়ে না। বাঙ্গালীর-স্থিতবস্থ সমাজ তুর্কী-আক্রমণের পর থেকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়েছিল। কিন্তু তার আদর্শগত ধর্মপ্রেরণা এবং সাহিত্যসৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় নাই। তবে তুলনায় শতাব্দক্রমে তার তারতম্য অনস্বীকার্য। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী-আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলে উঠে পঞ্চদশ শতক থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যসৃষ্টির সূচনা এবং পরবর্তী শতাব্দীতে তার চরম পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। সহস্র বছর পরিব্যাপ্ত ক'রে বিভিন্ন শতাব্দীতে বাঙ্গালীর সাহিত্যসৃষ্টির দিগন্তে উত্থান-পতন ঘটতে থাকলেও বাঙ্গালীর মৌলিক ধর্মবোধ ও সাহিত্যচিন্তা অব্যাহত থেকে গেছে। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এবং প্রভাবে বাঙ্গালাদেশে যে ব্যাপক গণ-জাগরণ ঘটেছিল তার ফলে এই সময়ে বাঙ্গালাদেশ যেন তার সাহিত্য-সৃষ্টির উত্তুঙ্গসীমা স্পর্শ করে। আমার আলোচনা মূলতঃ বাঙ্গালাদেশের এই ষোড়শ শতকের বাঙ্গালী সমাজের ধর্মবোধ ও সাহিত্য চেতনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো।

॥ রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষাপট ॥

যেকোনো দেশের যেকোনো সময়ের সমাজ ও সাহিত্য আলোচনা করতে হলে সেই দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমির পরিচয় জানা অত্যাবশ্যক। প্রাচীন ভারতে সমাজ-ব্যবস্থাই ছিল প্রধান বিষয়। রাজা ছিলেন সমাজ-রক্ষক; গণতান্ত্রিক ভিত্তিতেই রাষ্ট্র-কাঠামোর রূপ ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারে বারে পরিলক্ষিত হয়। সেকালে রাজা যেমন ছিলেন সমাজরক্ষক, তেমনি সাহিত্যসাধনার পৃষ্ঠপোষক।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কী অভিযানের ফলে এ দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের রংবদল হ'লো। এই তুর্কী বিজয়ের কারণ বাঙ্গালীর বীর্যহীনতা অথবা গণশক্তির সংঘবদ্ধতার অভাব বা বাহুবল অপেক্ষা দৈববলের উপর ঐকান্তিক নির্ভরশীলতা[১] যাইহোক্ না কেন, এর ফলে বাঙ্গালার সাংস্কৃতিক জীবনের দিক্‌পরিবর্তন সূচিত হ'লো এবং তার প্রতিক্রিয়া রাজনীতির সীমিত গণ্ডী অতিক্রম ক'রে প্রতিফলিত হ'লো বাঙ্গালীর ধর্মীয় জীবনে এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে। 'তুর্কানা তরীকার' অনুসরণে হিন্দুর ধর্মীয় পীঠস্থান দেবমন্দির ধ্বংস ক'রে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ঘটানো এবং 'সুফীয়ানা' পদ্ধতিতে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ছিল—বিজেতা তুর্কীদের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী। তাদের কর্মসূচির সাফল্যের অসংখ্য প্রমাণ মেলে বিভিন্ন সূত্র থেকে; আর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী নিশ্চেষ্টতা এবং নীরবতা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভাতুড়িয়া অঞ্চলের একজন শক্তিমান ভূস্বামী রাজা গণেশ (প্রথম দফায় ৮১৮ হিজরী বা ১৪১৫ খ্রীঃ এবং দ্বিতীয় দফায় ৮২০-২১ হিজরী বা ১৪১৭-১৮ খ্রীঃ) নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান শক্তির উচ্ছেদ সাধন ক'রে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজনীতির কুটিল চক্রে তাঁর এই বিজয় দীর্ঘস্থায়ী না হলেও নির্বাণোন্মুখ প্রদীপশিখার এই অত্যুজ্জ্বল আলোকপ্রভা ইতিহাসের ধারায় বিশেষ মূল্যবান। এইসময় সাময়িকভাবে দেশে অরাজকতার অশান্তি বিদূরিত হয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি পোষণের অনুকূল আবহাওয়া দেখা দেয়। মহিন্তাপনীয় বৃহস্পতিমিশ্র গণেশের পুত্র জালালুদ্দিনের রাজসভায় বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন।[২] জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ (৮২১-৩৮ হিজরী—১৪১৮-১৪৩৩ খ্রীঃ) ছিলেন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজপুরুষ। মুসলমানশক্তির সঙ্গে আপস-রফা করেই তিনি আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। এঁর মৃত্যুর পর এঁর পুত্র শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহ তিন বছর রাজত্ব করেন (৮৩৬-৮৩৯ হিজরী বা ১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ—১৪৩৪-৩৫ খ্রীঃ)। এঁর মৃত্যুতে রাজা গণেশের বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে।

---

১ দ্র. ম. বা. বা. পৃ—১

২ বিস্তৃত আলোচনা দ্র. ম. বা. বা. পৃ—১০-১৩

অতঃপর বাঙ্গালাদেশের ভাগ্যনিয়ন্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন—মাহ্‌মুদ শাহী রাজবংশ। নাসিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ (৮৩৯-৬২ হিজরী বা ১৪৩৬-৫৯ খ্রীঃ) রুকনুদ্দিন-বারবাক-শাহ (৮৬০-৮৮০ হিজরী বা ১৪৫৫-১৪৭৬ খ্রীঃ) শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্ (৮৭৯-৮৮৫ হিজরী বা ১৪৭৪-৮০ খ্রীঃ), সিকন্দর (৮৮৫-৮৬ হিজরী বা ১৪৮০-৮১ খ্রীঃ জালালুদ্দিন-ফতেশাহ্ (৮৮৬-৮৯২ হিজরী বা ১৪৮১-৮৭ খ্রীঃ)—প্রমুখ পাঁচজন শাসক বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করেন। এই সময়ে দেশে মোটামুটিভাবে সংস্কৃতিচর্চার অনুকূল অবস্থার অপ্রতুলতা ঘটেনি। এঁদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা উদারতা শিল্পপ্রীতি সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণ—ইত্যাদি নানা সদ্‌গুণের অল্পবিস্তর সমাবেশ ঘটায় দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং দেশ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়-প্রণেতা কুলীনগ্রামের মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধিদান ইত্যাদি নানা সংকীর্তির দ্বারা মাহ্‌মুদশাহী রাজবংশ ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার ক'রে আছে।

॥ আবিসিনিয় অধিকার ॥ ফতেহ্‌শাহের রাজত্বকালে ক্ষমতাধিষ্ঠিত আবিসিনিয়েরা অত্যাচারী হয়ে উঠলে তিনি তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন এবং তাদের ক্রূর ষড়যন্ত্রে নিহত হন। ফলে বঙ্গে আবিসিনিয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বাঙ্গালীর জীবনে চরম দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। ১৪৮৭-৯৩ খৃঃ পর্যন্ত বাঙ্গালায় আবিসিনিয় শাসন বলবৎ ছিল। এই সময়ের মধ্যে চারজন আবিসিনিয় সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁদের মধ্যে ফিরুজশাহ্ (৮৯২-৯৫ হিজরী বা ১৪৮৭-৯০ খৃঃ) ছাড়া প্রত্যেকেই ছিলেন কমবেশি অত্যাচারী এবং সেমেটিক্ রণোন্মাদনায় দুর্দান্ত প্রকৃতির।

॥ হুসেনশাহী আমল ॥ খৃঃ ১৪৯৩ সৈয়দ হুসেনশাহ গৌড়েশ্বর রূপে সিংহাসনে আরোহণ করলে বাঙ্গালা দেশ থেকে একটি রক্ত-কলঙ্কিত রাজবংশের অবসান ঘটে। হাবসী অরাজকতা দমন ক'রে দেশে শান্তি স্থাপন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষণ—এঁর রাজত্বকালে দু'টি প্রধান ঘটনা। হুসেনশাহী আমলে (৮৯৮-৯২৫ হিজরী বা ১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) অবরুদ্ধ সামাজিক প্রগতির স্রোত পুনরায় গতিশীল হয়।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব (খৃঃ ১৪৮৬) এই সময়কার বাঙ্গালার ইতিহাসে সর্বপ্রধান ঘটনা। চৈতন্যপ্রভাবে সাহিত্যের নব নব শাখার অভ্যুদয়ে বাঙ্গালাসাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করে। বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, শিক্ষা

ও সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ—ইত্যাদি নানা সদ্‌গুণে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ সমকালীন সাহিত্যে সম্মানজনক আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন।[১] দেশীয় প্রশাসনে, সামরিক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে বাঙ্গালী কর্মচারী নিয়োগ তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির আর একটি দিক।[২]

হুসেন শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরৎ শাহ্‌ (৯২৫-৩৮ হিজরী বা খৃঃ ১৫১৯-৩২) সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মতো তিনিও উদার মনোভাবাপন্ন, বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। মহাভারতের প্রাচীনতম অনুবাদ এঁর উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়েছিল বলে কথিত আছে। চট্টগ্রামের জনৈক রাজকর্মচারী ছুটি-খানের সঙ্গেও হৃদ্যতা ছিল এঁর যথেষ্ট। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের অনুবাদ এঁদের বদান্যতায় সম্ভবপর হয়েছিল। প্রখ্যাত কবি কবিরঞ্জন ছিলেন এঁর দরবারে পদস্থ কর্মচারী। কবিরাজ শ্রীধরের 'কালিকামঙ্গল' এই সময়ে রচিত হয়।

নসরৎ শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্‌ (৯৩৮-৩৯ হিজরী বা ১৫৩২-৩৩ খৃঃ) পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর হুসেন শাহের অন্যতম পুত্র গিয়াসুদ্দিন মুহম্মদ শাহ (৯৩৯-৪৫ হিজরী বা খৃঃ ১৫৩৩-৩৮) পাঁচ বছর রাজত্ব করেন।

॥ **সুর ও কররানী সুলতানগণের অধীনে বাঙ্গালা** ॥ ১৫৩৯ খৃস্টাব্দের শেষদিকে শেরশাহ্‌ বাঙ্গালাকে দিল্লীর সম্রাটের অধীনে আনয়ন করেন। কিন্তু মাত্র তাঁর পাঁচ বছরের রাজত্বকাল বাঙ্গালাদেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ভাগ্যাকাশে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।

বাঙ্গালাদেশে প্রেরিত মুঘল প্রতিনিধি মহম্মদ খাঁ সুর (খৃঃ ১৫৩৭) অবস্থা বুঝে বাঙ্গালার স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে উপাধি গ্রহণ করেন—শমস্‌উদ্দীন

১ বিজয়গুপ্তের কাব্যে—সুলতান হুসেন শাহা নৃপতি-তিলক।
যশোরাজ খানের পদে—শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ
কবিচন্দ্রের গৌরীমঙ্গলে—নৃপতি হুসেন শাহা কলিযুগে রাম।

২ গৌড় দরবারে 'দবীর খাস' (একান্ত সচিব) রূপে সনাতন গোস্বামী এবং 'সাগীর মালেক' (ছোটো মালিক) রূপে রূপ গোস্বামীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লস্কর রামচন্দ্র খান রাজ্যের দক্ষিণ ভূভাগের অধিকারী ছিলেন। কেশবছত্রী গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মহম্মদ শাহ (খৃঃ ১৫৫৩-৫৪)। ইতিহাসে তিনি এই নামেই পরিচিত। অতঃপর গিয়াসউদ্দীন বহাদর শাহ্ (১৫৫৪-৬০ খ্রীঃ), গিয়াসউদ্দিন জালাল শাহ্ (১৫৬০-৬৩ খ্রীঃ) প্রমুখ শাসকগণ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁদের রাজত্বকাল যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘনঘটাপূর্ণ এবং এর প্রভাব জনজীবনে যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সাহিত্যে তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।

এই সময়ে কামতা-কোচবিহারে বিশ্বসিংহ শুক্লধ্বজ. চিলারায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এঁদের রাজসভায় আশ্রিত কবি পণ্ডিতদের দিয়ে ভাগবত ও মহাভারতের অনুবাদ হয়েছিল বিশেষভাবে। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের মল্লরাজাও ছিল স্বাধীনকল্প। এই দুই রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা বহুদিন যাবৎ অক্ষুণ্ণ ছিল।

কর্‌রানী বংশের অন্যতম প্রধান শাসক সুলেমান কর্‌রানীর রাজত্ব-কালের (খৃঃ ১৫৬৫-৭২) প্রধান ঘটনা উৎকল অভিযান। সেখানকার বহু দেবমন্দির ধ্বংস সাধন এবং স্বর্ণনির্মিত দেববিগ্রহ অপহরণ সমগ্র দেশে আতঙ্কের সঞ্চার করে।

এই রাজবংশের শেষ নরপতি দাউদ শাহের (খৃঃ ১৫৭২-৭৬) সঙ্গে স্বয়ং আকবরের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয়েছিল। যুদ্ধ বাধে হাজীপুর (পাটনা), সুরজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর. কহলগাঁও এবং গুপ্ত তেলিয়াগড়ি গিরিপথে। রাজমহলের স্থানীয় ভূস্বামীদের সহায়তায় মুঘল সেনাপতি মুনিম খাঁ তান্ডা দখল করেন।

।। **বাঙ্গালা দেশে মুঘল অধিকার** ।। খৃঃ ১৫৭৫ ৩রা মার্চ মুনিম খানের দ্বারা দাউদ কররানীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাদেশে মুঘল শাসনের সূত্রপাত হয় কিন্তু কার্যতঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সময় লেগেছিল অনেক। কারণ পাঠান জায়গীরদাররা তাদের কায়েমী স্বার্থ সহজে ছাড়ে নাই। পাঠান জমিদারদের ভাগ্যের সঙ্গে বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দুর (বিশেষতঃ পাঠান দরবারের কর্মচারী ও ইজারাদারদের) ভাগ্যসূত্র গ্রথিত ছিল। এরা কেউ-ই মুঘল শাসন বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করেনি। তাই গৌড়ে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আত্মকাহিনী অংশে এই নৈরাজ্যকালের দক্ষিণ-রাঢের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। মতান্তরে, এইরূপ ঘটনা স্থানীয় এবং বিক্ষিপ্ত; ইতিহাসের সঙ্গে তার

বিশেষ যোগ ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দের প্রথমদিকে রচিত ধর্মমঙ্গলকার রূপরাম চক্রবর্তীর আত্মকাহিনী থেকেও পাঠান-মোগল সংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সে হ'লো শাহ্ সুজার অধীনস্থ বর্ধমানের ফৌজদার 'খালিপে হাকিমের' দক্ষিণ মুলুকে পাঠানদের পরাজিত করতে গিয়ে পরাজয় বরণের কাহিনী।[১]

রাজপ্রতিনিধি মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্তা হয়ে আসেন ১৫৯৪ খৃস্টাব্দের ৪ঠা মে। মুকুন্দরামের কাব্যে এঁর উল্লেখ রয়েছে 'গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ' রূপে। মানসিংহের সময় বাঙ্গালা ছিল অশান্ত। একদিকে মোগল-অসহিষ্ণু বারভূঞাগণ বাঙ্গালাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে অধিকার বিস্তার করেছিল অন্যদিকে আফগান শাসনের পরিশিষ্টরূপে আফগান-প্রধানদের দ্বারাও দেশের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল। মানসিংহের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছিল বিদ্রোহ দমন ও যুদ্ধবিগ্রহে।

রাজা টোডরমল্লের নবপ্রবর্তিত রাজস্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী বাঙ্গালা, বিহার ও ওড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'সুবে বাঙ্গালা'। এই সুবে বাঙ্গালা আবার বিভক্ত হয়েছিল কয়েকটি সরকারে। সরকারগুলি ভাগ করা হয়েছিল পরগনায়। সুলেমানাবাদ (মুকুন্দরামের কাব্যে 'সিলিমাবাজ' রূপে উল্লিখিত) এই রকম একটি পরগনা। কবির নিবাস-গ্রাম দামিণ্যার তালুকদার প্রজাবৎসল গোপীনাথ নিয়োগী ছিলেন এই সেলিমাবাদের অধিবাসী। কিন্তু সেকালের পাঠান ডিহিদারের একজন হিন্দুর এই প্রজাবাৎসল্য ও সজ্জনতা সহ্য হয় নাই। তাই তাঁকে বিপাকে বন্দী করা হয়েছিল। এঁর তালুকে দীর্ঘ ছ-সাত পুরুষ ধরে কবির পূর্বপুরুষগণ চাষ-আবাদ করে নিরুপদ্রবে জীবন যাপন করছিলেন। মানসিংহ তখন 'গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ'। কিন্তু অধীনস্থ কর্মচারীরা প্রকৃত শাসকের আসন অধিকার করে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছে। তাদের কবল থেকে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ক্ষত্রিয় ব্যাপারী কেউই নিস্তার পায়নি। সমাজ তখন দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ। সাধারণ গৃহস্থেরাও পরস্পরকে প্রতারিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।[১] ফলে জাতীয় নৈতিক মেরুদণ্ড এবং নীতিবোধ রসাতলগত।

১ রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা। পরম কল্যাণে যত আছিল ত প্রজা।
বর্ধমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম। তার পরাজয় হইল দক্ষিণে মহিম॥
রূপরামের ধর্মমঙ্গল—পৃ-২১

কবিকঙ্কণের কাব্যে বর্ণিত সামাজিক অশান্তি ও রাজশক্তির অত্যাচারের যে বর্ণনা পাওয়া যায়[১] তা স্থানীয় অত্যাচারের বিক্ষিপ্ত কাহিনী হলেও দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক অশান্ত ঝঞ্ঝার আভাস এতে আছে। দেশের রাজশক্তি যখন অনিশ্চয়তার সম্মুখীন তখন প্রজার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ না থাকাই স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যত্র কালকেতু কর্তৃক গুজরাট নগর-পত্তনের বর্ণনা[২] থেকে অনেকে 'আত্মকাহিনী'তে বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, দেশ যখন অশান্ত তখন এই রকম একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা-মাফিক নগরপত্তন ও শান্ত-সুস্থ জীবনযাত্রার বর্ণনা কেমন করে সম্ভব। এর উত্তরে বলা যায়, অত্যাচারিত ও অশান্ত কবিচিত্ত যখন রঘুনাথ রায়ের নিশ্চিত আশ্রয়ে শান্তিলাভ করেছিল সেই সময়কার রচিত কাব্যে একদিকে অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব অত্যাচারের বর্ণনা অন্যদিকে আগামীদিনের একটী সুষ্ঠু ও সুখী সমাজ-জীবনের পরিকল্পনা কবিচিত্তে প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব নয়।[৩]

॥ সাহিত্যচর্চা ॥

সমাজ এবং সাহিত্য পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। সাহিত্য সমাজের চিন্তাধারার বাণীরূপ দান করে, পক্ষান্তরে সমাজ সাহিত্যকে ধারণ করে এবং লালন করে। এই শাশ্বত রীতির প্রকাশ বাঙ্গালা সাহিত্যের উদয়-লগ্ন থেকেই পরিলক্ষিত হয়।

সাহিত্যের মূলতঃ দুটি ধারা—ধ্রুপদী ও লৌকিক। পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রবাহিত হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি ধারায় (১) পদাবলী বা গেয় গীতিকবিতা (২) পাঁচালী বা গেয় গাথাকাব্য এবং (৩) সন্দর্ভ বা পাঠ্যনিবন্ধ।

ধ্রুপদী সাহিত্য অর্থে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য নয়; শিষ্টজনের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট সাহিত্য সাধারণভাবে এই পর্যায়ে পড়ে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে প্রধানতঃ তা রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায়

১ ক. ক.চ —পৃ—৬-৭

২ ঐ--পৃ-৭৯, ৮ -৯০

৩ এই অনুচ্ছেদ রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থ থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

a) History of Bengal b) History of Bengal Suba c) বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর।

বিকাশ লাভ করে। লৌকিকধারার পাঁচালীকাব্য ধর্মীয় ছড়া ইত্যাদির চর্চা চলে রাজসভার বাইরে, সমাজের মুক্তঅঙ্গনে।

দ্বাদশ শতকে যাঁদের হাতে শিষ্টসাহিত্য সৃষ্টি নির্ভর করতো তাঁরা ছিলেন প্রধানতঃ সংস্কৃত পণ্ডিত এবং অধিকাংশক্ষেত্রে রাজসভার দাক্ষিণ্যপুষ্ট। তুর্কী আক্রমণের ফলে এঁরা বিপন্ন হলেন সবচেয়ে বেশি। দেশীয় স্বাধীন রাজগণের অবলুপ্তি ঘটলে রাজপুষ্ট কবি-পণ্ডিতদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘনিয়ে এলো। ফলে সাহিত্যচর্চা বিঘ্নিত হলো; দেশত্যাগ করলেন অনেকে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই দেখা যায় প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতা। চতুর্দশশতকের শেষদিকে ইলিয়াসশাহী বংশের রাজ্যকাল থেকে এদেশে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যানুশীলনের পুনরারম্ভ হয়। সেইজন্য বিশেষজ্ঞগণ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেই বাংলাসাহিত্যের প্রকৃত আরম্ভ বলে মনে করেন।[১] এইসময়ে ভাগবত মহাভারত ও পুরাণের বিভিন্ন আখ্যায়িকার অনুবাদ প্রধানতঃ রাজসভার আশ্রয়েই হয়েছিল।

লোকায়ত সাহিত্যের মধ্যে প্রধানতঃ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা মঙ্গলচণ্ডীর গীত, শিবের গীত, ধর্মমঙ্গল, যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত এবং রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনী লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর্যেতর ধর্ম-বিশ্বাস ও সংস্কার এই সাহিত্যের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছে।[২]

লৌকিক সাহিত্যের ভাষা অবহট্‌ঠ যেমন সমগ্র উত্তরাপথে—গুজরাট থেকে আসাম পর্যন্ত প্রায় একই রূপে অনুশীলিত হয়েছিল, সেই রকম আসাম ওড়িষ্যা মিথিলা প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাহিত্যও একই দিকে সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। বাঙ্গালাদেশের সঙ্গে উক্ত রাজ্যগুলির সাংস্কৃতিক সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ ছিল বহু পূর্ব থেকে।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি ওড়িয়াকবি সারলাদাসের মহাভারতের অনুবাদ এদেশেও বিশেষভাবে প্রচার লাভ করে। এই সময়ে ওড়িয়াসাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করে। ওড়িয়াকবি বলরামদাস দাণ্ডি-রামায়ণ, অমর-কোষ গীতা, গুপ্তগীতা, জগন্নাথ দাস ভাগবতের অনুবাদ ক'রে ওড়িয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

---

১ বা. সা. ই—পৃ-৭৯, ৪

২ ,, —পৃ-৬৪

পুরুষপুর থেকে কামরূপ পর্যন্ত—আর্যাবর্তের বিশাল ভূখণ্ড যখন মুসলমান অধিকৃত তখনও গঙ্গা-কৌশিকী-গণ্ডকী রেখায় সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র তীরভুক্তি রাজ্য স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছিল সগৌরবে। মিথিলার এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার সহায়ক হয়েছিল। কর্ণাটক বংশের রাজত্বকাল মিথিলায় বিদ্যাচর্চার গৌরবময় যুগ। এদেশে স্মৃতি ও নব্যন্যায় চর্চার ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। কবিশেখরাচার্য-জ্যোতিরিশ্বরের 'বর্ণন রত্নাকর' গ্রন্থখানির খ্যাতি ছিল সুদূরপ্রসারী। ভবদত্তের নৈষধ চরিতের টীকা, শ্রীকরআচার্যের অমরকোষের ব্যাখ্যামৃত টীকা, পৃথ্বীশ্বর আচার্যের মৃচ্ছকটিকের টীকা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি।

কামতা রাজসভার সাহিত্যপ্রীতি বাঙ্গালার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। গৌড়-দরবারের মতো সাহিত্য রচনায় উৎসাহ প্রদান, কবিগণের পোষকতা কামতা রাজগণের একটি সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়েছিল। ফলে সেকালে কামতা-কোচবিহার-কামরূপ উত্তর-পূর্ববঙ্গের সাহিত্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

পঞ্চদশ শতকে শ্রীমহামাণিক্যের পোষকতায় মাধবকন্দলী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড অনুবাদ করেন। কবিরত্ন সরস্বতী দ্রোণপর্বের অন্তর্গত 'জয়দ্রথ বধ' রচনা করেন রাজা দুর্লভনারায়ণের উৎসাহে। শ্রীমৎ তাম্রধ্বজের আমলে রুদ্রকন্দলি দ্রোণপর্বের সাত্যকিপ্রবেশ' রচনা সমাপ্ত করেন।

ষোড়শ শতকে শ্রীমন্ত-শঙ্করদেবের সমসাময়িক পীতাম্বর ভাগবত-পুরাণের দশম স্কন্দ, ঊষা-পরিণয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণ (চণ্ডী আখ্যান), নলদময়ন্তী উপাখ্যান রচনা করেন রাজা সমরসিংহের রাজসভায়। বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'দ্বিজ পীতাম্বর' ভণিতায় শ্রীগীতগোবিন্দের 'চন্দোদয় টীকা'র একখানি পুথি আছে। এই দ্বিজপীতাম্বর আলোচ্য কবি হতে পারেন।[১]

রাজা বিশ্বসিংহের (রাজ্যকাল ১৫৫২-৫৪ খৃঃ) আশ্রয়ে দুর্গাবর-কায়স্থ পদ্মা বা মনসাপুরাণ রচনা করেন। 'গীতি রামায়ণ' গ্রন্থখানিও এঁর রচনা বলে অনেকে মনে করেন। নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ আসামে প্রচারিত ও ভাষান্তরিত হয়েছিল এই সময়ে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আসাম-মণিপুর অঞ্চলে মনসা Mārai দেবীরূপে খাসী, মণিপুরি মিস্‌মী, হাজাং প্রভৃতি উপজাতিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পূজিতা। রাজা জল্লেশ্বরের আমলে

১. এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

মনকর নামে একজন কবি পদ্মাপুরাণ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। এঁদের কাব্য আজও এই অঞ্চলে 'ওজাপালী'দের দ্বারা গীত হয় মহা-সমারোহে।

আসামে বৈষ্ণবতার অনুপ্রবেশ ঘটে শ্রীমন্ত শংকরদেবের সময় (১৪৪৯-১৫৬৯ খৃঃ) থেকে। পদাবলী (কীর্তন ঘোষা), সংস্কৃত ভক্তিরত্নাকর নামক একটি পদসংকলন গ্রন্থ এবং কালীদমন, কেলিগোপাল প্রভৃতি অঙ্কিয়া নাট রচনা করে ইনি অসমীয়া সাহিত্যে বৈষ্ণবীয় ধারার সংযোজন করেন।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এলো নবজাগরণ। নবপ্রবর্তিত ভক্তিধর্মের প্রভাবে নবগঠিত বাঙ্গালী জাতি অখণ্ডরূপ গ্রহণ করলো। বাংলাসাহিত্যের দিকপরিবর্তন সূচিত হ'লো। বৈষ্ণব গীতিকবিতার অসাধারণ সমুন্নতি ছাড়াও পূর্বাপর প্রচলিত দেবকাহিনীর পাশাপাশি দেবকল্প মানবচরিত্রও সাহিত্যের অঙ্গীভূত হ'লো এবং বাঙ্গালাসাহিত্য নানা ধারায় পল্লবিত হয়ে পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। অবাঙ্গালী কবিগণও বাঙ্গালা সাহিত্যের উদার অঙ্গণে তাঁদের সৃজনবৃত্তির বিকাশ ঘটালেন। বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়াও ঐতিহাসিক রোমান্টিক প্রণয়গাথা যোগসাধনার সূত্রে গ্রথিত ক'রে ফারসী রোমান্সের রীতিতে উচ্চাঙ্গের কাব্য সৃষ্টি হ'লো। মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ বা পদ্মাবতী (১৫৪০ খৃঃ) রচনার পূর্বে কবি কুতবন গৌড়ের সুলতানের আশ্রয়ে মৃগাবতী রচনা করেন (১৫০৩ খৃঃ) অবধী ভাষায়। পরবর্তিকালে আরাকান রাজসভার মুসলমান অমাত্য ও কর্মচারীদের দ্বারাও অনেক বিদেশী কাহিনী বাঙ্গালা কাব্যরূপ পায়।

দরবারী পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক প্রণয়মূলক বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বন ক'রে কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়েছিল এই সময় থেকেই। এই কাহিনীর প্রথম কবি শ্রীধর-কবিরাজ সুলতান নসরৎ-সাহের পুত্র যুবরাজ ফিরুজশাহের অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন। বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা শা-বিরিদ-খাঁ ও সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন।

আলোচনায় দেখা গেল, এই সময়ে সমগ্র পূর্বভারতে সংস্কৃতি চর্চার ঐক্যসূত্রে সমাজ-জীবন সুস্থির ও সুসংহত রূপ ধারণ করেছিল এবং সাহিত্য চর্চাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপন প্রবাহ পথ অব্যাহত রেখে বিভিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়ে চলেছিল।

মুসলমান সমাজ ঃ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

ভারতবর্ষের পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশে নদীবহুল বাঙ্গালার পলিমৃত্তিকাযুক্ত অববাহিকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে মানব সভ্যতার উদয় হয়েছিল ইতিহাসের সুদীর্ঘ পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ অতিক্রম ক'রে তা বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এদেশে বিভিন্ন জাতির সমাগম হয়েছে আবহমান কাল থেকে। তাদের মধ্যে অনেক জাতিই ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার আদিম অধিবাসীগণের সঙ্গে তাদের প্রবল বিরোধের সৃষ্টি হয় নাই। পরস্পর আদান-প্রদানের ভিত্তিতে দুই পরস্পর বিরোধী সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হয়েছে অত্যাশ্চর্যভাবে। বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস সমন্বয় সাধনার ইতিহাস।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী অভিযান বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে এসে পড়েছিল আকস্মিক দুর্যোগের মতো। পশ্চিম ইওরোপের ফরাসী ও জার্মান জাতীয় খৃষ্টান crusader বা ধর্মযোদ্ধাদের মতো তুর্কীরাও নিজেদের মনে করতো আল্লার নির্বাচিত সেনা। 'কাফের' হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ, লুঠতরাজ, হত্যা, মন্দির ও বিগ্রহাদি ধ্বংস ক'রে হিন্দু জাতিকে বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করাই যেন ছিল তাদের জীবনের ব্রত। বাঙ্গালী স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ জাতি। তাই দেবপীঠস্থান গুলি ধ্বংস করে হিন্দুকে সহজে বিপর্যস্ত করার নীতি তারা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সর্বত্র এই নীতি ফলপ্রসূ হয় নাই। এ যুগের একজন ঐতিহাসিক অধ্যাপক হবীব দেখিয়েছেন, 'বুত শকন' অর্থাৎ মূর্তি ভঙ্গকারী জাতির প্রতিভূ সুলতান মাহ্‌মূদের আচরিত এই 'তুর্কানা' পদ্ধতিতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল; বরঞ্চ তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ক্রমে তুর্কীরা উপলব্ধি করে 'তুর্কানা তরীকা' অনুসারে লুটপাট হত্যা ও ধ্বংসের পথ ভ্রান্ত। ভিন্নতর এক পথের সন্ধান পাওয়া যায়—সে পথ শান্তির পথ। সহানুভূতির দৃষ্টিতে জনগণকে আকৃষ্ট ক'রে ইসলাম চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করা—এই 'সুফীয়ানা তরীকা' বা সুফী সাধকের পদ্ধতি ইসলাম প্রচারের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। অবশ্য সুফী দরবেশরা সবসময় উদার ধর্মমত প্রচার করতেন না। হিন্দুদের সম্বন্ধে তাদের বিদ্বেষের ভাব যথেষ্ট ছিল। তারা যে ধর্মমত প্রচার করে তার মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাবও কম ছিল না।

সে যাই হোক, ষোড়শ শতকের ইতিহাসে দেখা যায়, হিন্দু সংস্কৃতির

উদার অঙ্গনে মুসলমানগণও মিলিত হবার চেষ্টা করেছিলেন। চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেক মুসলমান আত্মসমর্পণ করেন। বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন।

কিন্তু এই সাংস্কৃতিক মিলন সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হয় নাই। চতুষ্পাঠীতে যারা দর্শন চর্চা করতেন তারা মাদ্রাসায় কি চর্চা হচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। পক্ষান্তরে, মুসলমান মৌলানারাও কম গাফিলতি করেন নি। তাঁরা একবারের জন্যও সন্ধান করেননি চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হয়।

শাসক সম্প্রদায়ও নিষ্ঠার সঙ্গে মুসলমান সংস্কৃতির পরিপোষণ করতেন, হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপনে বিমুখ ছিলেন। মোগল আমলে আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মঙ্গোল জর্জরিত ইরান-তুরান থেকে যে সব সহস্র সহস্র কবি পণ্ডিত ধর্মজ্ঞ দার্শনিক এদেশে এসে মোগল রাজসভায় আপন আপন কবিত্ব পাণ্ডিত্য নিঃশেষে উজার করে দিলেন তার থেকে এদেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দার্শনিকেরা কণামাত্র লাভবান হয় নি। হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি।

'চৈতন্যদেব নাকি ইসলামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। ....কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুতঃ তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার।' এই কাজে তিনি কতখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন সেটাই বিচার্য বিষয়; চৈতন্যদেবের পক্ষে উভয় ধর্মের মিলনের জন্য শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার কোনো সুযোগ ছিল না। আর চৈতন্যদেবের আহ্বানে শাসকগোষ্ঠীর সাড়া দেবার প্রয়োজনই বা কি!

হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি সুলতান হুসেনশাহার উদারতাও সন্দেহজনক। যশোরাজ খান তাঁকে 'জগতভূষণ' এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁকে 'কলিযুগের কৃষ্ণ' বলে উল্লেখ করেছেন। এই সকল মন্তব্য হুসেন শা'র স্বরূপ প্রকাশক নয়; মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবির দীর্ঘ দাসত্বজনিত নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক বলে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন।

তিনি চৈতন্যদেবের জনপ্রিয়তা দেখে কর্মচারীদিগকে বলেছিলেন তাঁর প্রতি যেন কোনো অত্যাচার না হয়। কিন্তু তাঁর হিন্দু কর্মচারীরা তাঁর

হিন্দুবিদ্বেষ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন ; তাই তাঁর কথায় আশ্বাস না পেয়ে গোপনে চৈতন্যদেবকে সংবাদ পাঠাচ্ছেন যেন তিনি অবিলম্বে হোসেনশাহের রাজধানী থেকে দূরে প্রস্থান করেন।[১] হোসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় প্রভুর আদেশ সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে যান নি কারণ তিনি দেবমূর্তি ধ্বংস করবেন। এই অপরাধে হোসেন শা তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। এই মন্ত্রীই তাঁর ভ্রাতা রূপকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে রাজধানী থেকে দূরে অবস্থান করতে বলেন। এই সাক্ষাতের সময় দুই ভ্রাতা বলেছিলেন, 'গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী ম্লেচ্ছের অধীনে কার্য করিয়া তাঁহারা নিজেদের অধম পতিত পাপী' বলে মনে করেন।[২] চৈতন্যদেব দীক্ষার পর চব্বিশ বছর (১৫১০-৩৩ খৃঃ) জীবিত ছিলেন ; তারমধ্যে পুরো একটি বছরও তিনি হোসেনশাহী রাজ্যে অর্থাৎ—বাঙ্গালাদেশে অতিবাহিত করেন নি। তাঁর পরমভক্ত এবং হোসেন শাহের পরম শত্রু উড়িষ্যার পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রের আশ্রয়েই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিক্রান্ত করেন।

ষোড়শ শতকের খ্যাতিমান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে আদর্শ নগর-বিন্যাসের যে চিত্র অঙ্কণ করেছেন তাতে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের চিত্র প্রোজ্জল হয়ে উঠেছে। গুজরাট নগরে মুসলমানগণও হিন্দুর অন্যান্য বর্ণের মতো স্থান পেলো একটি স্বতন্ত্র পল্লীতে। কালকেতু নগরের পশ্চিম অংশ মুসলমানদের জন্য বন্দোবস্ত করেছিলেন ; এই অংশের নাম হ'লো হাসনহাটি। দেশে তখন পাঠানদের প্রাধান্য। তাই চার শ্রেণীর পাঠান সেখানে বসতি স্থাপন করলো। কালকেতুর মুসলমান প্রজারা শান্ত এবং ধর্মানষ্ঠ। ইসলাম প্রচারে তারা ব্যগ্র নয় ; নিজেদের ধর্ম আচরণে তারা ব্যাপৃত। মুকুন্দরামের বর্ণনা অনুসারে,

ফজর সময়ে উঠি বিছায় লোহিত পাটী পাঁচ বেড়ি করয়ে নমাজ।
সোলেমানি মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে পীরের মোকামে দেই সাঁঝ॥

কিন্তু পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি কীর্তিলতা কাব্যে যে চিত্র এঁকেছেন থেকে বোঝা যায় তারা ছিল উদ্ধত, অসহিষ্ণু এবং হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী। বিদ্যাপতি লিখেছেন,

হিন্দু তুরকে মিলল বাস। একক ধম্মে অওকো উপহাস॥

১. চৈ. ভা—অন্ত্য—৪ অধ্যায়
২. চৈ চ—মধ্য—১ম পরিচ্ছেদ

কতহুঁ তুরক বরকর। বাট জাইতেঁ বেগার ধর।
ধরি আনএ বাঁভন বড়ুয়া। মথাঁ চড়াবএ গাইক চুড়ুয়া
ফোট চাট জনউ তোড়। উপর চড়াবএ এ চাহ ঘোড।

... ...

দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।

গোরি গোমঠ পূরলি মহী। পএরস্থ দেবাক ঠাম নহী।
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার। ছোটেও তুরুকা ভভকী মার।

[হিন্দু ও তুরুকের বাস কাছাকাছি। কিন্তু একের ধর্ম অপরের কাছে উপহাসের বিষয়। .... কত তুরুক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ বটুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর বাছ। ফোঁটা চাটে পৈতা বানায়। গোরে ও গোমঠে মহী হল পূর্ণ, পা দেবার একটুও স্থান নেই। হিন্দুকে বলে দূরে নিকালো। তুরুক ছোটো হলেও বড়োকে মারতে চায়]

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বর্ণনায় দেখা যায়, হিন্দু সমাজের অনুকরণে জাতি-ভেদ সৃষ্টি হলো তাদের মধ্যে। এই জাতিভেদের ভিত্তি হলো বৃত্তি এবং ধর্ম। যারা রোজা-নমাজ করতো না তাদের নাম হ'লো 'গোলা'। পিঠা বিক্রয়কারীরা পীঠারী, সানা নির্মাণকারীরা সানাকর, মৎস্য বিক্রেতারা 'কাবারি নামে চিহ্নিত হ'লো। এছাড়া জোলা, হাজাম, রঙ্গরেজ, বেনটা, কসাই, দরজি কাগজী, প্রভৃতি নানা জাতের সৃষ্টি হলো প্রধানতঃ বৃত্তিভেদ অনুসারে। বলা বাহুল্য, এরা সেযুগে সমাজকে নিজ নিজ বৃত্তির মাধ্যমে সেবা করে এসেছে নিষ্ঠার সঙ্গে। কালক্রমে পণ্ডিত-ব্রাহ্মণগণও এদের সংস্পর্শে এসেছিলেন— 'শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন। প্রভু তারে নিজ রূপ করাল্য দর্শন।' এইভাবে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের ফলে উভয় জাতির মধ্যে বিভেদ এবং বিদ্বেষের বিষ ক্রমশ অন্তর্হিত হয়েছিল ; তবে তা সংঘটিত হয়েছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। পরবর্তিকালে এই মিলনের সুর উদাত্ত ও গভীরতর ব্যঞ্জনা লাভ করে। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে আকবরের রাজত্বকালে 'দশেরা', দেওয়ালী ও হোলি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুতে সিরাজ-উ-দৌল্লা সংস্কৃতের স্রগ্ধরা ছন্দে নিমন্ত্রণ পত্র লিখে ব্রাহ্মণদের শ্রাদ্ধবাসরে আমন্ত্রণ জানান। হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি মুসলিমগণের অনুরাগের নিদর্শনরূপে সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই ঘটনাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

॥ রাঢ়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি ॥

ধাতুগত অর্থে ধর্মে (√ধৃ+ম (মন্) লোকধারক। তাই ধর্ম সমাজকে ধারণ করেছে এবং সমাজে আদর্শ উপস্থাপন করেছে স্মরণাতীত কাল থেকে। বিশাল ভারতভূমির এই পূর্ব প্রত্যন্তে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রবর্তন হয়েছিল বিভিন্ন যুগে। এ দেশের আদিম অধিবাসীদের তুক্-তাক মন্ত্রতন্ত্রাদি ঘটিত ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে বিবর্তিত নব নব ধর্ম সমূহের সমন্বয় এবং সংমিশ্রণে এদেশের ধর্মীয়চেতনা এক বিচিত্র এবং বিমিশ্র রূপ ধারণ করে।

বঙ্গদেশের সঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের ঘনিষ্ট সংশ্রব বহু শতাব্দী ধরে বর্তমান রয়েছে; আদিমতম যৌগিক নাথতন্ত্রের ধারা এদেশে প্রচলিত ছিল বহুকাল পূর্ব থেকে। ধর্ম ঠাকুরের পূজা-বিধির ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারের পূর্বে এদেশে জৈনধর্মের প্রসার ঘটেছিল। মগধ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ এদেশে এসেছিল খৃঃ পূঃ ৩য় শতকে। অশোকের রাজত্বকালে। এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রাক্‌বৈদিক ও বৈদিক আর্যগণের আগমন ঘটেছিল বিভিন্ন ধারায় এবং রাঢের সুপ্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে নবাগত বিভিন্ন ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে সংঘর্ষ এবং পরিণামে সমন্বয় সাধিত হয়। ফলে দেশের মুখ্য ও গৌণ বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর ব্রতপার্বণ ও পূজা-পদ্ধতির মধ্যে একই সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ, বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ্য ধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ জৈনধর্ম ॥ জৈনধর্ম এদেশে প্রথম কখন কিভাবে প্রচারিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে নানা মত প্রচলিত আছে। ভদ্রবাহু-বিরচিত কল্পসূত্রের কাহিনী অনুসারে তীর্থংকর মহাবীরের আগমন ঘটেছিল রাঢ়দেশে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দে এবং তাঁর 'কেবলত্ব' লাভ হয়েছিল এই রাঢ দেশের সুহ্ম ও বজ্রভূমির পুণ্য পীঠস্থানে। 'কেবলত্ব' লাভের পূর্বে ও পরে তাঁর এদেশে বহুবর্ষব্যাপী অবস্থান ও পরিভ্রমণের কাহিনী থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় দেশে জৈনধর্মের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল সেযুগে। এদেশে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস এবং দেবদেবীগণের সঙ্গে জৈন ধারায় সমন্বয় ঘটেছিল। বহু শতাব্দীর নানা ধর্মীয় বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে আলোচ্য শতাব্দীতেও জৈন ধর্মের নানা বিশ্বাস সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নরূপে বিদ্যমান ছিল।

॥ বৌদ্ধধর্ম ॥ জৈনধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যও এদেশে সুপ্রাচীন। বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার হয় খৃঃ পূঃ ৩য় শতকে অশোকের রাজত্বকালে এবং সেযুগে এই অঞ্চল বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত

হয়। শীলভদ্র, অতীশ-দীপঙ্কর প্রমুখ বিশিষ্ট বৌদ্ধাচার্যগণের নিবাস ছিল বঙ্গভূমিতে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে এদেশের বৌদ্ধবিহার ও সংঘারামগুলি বিপর্যস্ত হয় এবং বৌদ্ধধর্মের ধারা স্থানান্তরিত হয় বাঙ্গালার সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে। কিন্তু এই ধর্মের অনির্বাণ দীপশিখা এদেশ থেকে চিরতরে লুপ্ত হয় নি। এদেশে প্রচলিত লৌকিক ধর্মে বৌদ্ধদর্শন-তত্ত্ব যেমন নানারূপে প্রবেশ করেছে তেমনি প্রাচীন দেবদেবীগণের পূজাপদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে বর্তমান।

॥ **পৌরাণিক ধর্ম** ॥ বাঙ্গালাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতথ্যাদি থেকে জানা যায়, পৌরাণিক ধর্মে এদেশে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত। সংস্কৃতি বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের ধর্মবিশ্বাস এই ধারায় মিশেছে; লৌকিকধর্মের সঙ্গেও এর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তাই শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর এবং গাণপত্য পৌরাণিক ধর্মের দেবমণ্ডলে বিচিত্র দেবদেবীর আগমন ঘটেছে। এই সকল দেবদেবীর পূজা বিবর্তিত হয়ে এখনও এদেশে বিশেষ প্রচলিত আছে।

॥ **নাথ ধর্ম** ॥ আধুনিক রাঢ়দেশে প্রচলিত ধর্মমতের মধ্যে একদিকে যেমন ধর্ম, মনসা, চণ্ডী, শীতলা পূজা অন্যদিকে তেমনি নাথধর্মের যোগ প্রবাহটি সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে। কালক্রমে এই ধারার সঙ্গে নানা ধর্ম বিশ্বাস মিশেছে এবং এদেশের ধর্মীয় সমাজে যোগদর্শন নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন প্রাচীন মতবাদ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাযান, বজ্রযান, তন্ত্রযান বিবর্তিত হয়ে সহজযান বা সহজিয়া রূপ পরিগ্রহ করেছিল বলে বিশেষজ্ঞগণের ধারণা। হাজার বছর পূর্বে রচিত মাগধী অপভ্রংশের স্তরে বৌদ্ধসহজযানী ও নাথগুরুগণ কর্তৃক 'সন্ধ্যা' ভাষায় রচিত পদগুলি যোগমার্গের নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। 'দশমি-দুয়ার', 'চান্দসুজ', 'আলিকালি', মন-পবন, গঙ্গাজউনা, বেঙ্কানাল,—ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগে প্রকারান্তরে হঠযোগের প্রণালীই প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তিকালে লৌকিক দর্শনের এই ধারা সমাজে নানারূপে বর্তমান ছিল এবং যোগীসম্প্রদায়ও নানা শাখা উপশাখায় বিভক্ত হয়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল তার বিস্তৃত পরিচয় এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। এই ধর্মে ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী এই পঞ্চকুলের পরিকল্পনা থেকে অনেকে ধারণা করেন এই ধর্ম মূলতঃ প্রাকৃত জনদের মধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

॥ **প্রচলিত ধর্মকর্ম** ॥ আমাদের সমীক্ষিত যুগে জনসাধারণের আচরিত ধর্মকর্মের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে। একালের মতো সেকালেও দুর্গাপূজা ছিল বাঙ্গালীর প্রধান ধর্মোৎসব।[১] অন্যান্য পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, ষষ্ঠী, বাসলি, ক্ষেত্রপাল ইত্যাদি বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল।[১] চৈত্রমাসে শিবের চড়ক অনুষ্ঠিত হ'তো মহাসমারোহে।[২] অপরাজিতা, মঞ্জুঘোষ ভৈরবের পূজাও অজ্ঞাত ছিল না।[৩] বামাচারী তান্ত্রিক উপাসকদের কার্যকলাপের বর্ণনা দিয়েছেন বৃন্দাবনদাস—

... ... । নিশায় এগুলা যায় মদিরা আনিয়া ॥
এগুলা সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে। ... ...
... ...
রাত্রি কার মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে। নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমালা বিবিধ বসন। খাইয়া তা সভা সনে বিবিধ রমণ ॥[৪]

যক্ষপূজার ঐতিহ্যও সেযুগে অব্যাহত ছিল।[৫] 'ত্রিমূর্তি বৌদ্ধের মালা' ও পীতঅম্বর পরিহিত যোগীর বর্ণনাও পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণের কাব্যে 'গায়ে নানা তীর্থ চিন'—অঙ্কিত পরিব্রাজক সন্তগণের উল্লেখ আছে।[৭]

স্নানের কালে গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারণ,[৮] স্নান সমাপনান্তে গীতা ভাগবত পাঠ সেকালে ধর্মাচরণের অঙ্গরূপে বিবেচিত হ'তো। একাদশী, চান্দ্রায়ণ ব্রত, তুলসী করিয়া সাগরে মরণ[৯] ইত্যাদি সংস্কার স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ধর্মার্থে বার্ধক্যে সস্ত্রীক বারাণসী-বাসের বর্ণনাও পাওয়া যায়।[১০]

---

১. মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব ঘরে।
দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥ —চৈ. ভা. মধ্য ২৩

১. চৈ. ভা. আদি ২-১

২. জিহ্বা কাটে জিহ্বা ফোঁড়ে করয়ে চড়ক। —ক. ক. চ ৩৬

৩. চৈ. ভা. আদি ৩   ৪. চৈ. ভা. মধ্য ৮

৫. মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে। যক্ষ গুপ্তধনের দেবতা। জৈনধর্মের পরম্পরায় যক্ষ অন্যতম বাস্তর। দক্ষিণবঙ্গে যক্ষ উপাধি প্রচলিত আছে।

৬. ক. ক. চ.—পৃ. ৮৭

৭. গো. বি.—পৃ. ৬৭

১০. জায়া সঙ্গে ধর্মকেতু ভাবিয়া মুকুন্দ হেতু বারাণসী করিল পয়াণ ॥ ক. ক. চ -পৃ. ৪১

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে মাধবেন্দ্রপুরী ও তাঁর শিষ্যবর্গের দ্বারা এদেশে গোপাল মূর্তির পূজা প্রচলিত হয়। ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তির উপাসনা প্রবর্তিত হয়।[১] এই সময়ে এদেশে রামানুজ সম্প্রদায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল বলে মনে হয়।[২] গৌর-নিতাই পূজার প্রচলন করেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার-ঠাকুর ও আম্বুয়া কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত। এই পূজার প্রথম প্রবর্তক অদ্বৈত আচার্য।[৩]

॥ **বৈষ্ণব ধর্ম** ॥ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব (১৪৮৬ খৃঃ) ধর্মীয় জগতে প্রধানতম ঘটনা। তাঁর প্রভাবে বাঙ্গালীর ধর্মচেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রাক্-চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের যে ক্ষীণধারা এদেশে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবাহিত ছিল শ্রীচৈতন্যের আচরিত জীবন চর্যা ও প্রচারিত ধর্মমতে তা সংহত রূপে আত্মপ্রকাশ ক'রলো এবং সমাজের প্রায় সর্বস্তরে পুনঃ সঞ্চারিত হ'লো। বর্তমান অনুচ্ছেদে প্রাক্চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের রূপ, পরবর্তি রূপান্তরের ইতিহাস এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রতিপাদিত তত্ত্বসমূহ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা গেল।

বাঙ্গালাদেশে বিষ্ণু উপাসনার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন কিন্তু পঞ্চরস প্রধান বৈষ্ণবীয় সাধনা কখন কিভাবে কোন্ সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল সে সম্পর্কে যেমন কোনো সর্ববাদীসম্মত মত পাওয়া যায় না; রাধাবাদের উদ্ভবের ইতিহাসও তেমনি মতদ্বৈধতার কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। আবার ঋগ্বেদোক্ত বিষ্ণু কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়েছিলেন কি না সে বিষয়েও নানা মুনির নানা মত প্রচলিত আছে।

এসব জটিল তত্ত্বের অবতারণা না ক'রে বলা যায়, বহু ধর্ম সাধনার পীঠস্থান এই বঙ্গদেশে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রবর্তনা ঘটেছিল প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। আচার্য রামানুজ দক্ষিণদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন "শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে।"[৪] শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পঞ্চরসপ্রবণ বৈষ্ণব উপাসনা মার্গের কোনো ইঙ্গিত তিনি তাঁর স্বগ্রন্থে করেন নাই কিন্তু আচার্য রামানুজের অন্ততঃ

১ ম. বা. বা. ৩১

২ আর কেহ অনাচারে রামমন্ত্র জপি। গৌ. বি.—পৃ. ৫২। মুরারি গুপ্ত প্রথম জীবনে রামমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। গৌ. প. ত. ভূ পৃ. ২২৯

৩. ম. বা. বা.—পৃ. ৩৯

৪. ভা উ স.—১ম খণ্ড পৃ. ৫৯

হাজার বছর পূর্বে তামিল গ্রন্থসমূহে দ্রাবিড় দেশে বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ উপাসক আলবার (Alvar) নামক একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সারযোগী ভূতযোগী—প্রমুখ এই সম্প্রদায়ের বারোজন প্রবক্তা যোগীরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন কিন্তু আলবার সম্প্রদায়-সিদ্ধ রসভাবপ্রবণ বৈষ্ণবধর্ম যে খৃঃ ১ম শতাব্দীতে দ্রাবিড় দেশে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ প্রায় একমত।[১] অনেক পণ্ডিতের মতে, আলবারগণের নাপ্পিনাই-ই পরবর্তিকালে শ্রীরাধায় রূপান্তরিত হয়েছেন।[২] সে যাইহোক, এই সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবক্তা শঠারি মুনির ধ্যানে গোপীভাবের উদয় হয়েছিল। কিন্তু তার উৎসস্থল শ্রীমদ্ভাগবত কি না সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই গোপীভাব প্রবণ বৈষ্ণব সাধনা আচার্য রামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রচারিত হয় নাই। নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই গোপীভাব অংশত স্বীকৃত হলেও মধুররসের সর্বোৎকৃষ্টতা এবং তার সাধন প্রণালীর প্রবর্তন উক্ত সম্প্রদায়গুলির মাধ্যমে খৃঃ ১৩শ শতকের পূর্বে যে স্বীকৃত ও প্রচারিত হয়েছিল তারও কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালাদেশে মধুররস প্রবণ বৈষ্ণব সাধনপ্রণালী যে শ্রীচৈতন্যের পূর্বে প্রবর্তিত হয়েছিল তার পরিচয় জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু উক্ত তিন মহাজনের মধ্যে কেউ-ই বৈষ্ণব ছিলেন না। প্রচলিত মতানুসারে, জয়দেব পঞ্চোপাসক, বিদ্যাপতি শৈব আর বাসুলসেবক চণ্ডীদাস শাক্ত ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং মানস-বৃন্দাবনে সিদ্ধদেহে অবস্থান ক'রে মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধার সখীভাবস্বরূপা সখীগণের আনুগত্য দ্বারা রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য জীবন উৎসর্গ করা—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই সারকথা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গালাদেশে বা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে প্রচারিত হয়েছিল বা অনুষ্ঠিত হ'তো তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল ভাব অন্য কোনো দেশে প্রচলিত কোনো সম্প্রদায় থেকে গৃহীত হয় নাই, একথা স্থির।[৩]

তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস ছাড়াও রামানন্দরায়ের নাটকগীতি (জগন্নাথবল্লভম্) এবং বিল্বমঙ্গলের

১. বা বৈ. ধ.—পৃ ৩৪
২. গৌ বৈ সা.—পৃ ২১১
৩. বা. বৈ ধ.—পৃ. ৪৮-৪৯

'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' আস্বাদনে প্রীতিলাভ করতেন। সুদূর দাক্ষিণাত্যে কবি বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকথার উৎস অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত[১] কিন্তু গোদাবরী তটে রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রতিপাদিত মধুর ভাবের উপাসনার ভাবোৎকর্ষ রামানন্দ রায়ের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত ছিল।

এছাড়া, বঙ্গদেশে দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত গিরি-পুরী-ভারতী প্রমুখ সন্ন্যাসীগণের আগমন ঘটেছিল বহু পূর্বকাল থেকে। বাৎসল্যরসের আধার বাল গোপালের সেবক শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখে সাত্ত্বিকভাবে আবিষ্ট হয়ে অচেতন হতেন।[২] শ্রীচৈতন্যদেব এই পরম্পরার শিষ্য। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের ক্ষীণকায়া-মৃদুমন্দাকিনীর ভাব-নির্ঝরিণীতে যে প্রবল বন্যা সমগ্র ভারতভূমির তটপ্রান্ত প্লাবিত করেছিল তার ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ও রায়রামানন্দের ভূমিকা কম নয়। এঁরা চৈতন্যতত্ত্বের মন্ত্রদ্রষ্টা এবং চৈতন্যভাব-মন্দাকিণীর ভগীরথ।

॥ **মধুর রস ও পরকীয়াবাদ** ॥ পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা গেল, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে এদেশে জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-প্রমুখ মহাজনগণের রচনায় মধুর রসের আভাস থাকলেও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই চতুর্বিধ ভক্তিরসের সাধনপদ্ধতি যে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে বা শিষ্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত ছিল তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূন্যাভক্তি, সখ্যপ্রেম, দাস্যপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম তত্ত্ব সম্পর্কে রামানন্দরায় অবহিত ছিলেন। তাঁর হৃদয়ে এই সকল ভাব অন্তর্নিহিত ছিল; চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনায় কান্তা প্রেম বা মধুর রসের সাধনা "সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়" রূপে স্থিরীকৃত হয়।

মধুর রসে ভগবান কান্ত; ভক্ত কান্তা। শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিস্রম্ভ, বাৎসল্যের লালন এবং মধুরের কান্তাভাব—এই পাঁচটি ভাবের গভীর ও আতিশয্যময় মিলনে মধুর রসের উৎপত্তি। এর স্থায়ীভাব মধুরা নামে রতি। প্রেমভক্তির সূচনা দাস্যে; বাৎসল্য সখ্যের স্তর অতিক্রম ক'রে তার চরম পরিণতি মধুরে। এই মধুরা রতি—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে তিন প্রকার।

---

১. গৌ. বৈ. সা.—২১১

২ ধন্য মাধবেন্দ্র কথা অদ্ভুত কথন।
মেঘ দর্শনে যাঁহো হয় অচেতন ॥—চৈ. ভা. আদি—৮

কৃষ্ণের রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁর সঙ্গলাভে নিজের ঐকান্তিক বাসনাজাত রতির নাম সাধারণী। কৃষ্ণের গুণাদি শ্রবণে শাস্ত্রসম্মত পরিণয় বন্ধনের দ্বারা পারস্পরিক সঙ্গ সুখলাভের বাসনা থেকে যে রতি ভক্তহৃদয়ে উদ্ভূত হয় তার নাম সমঞ্জসা। ভক্তহৃদয়ে যে কৃষ্ণরতি স্বতঃসিদ্ধ, ভগবানের (নিজের নয়) তৃপ্তি সাধনই যার অভিপ্রেত যার কাছে সমাজ সংসার মিথ্যা হয়ে যায়, যার প্রভাবে ভগবান ভক্তের বশীভূত হন তাই সমর্থারতি।

মথুরায় কুব্জার রতি সাধারণী, দ্বারকায় রুক্মিনী সত্যভামার রতি সমঞ্জসা, বৃন্দাবনে ললিতা, বিশাখা চন্দ্রাবলীর রতি সমর্থা—এঁরা কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া। এই নিত্যপ্রিয়াগণের সর্বশ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধা; তন্মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যা শ্রীরাধা। সুতরাং বৈষ্ণবীয় শৃঙ্গার রসের বৃন্দাবন লীলায় স্থায়ী ভাব সমর্থা; নামে মধুর রতি। নায়ক শ্রীকৃষ্ণ; নায়িকা শ্রীরাধা; প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী। কিন্তু রাধা আয়ানের এবং চন্দ্রাবলী গোবর্ধনের পরিণীতা বলে কৃষ্ণের পক্ষে এঁরা পরকীয়া নায়িকা। কিন্তু এ পরকীয়া লৌকিক-পরকীয়া নয়; কারণ সম্পর্ক এখানে ভক্ত-ভগবানে।

সুতরাং দেখা গেল, সমর্থারতির মধ্যেই পরকীয়ার বীজ নিহিত। যে প্রেমের পথে বাধা নেই সে প্রেমে তীব্রতা নেই। স্বকীয়া প্রেম তাই বৈচিত্র্যহীন। পক্ষান্তরে, সমর্থারতি 'সান্দ্রতমা (নিবিড়) সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা' অর্থাৎ 'কুলধর্ম লোক লজ্জাদি' সব কিছুকে অর্থহীন করে দেয়। স্বকীয়ায় তা সম্ভব নয় তাই বৈষ্ণব মহাজনদের মতে—"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।"[১]

কিন্তু ষোড়শ শতকে বাঙ্গালাদেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, বৃন্দাবনের সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রভৃতি নানান কারণে পরকীয়াবাদ ব্রজমণ্ডল অতিক্রম ক'রে বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হয় এবং এই পরকীয়াবাদের ধারা অষ্টাদশ শতকেও এদেশে অব্যাহত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় একখানি পুরাতন 'জয়পত্র' থেকে।[২]

অবশ্য একথাও অস্বীকার করা যায় না, নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রতিপাদিত রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনীর স্বকীয়াবাদের ধারা এদেশ থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়

১. চৈ চ. আদি—৪। ৪৭

২. দ্র. চি. প. স. ২; পত্র সংখ্যা ১৫১। এ বিষয়ে প্রস্তুত গ্রন্থের 'শিক্ষা ব্যবস্থা' অনুচ্ছেদে 'দিগ্বিজয় বিচার' প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

নি। পরশুরামরায়ের মাধবসঙ্গীতে তার সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের শাস্ত্রসম্মত বিবাহ পরিকল্পিত হয়েছে।[১]

॥ রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তি ॥

স্বতঃ উৎসারিত প্রেমে কৃষ্ণ ভজনের জন্য গোপীর ভক্তি রাগাত্মিকা। গোপীর এই রাগ জন্মসিদ্ধ ; সাধনলব্ধ নয়। যে প্রেমে ভক্ত হৃদয় পরম দুঃখ-ও সুখরূপে ব্যঞ্জনা লাভ করে, সেই পরিণত প্রেমের নাম রাগ। এই রাগ গোপীর কৃষ্ণভক্তির অন্তরাত্মা বলে তাঁর ভক্তি রাগাত্মিকা।

কিন্তু জীবের রাগ স্বভাবজ নয়—সাধনলব্ধ। গোপী তাঁর আদর্শ। জীবের সাধনা চলে গোপীর প্রেমভক্তি বা রাগের অনুসরণ পন্থায়। গোপী গুরু, জীব শিষ্য। গোপী সিদ্ধ, জীব তাঁর অনুগত সাধক—সুকঠিন মানস-তপশ্চারী। এই কারণে জীবের ভক্তি রাগানুগা। নরোত্তমদাসের প্রার্থনা পর্যায়ভুক্ত পদগুলি রাগানুগা ভক্তির সাহিত্যিক নিদর্শন।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তি রাধাভাবের আনুগত্যময়ী ; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধারণের ভজনা প্রকৃতপক্ষে গোপীভাবের রাধাভাবের নয়, যদিও রাধা গোপীগণের অন্যতমা। গোপীভাবে ভজনার অর্থ শ্রীরাধার সখী ললিতা বিশাখাদির আনুগত্যময়ী রাধাকৃষ্ণের সেবারূপা। সেইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকগণের আন্তরিক কামনা—চাই না আমি রাধা হতে হব রাধার পরাণ প্রিয়া। রাধাভাবের আনুগত্যময়ী রাগানুগা ভক্তির মূল কথাই এই।

॥ রাধাকৃষ্ণ অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব ॥ গোপীভাবে যে ঈশ্বরানুসরণ তার নাম রাগমার্গ। সন্ধ্যা-আহ্নিক-উপাসনা-আচার-নিয়ম প্রভৃতি বৈধিমার্গের অনুষ্ঠান বর্জন করে অন্তরের অনুরাগে ঈশ্বরোপাসনা রাগমার্গের সাধনা। এই রাগমার্গের প্রবর্তনার্থ ব্রজলীলা এবং ব্রজগোপীগণ রাগমার্গের সাধিকা। ভগবান যোগমায়া অবলম্বনে শরীরী হয়ে ইচ্ছা দেহ ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণরূপে ব্রজধামে যে লীলা সম্পন্ন করেছিলেন—সেই ব্রজলীলার সাহায্যকারিণী শ্রীরাধা।

ভগবানের যে শক্তি জীবকে সর্বদা অনন্ত উন্নতির পথে পূর্ণমঙ্গল ও আনন্দের পথে আকর্ষণ করে তাই কৃষ্ণ। আর যার দ্বারা ভক্ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় তাই ভক্তি। ভক্তি যখন গুণাবরণে আবৃত থাকে তখন তার স্বরূপ উপলব্ধ হয় না কিন্তু আবরণ মুক্ত হলে মেঘান্তরিত সূর্যের মতো স্বরূপে

১. মাধব সঙ্গীত (বিশ্বভারতী)

২. 'রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা' ব্রজবাসী জনে। তার অনুগত ভক্তি রাগানুগা নামে।—
চৈ. চৈ মধ্য ২২। ১৪৭

প্রকাশিত হয়ে প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই প্রেম সৎ-চিদ্-আনন্দময় ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ মাত্র। ভগবান তিনটি শক্তির আধার—'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে'—বিষ্ণুপুরাণ। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিৎ এই ত্রিবিধ শক্তি ভগবানকে আশ্রয় করে আছেন ; তন্মধ্যে হ্লাদিনী প্রেম স্বরূপা। ইনি রাধা নামে কীর্ত্তিতা—হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিনী। অতো হরেত্যনে নৈব রাধিকা পরিকীর্ত্তিতা॥ —সাধনতত্ত্বসার। যিনি কৃষ্ণের মন হরণ করেন তিনি হরা ; কৃষ্ণ হ্লাদস্বরূপিনী রাধাই এই নামে অভিহিতা হয়ে থাকেন। 'রাধ্' ধাতুর অর্থ সাধনা পূজা বা তুষ্ট করা। যিনি সাধনা করেন পূজা করেন বা তোষণ করেন—তিনিই শ্রীরাধা। আর এই শক্তিকে যিনি আকর্ষণ করেন—তাঁর নাম কৃষ্ণ। 'কৃষ' ধাতু থেকে 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। 'কৃষ' ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা। যিনি সাধনাকারিণী শক্তির সর্বেন্দ্রিয় আকর্ষণ করেন তাঁকেই বলা হয় কৃষ্ণ। এতএব রাধাকৃষ্ণ একই আত্মা। অগ্নি ও দাহিকাশক্তির মতো ভেদাভেদ রূপে নিত্য বর্তমান থেকে সমগ্র প্রাপঞ্চিক জীব সমূহের অন্তর্বাহ্যে বিরাজ করেছেন। কৃষ্ণ তাই গোপীগণকে বলেছেন—

অহং হি সর্ব্বভূতা নামদিরন্তোহন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বা ভূর্ব্বায়ু জ্যোতিরঙ্গনা॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।৮৫

যেরূপ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত সমুদয় ভৌতিক পদার্থের কারণ ও কার্যরূপে তাদের অন্তর্বহি বর্তমান রয়েছে তদ্রূপ আমি সর্বপ্রাণীর একমাত্র কারণ ও কার্য বলে সকলেরই অন্তর্বাহ্যে বিচরণ করছি ; সুতরাং আমার সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদ কদাপি সম্ভবপর নয়।

রাধা এবং কৃষ্ণ অভিন্ন আত্মা। জীবকে প্রেমতত্ত্ব আস্বাদন ও তৎ সাধনা শিক্ষা দিতে ব্রজধামে উভয়দেহ ধারণ করেছিলেন। জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার। এ প্রেম লৌকিক নয়, অপ্রাকৃত—তাই এ প্রেমের মিলনস্থল মানসভূমিতে প্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত ভূমি আনন্দধাম নিত্য বৃন্দাবন। পক্ষান্তরে, এই প্রেম পরকীয়া স্বকীয়া প্রেম বর্ণহীন আর পরকীয়া প্রেমে নিত্য নূতন ভাবের উল্লাস।

রাধাকৃষ্ণ লীলায় জীব প্রেমভক্তির আদর্শের সন্ধান পেল কিন্তু কিরূপ সাধনায় তা লাভ হবে তা জানতে পারলো না। সুতরাং তাদের প্রেমরস পিপাসা চরিতার্থ হলো না। জয়দেব চণ্ডীদাস প্রমুখ দু'একজন ভক্ত ভগবৎ

কৃপায় প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেও সাধারণ জীবের কাছে সে গূঢ় উপায় অজ্ঞাত থেকে গেল। কাজেই সাধনার আদর্শ স্থাপনার জন্ম ভগবানকে আবার অবতীর্ণ হতে হল। অপূর্ণ জীবকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পূর্ণ ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণ তাই বলেছেন—

যদা যদা চরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত্ব দেবতরো জনঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ততে ॥ —শ্রীমদ্ভাগবতদগীতা ৩।২১

অর্থাৎ সমাজের শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করেন সাধারণ লোক তার অনুসরণ করে। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তি লাভের জন্ম জীবগণ ব্যাকুল হলে দয়ার সাগর ভগবান রাধাভাবে অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়ে নিজে কর্ম আচরণের দ্বারা জীবকে শিক্ষাদান করলেন। তাই বৈষ্ণব সাধকগণের বিশ্বাস রাধাকৃষ্ণ একদেহে গৌরাঙ্গ হয়েছেন। গৌরাঙ্গের বাইরে রাধা; অন্তরে কৃষ্ণ। অর্থাৎ কৃষ্ণই রাধা ভাবকান্তিতে আচ্ছাদিত হয়ে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই তাঁদের মন্ত্র—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
একাত্মানা বপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।

রাধা ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হয়েও দ্বাপরের শেষে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, পরে সেই উভয় মূর্তি একতা লাভ ক'রে কলির প্রথম সন্ধ্যায় চৈতন্য নামক রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপে প্রেমরস আস্বাদন করেছিলেন। রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ই জড় প্রতিযোগী চিদ্‌ঘন মূর্তি; সুতরাং তাঁরা স্বরূপতঃ অভিন্ন; কেবল ভাব ও কান্তি বিভিন্ন। ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিই রাধা; সুতরাং- "শক্তি শক্তি মতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।"

ভগবান রাধাকৃষ্ণ অবতারে যে তত্ত্ব বিকাশ করেছেন সেই সাধ্য তত্ত্বের সাধন প্রণালী গৌরাঙ্গ অবতারে প্রচারিত হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব- সাধ্য অর্থাৎ ভক্তের ভাব। সুতরাং যিনি ভগবদ্ভাবে রাধাকৃষ্ণ লীলা করেছিলেন তিনিই ভক্তভাবে সেই লীলারস মাধুর্য আস্বাদন ক'রে প্রাপঞ্চিক জীবকে প্রকৃষ্ট সাধন পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন। ইহাই সংক্ষেপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রতিপাদিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব।

শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হলে সে ভেদ অচিন্ত্য; অভেদ-ও অচিন্ত্য—

অর্থাৎ সুস্পষ্টরূপে তার বিকল্পনা অসম্ভব। তাই এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য শ্রীশিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোক ছাড়া শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করে যান নি। তিনি নিজে আচরণের মধ্য দিয়ে জীবকে শিক্ষাদান করেছিলেন। পরবর্তিকালে শ্রীজীব গোস্বামী 'ভাগবতসন্দর্ভ' গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বজনসম্মত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এ তত্ত্ব সর্বাংশে বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়; অনুভবগম্য।

॥ প্রাক্ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ॥

[বীরভূম-বর্ধমান সীমান্তে অজয় উপত্যকায়
প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য সংকলন]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রাঢ়দেশে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রবর্তনা ঘটেছিল যুগে যুগে। বিশেষজ্ঞগণের মতে সে যুগে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য প্রমুখ ধর্মাচার্যগণের আগমন হয়েছিল ওড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে। ওড়িষ্যা অঞ্চলেই মূলতঃ তাঁদের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সেই সময়েই সমগ্র পূর্বভারতে উক্ত সম্প্রদায়গুলির ধর্মমত বিশেষ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১]

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'ঠাকুর সকলের পাট'[২] নামক একটি পুথিতে ৮৭টি গ্রাম নামের তালিকা আছে। তালিকাভুক্ত গ্রামগুলি অজয় তীরবর্তী অঞ্চলে বীরভূম জেলার ইলামবাজার, দুবরাজপুর, বোলপুর, নানুর থানায় এবং বর্ধমান জেলার কাঁকসা, ফরিদপুর ও অণ্ডাল থানায় অবস্থিত। গ্রামগুলির অবস্থান প্রায় ৩০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে। সরেজমিনে তদন্ত করে জানা গেছে, একদা উক্ত গ্রামগুলিতে মধ্বাচার্য, রামানুজ ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন ধর্মীয় সমাজে ও গ্রামীন সংস্কৃতিতে এই গ্রামগুলি বৈষ্ণব পীঠস্থান রূপে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেকালে এই সকল শ্রীপাটের খ্যাতি-ও ছিল সুদূরপ্রসারী। কালক্রমে তুর্কী আক্রমণের পর তুর্কানা ও সুফীয়ানা তরাকার প্রচণ্ড অভিঘাত এবং পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনে শ্রীপাটগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। অনুসন্ধান করে জানা গেছে, বর্তমানে এগুলি কোথাও বৈরাগী পোতা' 'বোষ্টমের পোড়ো ভিটে'

---

১. History of Oriya Literature P. 28

২. বি ভা. পু. ২৭৭ (পুথি পরিচয় ১ম খণ্ড পৃ. ১৫১-৫২)

নামে পর্যবসিত হয়েছে ; কোথাও কেবলমাত্র গ্রামবাসীদের কাছে জনশ্রুতিতে পরিণত হয়ে প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিরক্ষা করে চলেছে ।

॥ শ্রীপাট সমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ॥

॥ সংগৃহীত তথ্যালোচনা ॥ উক্ত শ্রীপাট নামমালার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গ্রামে ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলি সংক্ষেপে এইরূপ ।

॥ বান্দগোড়া ॥ বোলপুর থানার অন্তর্গত বোলপুর রেলস্টেশন থেকে ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামটির বর্তমান নাম বাঁধগোড়া । গ্রামের পূর্বপ্রান্তে 'বারাহীচণ্ডীর তলা' এবং তার সংলগ্ন 'ঠাকুর পুকুর' । গ্রামের পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপটি এইখানেই অবস্থিত । বারাহী-চণ্ডীর কোনো মূর্তি বর্তমানে নেই, স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা, যে কোনো কারণেই হোক দেবী ওই পুকুরে আত্মগোপন করে আছেন ।

এই গ্রামের অন্যতমা গ্রাম-দেবী মনসার স্থানীয় নাম 'দিদিঠাকরুণ' । ইনি হাড়ী-জাতি-কর্তৃক পূজিতা । বহু শতাব্দীর বহু বিপর্যয় অতিক্রম করে এই অঞ্চলে মনসাদেবী আজও আপন মাহাত্ম্য বজায় রেখেছেন । আজও 'দশহরা' পঞ্চমী তিথিতে কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কৃষক তাদের বৃত্তি বন্ধ রাখে চিরাচরিত প্রথায় । এই 'ট্যাবু' এতদঞ্চলে মনসাপ্রাধান্যই সূচিত করে । দশহরা-পঞ্চমীর দিন বাঁধগোড়া গ্রামের 'দিদি-ঠাকুরুণ'-দেবীর 'আটনে' নিকটবর্তী বোলপুরের মনসাদেবী (স্থানীয় নাম 'বড়-মা' বা 'বুড়ি-মা')[১] ব্রাহ্মণগ্রাম এবং গণোরা গ্রামের মনসাদেবীগণ সম্মিলিতভাবে গ্রামবাসীদের নিকট পূজা গ্রহণ করেন । গণোরা গ্রাম থেকে মনসাদেবীর প্রতীকরূপে আসে কাঠের ঘোড়া । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য বাঁধগোড়া গ্রামের দেয়াসী হাড়ী, ব্রাহ্মণ গ্রামের দেবীর পূজারী ডোম এবং গণোরা গ্রামের পূজারী জাতিতে বাগ্দী । কলেরা-বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা দিলে গ্রামে সম্মিলিত মনসাদেবীগণের পূজার বিশেষ ধূম লেগে যায় । তখন নিকটবর্তী বুধরো, সুরুল, ঘুড়িষা গ্রামের মনসাদেবীগণ আমন্ত্রিত হয়ে আসেন দিন-কয়েকের জন্য এবং সম্মিলিত সাতবোন মনসার পূজা হয় মহা সমারোহে ।[২] বলি দেওয়া হয় অধিকাংশস্থলে হাঁস ।

১. বুড়ী-মায়ী নামে বীড়হোরদের পূজিতা দেবী আছে । —The Birhors P-27

গ্রামের পূর্ব-প্রান্তে অবস্থিত পুরাতন শ্রীপাটটি বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। আখড়া-প্রাঙ্গণে পূর্ব-আমলের মোহান্তদের সমাধি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। স্থানীয়-অধিবাসীদের মতে, প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে বৃন্দাবন থেকে 'হংস-দাস' নামে এক বাবাজী এই গ্রামের শ্রীপাটে অতি-বৃদ্ধ-অবস্থায় বসবাস করতেন এবং এখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

তিনি বিশেষ-ছাঁদে পীতবস্ত্র পরিধান করতেন এবং ধাতুময় মুদ্রা (seal) দিয়ে অষ্টাঙ্গে ছাপ অঙ্কিত করতেন। এই রীতি রামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল[১]। ফলে অনুমান হয় ইনি ছিলেন উক্ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। এঁর পূর্বে এখানে মাধ্ব সম্প্রদায়ের আস্তানা ছিল। এই পরম্পরার শেষ শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী গোত্রে ছিলেন অচ্যুতানন্দ বা অচ্যুতানন্দ। এটি মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের বিশেষ গোত্র। তাঁর মৃত্যু হয় আঃ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। তাঁর পর কাটোয়ার নিকটবর্তী ওটভ্ডা গ্রামের নৃসিংহ দাসবাবাজী এই শ্রীপাটে বাস করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'রামানন্দ দাস' নামে একজন 'টহলিয়া' বা 'নেমো-বৈষ্ণব' এখানে থাকতেন। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু ঘটায় বর্তমানে শ্রীপাটটি পরিত্যক্ত।

॥ মুরুল ॥ বান্দগোড়া গ্রামের একমাইল পশ্চিমে অবস্থিত মুরুল গ্রামেও একদা মাধ্ব-সম্প্রদায়ের কেন্দ্ররূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। সে জৌলুস বর্তমানে না থাকলেও গ্রামে 'বৈরাগি-পাড়া নামে একটি স্বতন্ত্র পল্লী আজও আছে। বৈরাগীগণ বর্তমানে কেউ কৃষিজীবি কেউবা চাকুরীজীবি কিন্তু তাদের পদবী দাসবৈরাগ্য, গোত্র অচ্যুতানন্দ এবং মৃত্যুর পর মৃৎ-প্রোথিত করার রীতি আজও অক্ষুন্ন আছে। মৃতদেহ প্রোথিত করার জন্য পাড়ায় স্বতন্ত্র স্থান আছে—স্থানীয় ভাষায় বলা হয়—'সমাজ-বাড়ী'। এই সমাজ-বাড়ীতে মৃৎ-সমাধি দেওয়ার পর তার উপর ইঁট বা পাথর দিয়ে মন্দিরের চূড়ার আকারে স্তূপ নির্মাণ করার রীতি আছে; সম্পন্ন ব্যক্তিরা তার উপর বড় মন্দিরও স্থাপন করেন।[২] এই গ্রামে এদের বসতি যে কত পুরাতন তা এই সমাধিস্তূপ গুলি দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়।

১, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম খণ্ড পৃ.১৯

২. শ্রীপাট কাঁকুট্যায় সমাধিস্থলের উপর বৃহৎ মন্দির নির্মিত হয়েছে।

॥ বল্লভপুর ॥ সুরুল গ্রামের প্রায় মাইল তিনেক উত্তর-পশ্চিমে কোপাই নদীর তীরে অবস্থিত বল্লভপুর গ্রামটি বর্তমানে বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে গেলে-ও এককালে যে এই গ্রামের বোলবোলাহ্ ছিল তার নীরব সাক্ষী ধর্মরাজ, একলিঙ্গদেব, রাধামাধব প্রমুখ গ্রাম-দেবতাগণ। ধর্মরাজের প্রতীকরূপে এই গ্রামে পূজিত হন তেঁতুল বৃক্ষের তলদেশে অবস্থিত কূর্মলাঞ্ছন বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড। রেখ-দেউলের রীতিতে নির্মিত ভগ্নপ্রায় টেরাকোটা-খচিত শিবমন্দিরটিও অল্প দিনের নয়। এই গ্রামের শ্রীপাট বর্তমানে লুপ্ত। গ্রাম-বৃদ্ধদের বাল্যস্মৃতি রোমন্থন থেকে জানা যায়, এখানে বৈষ্ণব শ্রীপাট ছিল। শ্রীপাটের মাতাজী অতি বৃদ্ধা সৌদামিনীদেবী সেকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁর সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। কথিত আছে গ্রামের জমিদার-বাড়ীর দুর্ধর্ষ ডাকাতদলকে বৃদ্ধা সৌদামিনী একা নিবৃত্ত করেছিলেন। ডাকিনী-যোগিনী বিদ্যায় নাকি তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছিল। এই গ্রামে নদীগর্ভে একটি প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীন-মূর্তি আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে 'পাষাণী-কালী'। পৌষ সংক্রান্তির দিন তাঁর আনুষ্ঠানিক পূজা ও মহোৎসব হয়।

॥ মনোহরপুর ॥ বল্লভপুর গ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে কোপাই নদীর তীরবর্তী মনোহরপুর গ্রাম একসময়ে শাক্তপীঠরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। গ্রামের ভট্টাচার্য বাড়ীতে প্রাপ্ত মনোহরপুর গ্রামের পুরাকথা-সম্বলিত একখানি প্রাচীন তালপাতার জীর্ণ পুঁথিতে একটি শ্লোক আছে—

"মনোহরপুর কাশীচ কোপায় মণিকর্নিকা। শিবরাম শিব সাক্ষাৎ হররামঃ হরমিব।"

প্রাচীনগণের মতে, এ গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা শিবানন্দ তীর্থস্বামী প্রৌঢ়াবস্থায় গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করে বারাণসী গমন করে ধর্মালোচনায় কালযাপন করেন। অতঃপর একদা তিনি সশিষ্যমণ্ডলী একটি প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ সহ মনোহরপুর গ্রামে পদার্পণ করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সে শিবলিঙ্গ এবং মন্দির কোপাই নদীর গর্ভগত। শিবানন্দ তীর্থস্বামী আর গৃহাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই। গ্রামস্থ শ্মশানে তিনি কালাতিপাত করতেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নাদেশ হয়, "তুমি গ্রামের অভ্যন্তরে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন কর এবং নবরাত্রি সংকল্প করে সেখানে মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপন করে আমার আরাধনা কর, তাহ'লে তোমার স্বকার্য-সাধন হবে।"

স্বপ্নাদেশ অনুসারে তিনি দুর্গা-মূর্তি স্থাপন করে মাতৃপূজায় ব্রতী হন। তদবধি এই মহাপূজা এখনও চলে আসছে। প্রতিপদ থেকে সপ্তমীর অর্ধরাত্র পর্যন্ত জপ্ করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তাই এখনও সপ্তমীর অর্ধরাত্রে অষ্টমী তিথির পূর্বেই অষ্টমী বিহিত মহাপূজা বলি, হোম, পূর্ণাহুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। সপ্তমীর অর্ধরাত্রে মহা-অষ্টমী পূজার প্রথা এই অঞ্চলে আর কোথাও আছে বলে জানা যায় নি।

এই গ্রামের ভট্টাচার্যগণ তীর্থস্বামী মহাশয়ের বংশধর বলে দাবী করেন। এঁদের অন্যতম পূর্বপুরুষ মহেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় কাশীধামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। পরে তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য রামব্রহ্ম ন্যায়তীর্থকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। এঁদের গোত্র বাৎসল্য এবং বীজমন্ত্র 'শ্রীশ্রীরাজ রাজেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী'। বাড়ীতে পঞ্চ-মুণ্ডীর আসন থাকার জন্য তুলসী-গাছ স্থাপন করা নিষিদ্ধ; তথাপি গ্রামবাসীরা এই ভট্টাচার্য বাড়ীকে আজও 'গোঁসাই-বাড়ী' বলে অভিহিত করে।

এই গ্রামটি একদা মধ্বাচার্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের অন্যতম পীঠস্থান রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। বর্তমানে মূল শ্রীপাট কোপাই নদীর গর্ভে বিলীন হয়েছে। নদীতীর-সংলগ্ন একটি পতিত ডাঙ্গাকে বলা হয় 'বৈরাগী পোতা বা 'আখরা-পাকুড়-তলা'। পতিত জমিতে রয়েছে একটি পুরাতন পাকুড় গাছ এবং কয়েকটি নিমগাছ। ধ্বসনামা নদীর পাড়ে এখনও শ্রীপাটের প্রোথিত ভিত্তি এবং সমাধিস্তূপ দেখা যায়। দু'শ বছর পূর্বেও এই আখড়া বাড়ী নৃত্যগীতে জমজমাট থাকতো। প্রাচীনগণের মতে, এই পাটের প্রতিষ্ঠাতা মনোহর দাস বাবাজী ছিলেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। সম্ভবতঃ এঁর নাম অনুসারেই গ্রামের নাম মনোহরপুর। সিদ্ধপুরুষ রূপে এই অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি ছিল তাঁর। অদূরে রামনগর গ্রামের শ্রীপাটে এখনও বাবা মনোহর দাসের পাদুকা এবং সমাধিমন্দির আছে। এই পরম্পরায় শিষ্য ৺জরীদাস বাবাজী ছিলেন মনোহরপুর গ্রামের আখড়াধারী মোহান্ত। এঁর বংশধররা এখনও গ্রামে বাস করেন। এদের বৃত্তি কৃষিকর্ম কিন্তু গলায় কণ্ঠীমালা ধারণ এবং অন্যান্য বৈষ্ণব আচার পালন করেন। এদের গোত্র অচ্যুতানন্দ; সুতরাং এঁরা মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্ত। মনোহরদাসের নামে তাদের সেবা প্রচলিত। আজও নবান্ন, পৌষ-পার্বণ, অন্নপ্রাশন, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে এঁদের মনোহরদাসের নামে নৈবেদ্য নিবেদন করতে হয়।

এই গ্রামের কোপাই নদীর তীরে 'ঝর্ণাঘাট' নামে একটি রহস্যময় স্থান আছে। পূর্বকালে এই স্থান থেকে অবিরত ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে কোপাই নদীতে মিশতো। এখন সে উৎস শুকিয়ে গেছে। এই ঝর্ণাঘাটে গ্রামবাসীদের স্থানীয় উচ্চারণে ঘন্নাঘাট) অনেক পুরাতন সমাধিস্তুপ আছে। এগুলি মনোহরপুর গ্রামের আখড়ার বৈষ্ণবদের সমাধি।

গ্রামের উত্তরে রয়েছে 'ব্রহ্মদৈত্যতলা'। এই উপদেবতার প্রতীকরূপে পূজা হয় শ্যাওড়া গাছ; পৌষ সংক্রান্তি ও মাঘ মাসের প্রথম দিনে। এই উপলক্ষে ছোটখাটো মেলা বসে। স্থানীয় অধিবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস বাবা ব্রহ্মদৈত্য শ্যাওড়া গাছে অবস্থান করেন। ব্রহ্মদৈত্য এই অঞ্চলের সাঁওতালদের দ্বারা পূজিত দেবতা।

গ্রামের অদূর দক্ষিণে 'রুদ্রতুলাকালী' অধিষ্ঠাত। দেবস্থানটি লোকমুখে বিকৃত হয়েছে 'অন্ধকালীর স্থান' রূপে। প্রস্তরনির্মিত মূর্তিটি প্রকাণ্ড গর্তের মধ্যে অবস্থিত। লোকে বলে এই গর্তের সুরঙ্গ নাকি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কালী নামে পূজিত এই প্রত্নবস্তুটির স্বরূপ নির্ণয় এবং সুরঙ্গের রহস্য উদ্‌ঘাটন ব্যাপকতর অনুসন্ধান ও বৃহত্তর গবেষণা কর্মের অপেক্ষা রাখে। দেবী রন্ধ্রের মধ্যে অবস্থিতা এবং কার্ত্তিক মাসের তুলা রাশিতে দেবীর পূজা হয় তাই এর নাম রন্ধ্রতুলা কালী।

এই গ্রামের পূর্বোক্ত দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। দুর্গামন্দিরের পাশেই রয়েছে পুরাতন বিষ্ণু-দেউলের ধ্বংসাবশেষ। স্থানীয় প্রবাদ, মুসলমানরাই এই মন্দির বিনষ্ট ক'রে ধাতু নির্মিত দেববিগ্রহ অপহরণ করে। এই প্রবাদ ইসলাম প্রচারের তুর্কানারীতির কথা স্মরণ করায়। কিন্তু উক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে যূপকাষ্ঠ এবং সেখানেই বর্তমানে দুর্গাপূজার সময় বলিদান হয়। এই বলিদান স্থান এবং যূপকাষ্ঠ দুর্গামণ্ডপের পিছন দিকে অবস্থিত। প্রচলিত নিয়মে বলিদান স্থান মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত হয়। তাছাড়া এখানকার কালীপূজা পদ্ধতিও ভিন্ন। পূজার প্রথম মন্ত্রটি হ'লো—গণেষঞ্চ দীনেষঞ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবম্ শিবাঃ ইত্যাদি। পূজার বিশেষ বিধান অনুযায়ী পূজারীকে মদ্যমাংস ভক্ষণ করে প্রথমে বিষ্ণু পূজা করতে হয়; তারপর হয় শিবম্ শিবার পূজা। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য বীরভূম জেলার পাইকোড় গ্রামে মদ্যমাংস দিয়ে ভোগ নিবেদন করার প্রথা আছে। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এই সকল বিচিত্র তথ্যাদি থেকে ধারণা হয় রাঢ়ে পূজিত অসংখ্য দেবদেবীর

বৈশিষ্টপূর্ণ পূজা-বিধানের মধ্যেই এদেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আত্মগোপন করে আছে। এগুলি ব্যাপকভাবে সংগ্রহ ও তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন বৃহত্তর গবেষণা কর্মের অপেক্ষায় রাখা গেল।

॥ বিষ্ণুখণ্ডা ॥ মনোহরপুর গ্রামের ॰ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামটি পুরাতন দলিলে চক-বিষ্ণুখণ্ডা রূপে উল্লিখিত। গ্রামে বর্তমানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী। 'সিকদার'-পদবীযুক্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমানদেরই গ্রামে বিশেষ প্রাধান্য। গ্রামে কয়েকটি মধ্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব পরিবার বাস করেন। এদের বৃত্তি কৃষি; পদবী মোহান্ত। মোহান্ত আছে, মোহান্তদের সেবা প্রচলিত আছে গুরু গোপাল-দাসের নামে, কিন্তু কোনো শ্রীপাট নেই। তবে গ্রামের পশ্চিম-প্রান্তে মুসলমান পাড়ার পাশে ধানক্ষেতের মাঝখানে প্রাচীন নিমগাছ পরিবেষ্টিত কিছুটা পতিত জমি আছে। এই গ্রামের প্রাচীন শ্রীপাটটি এইখানেই অবস্থিত ছিল, বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মুসলমানদের হাতেই যে এই শ্রীপাট একদা নির্মূল হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ঠিক ওই পতিত ডাঙ্গার পাশে গোরস্থান স্থাপনের পরিকল্পনার মধ্যে। এখানেও সেই গোহাড়ের ঘায়ে দেউল-দেহড়া ভাঙ্গার কলঙ্কময় ইতিহাস আত্মগোপন করে আছে। উক্ত পতিত জমিতে বর্তমানে হল্ চালনা নিষিদ্ধ কারণ একটু খুঁড়লেই এখানে তৈজস-পত্রাদি প্রত্নবস্তুর সন্ধান মেলে। এই ধর্মীয় বিধি-নিষেধ-টুকুই এই গ্রামের বৈষ্ণব শ্রীপাটের স্মৃতিরক্ষা করে চলেছে সঙ্গোপনে। গ্রামটি যে বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীন পীঠস্থান বিষ্ণুখণ্ডা গ্রাম-নামেই তার প্রমাণ।

॥ নেবড্যা ॥ বোলপুর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে সিউড়ি-বোলপুর প্রধান সড়কের পাশে অবস্থিত এই গ্রামটির বর্তমান নাম—লেবড়াশ্বর। আদি গ্রাম-দেবতা শিবের নাম থেকেই এই গ্রাম নামের উৎপত্তি। লেবড়া অর্থে লিঙ্গ। এই গ্রামের শিবও লিঙ্গ মূর্তিতে অধিষ্ঠিত। হিন্দি ভাষায় এই শব্দটি 'লোড়া', মারাঠীতে 'লেবৃড়' এবং মৈথিলীতে 'লগুড়া' রূপে পাওয়া যায়। এই গ্রামের প্রাচীন শ্রীপাটটি মাধ্ব সম্প্রদায়ের। গ্রামের বৈরাগী পাড়ায় বর্তমানে কয়েক ঘর বর্ধিষ্ণু বৈষ্ণব বাস করেন। এঁদের সেবা প্রচলিত আছে রাঙ্গাবাবা বা রাঙ্গাঠাকুরের নামে। প্রকাণ্ড এবং প্রাচীন নিমগাছের নীচে রাঙ্গাবাবার সমাধিস্থান। ইনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এঁর অপ্রকট সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা ইচ্ছামৃত্যুর মতো।—

একদিন অতি বৃদ্ধ অবস্থায় রাঙ্গাবাবা তাঁর শিষ্যদের জানালেন তাঁর

অপ্রকট হবার সময় উপস্থিত হয়েছে। তাঁর নির্দেশ মতো শিষ্যরা খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন করতে লাগলো। রাঙ্গাবাবা জীবন্ত সমাধিস্থ হলেন। সমাধি গর্ভের অভ্যন্তরে রইলো তাঁর প্রিয় অম্বুরিতামাক এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রিয় বস্তুগুলি। শিষ্যরা তাঁর সমাধি বেষ্টন করে কীর্তন করতে লাগলো। প্রবাদ, আজও কখনও কোনো গভীর রাত্রে সমাধি স্তূপ থেকে খোল করতালের বাদ্যধ্বনি ভেসে আসে; আর সুগন্ধ পাওয়া যায় রাঙ্গাবাবার প্রিয় অম্বুরি তামাকের। সেযুগে রাঙ্গাবাবা মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সমাজে কতখানি খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন তা অনুমান করা যায় তাঁর এই নিত্যলীলার কাহিনী থেকে। সমকালের বৈষ্ণবগণের দৃষ্টিতে এঁরা ছিলেন দেবকল্প চরিত্র। নেবড়্যার নিকটবর্তী ধনাই, ইমাদপুর গ্রামের আখড়াতেও রাঙ্গাবাবার অপ্রকট সম্পর্কিত এই অলৌকিক কাহিনীটি প্রচলিত আছে।

॥ সিআন ॥ বোলপুর থেকে ৪ মাইল পূর্বে অবস্থিত অতি প্রাচীন গ্রাম সিয়ান। গ্রামবৃদ্ধরা বলেন, এ সেই মহাভারতের অঙ্গদেশ। গ্রামের পাশেই বিস্তৃত ধানক্ষেতের মাঝখানে একটি কুণ্ড আছে; কুণ্ডটির নাম মনিকুণ্ড। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নামের স্মৃতি বিজড়িত। আজও প্রতি বছর পৌষ মাসের সংক্রান্তির পুণ্যস্নান উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। স্থানীয় জনসাধারণ কুণ্ডে স্নান ক'রে গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন করে।

এই গ্রামে অনেক বৈষ্ণবের বাস। তাদের অনেকেই গোত্রে অচ্যুতানন্দ: অর্থাৎ মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্তমানে এরা কৃষিকর্মে কালাতিপাত করে কিন্তু কালাচাঁদ বৈরাগী ও অবলা দাসীর আচার-আচরণে বৈষ্ণবীয় সংস্কার বজায় আছে পুরোমাত্রায়। অবলাবালার পূর্বনিবাস বর্ধমান জেলার নারীসাধনপুর। সেখানেও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আখড়া আছে। নিকটবর্তী 'গাজিডাঙ্গা' গ্রামের আখড়ার প্রখ্যাত মোহান্ত বলাইদাস কালাচাঁদের গুরু। ত্রিসন্ধ্যা গুরুপ্রণাম ও নামসংকীর্তন করে তারা দিনাতিপাত করে। এদের উপজীবিকা অযাচক বৃত্তি। কার্তিক মাসে গ্রামে টহল দেওয়া কালাচাঁদের প্রতি বছরের কাজ। তার বিবৃতি অনুসারে, মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী এই রকম—

অবন্তিকাপুরি ধর্মশালা। বদরিকাশ্রম ধাম। নৈমিষারণ্য সুখবিলাস। অঙ্গপাট ক্ষেত্র। সাবিত্রি ইষ্ট। ব্রহ্ম উপাসি। বিষ্ণুভ্যাং মন্ত্র। ঈস দেবতা। সালোক্য মুক্তি। সুখদ্বার। ত্রিকাল আচার্য। অদ্বৈত শাখা। অচ্যুত গোত্র।

শুক্লবর্ণ। হরিনাম আহার। নারায়ণ পারিষদ্। সামবেদা। তুলসীমালা ধারণং। হরিমন্দির তিলক দ্বাদশ অঙ্গে ধারণং॥

গ্রামবৃদ্ধদের বিবৃতি অনুসারে, গ্রামে আর একটি "লাল কাপুড়ে" বৈরাগীর আখড়া ছিল। সে আখড়ার কোনো চিহ্ন বর্তমানে না পাওয়া গেলেও সেটি যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আখড়া সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ রক্তবর্ণের বস্ত্র নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পরিধেয়। গ্রামভাষায় তাই তাদের বলা হতো 'লালকাপুড়ে বৈরাগী'।

॥ মুলুক ॥ সিয়ান গ্রামের অদূরদক্ষিণে অবস্থিত মুলুক গ্রামের সাবেক নাম গণেশপুর। তদানীন্তন বীরভূমের স্থানীয় শাসক মীর্জা গিয়াসের নামানুসারে এই নাম। সেকালে এই অঞ্চল ছিল তুর্কীদের অন্যতম প্রধান ঘাটী। এখানকার তুর্কী আক্রমণ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার কাহিনী শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন তাঁর বীরভূম বিবরণ (তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন প্রচলিত জনশ্রুতির ভিত্তিতে।

এই মুলুক গ্রাম চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম প্রখ্যাত পীঠস্থান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কথিত আছে, দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয়-পণ্ডিতের ভ্রাতা সঞ্জয়ের পৌত্র যদুচৈতন্যের পুত্র রামকানাই-ঠাকুর মুলুক গ্রামে এসে বসবাস করেন। মুলুকের বর্তমান শ্রীপাট রামকানাই ঠাকুরের নামের সঙ্গে সংযুক্ত। মুলুকের ৫ মাইল পূর্বে জলোন্দি গ্রামে ছিল সঞ্জয়ের নিবাস। পরে তিনি মুলুক গ্রামে এসে কুলদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি তাঁর সেবা প্রচলিত আছে। রামকানাই ঠাকুরের মুলুকে আগমণ, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তৎকালীন মুসলমান শাসকের কাছে তিন কোদাল পরিমিত ভূমি প্রার্থনা, রামকানাই ঠাকুরের অভীষ্টসিদ্ধি অবশেষে মন্দির নির্মাণকালে কড়িকাঠ নির্দিষ্ট মাপ থেকে ছোটো হয়ে যাওয়া, দেবানুগ্রহে কড়িকাঠের আয়তন বৃদ্ধি এ সব সম্পর্কে এই অঞ্চলে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। স্থানীয় অধিবাসীগণ আজও শ্রীপাটটিকে 'কড়িবাড়া রামকানাইয়ের পাঠবাড়ী' নামে অভিহিত করে। মন্দির-সংলগ্ন অপরাজিতা দেবীর মূর্তিটি প্রাচীন। মন্দিরের খিলানে তুর্কী আমলের স্থাপত্যকলার নিদর্শন আছে।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগে মুলুক গ্রামে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের অন্যতম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আর অবশিষ্ট নেই। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের লিখিত প্রাচীন পুঁথি এই গ্রাম

থেকেই সংগ্রহ করেছেন বিশ্বভারতী। পুথির পুষ্পিকায় এই রকম উল্লেখ আছে।

॥ মইসডাল-আদিত্যপুর গোয়ালপাড়া ॥ বর্তমান 'প্রান্তিক' রেলস্টেশন সন্নিহিত এলাকায় অবস্থিত এই গ্রামগুলিতে বর্তমানে কোনো শ্রীপাট নেই তবে দেড়'শ বছর পূর্বেও মইসডাল-গোয়ালপাড়া-আদিত্যপুর অঞ্চলে মাধ্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। নানা কারণে এই আখড়াগুলি বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই অঞ্চলের বৈষ্ণবেরা বেশীরভাগ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেছে জীবিকার অন্বেষণে। হয়ত অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং শহুরে জীবনের প্রলোভন এদের এমন ছন্নছাড়া করেছে। এরই মধ্যে এখনও দু'একজন প্রাচীন স্মৃতি আঁকড়ে ধরে আছেন। এই রকম এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবী চঞ্চলাবালা আর বৃদ্ধ ভক্তদাস বৈরাগী পারুলডাঙ্গার নির্জন প্রান্তরে ভিক্ষামাত্র সম্বল করে ঘর বেঁধে বাস করছে। এদের গোত্র অচ্যুতানন্দ; সেবা ক্ষ্যাপামায়ের। এই ক্ষ্যাপামায়ের শ্রীপাট বীরভূম জেলার আহ্‌মদপুর রেলস্টেশনের নিকট দেশচাঁদপুরে অবস্থিত।[১] অবলাবালার বিবৃতি অনুযায়ী, ক্ষ্যাপামা ছিলেন অলৌকিক-শক্তিসম্পন্না। এঁর সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীটি এই রকম—

ক্ষ্যাপা-মা দেশচাঁদপুরে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করতেন। জোত-জমা কিছু ছল; তাতেই তাঁর উদরান্নের সংস্থান হ'তো। ক্ষ্যাপা-মা বিকৃত-মস্তিষ্কা এবং বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে উদাসীন। জমির খাজনা মেটে না নিয়মিত। তলব এলো জমিদারী কাছারি থেকে। অনেক অনুসন্ধান করে জমিদারের পেয়াদা-পাইক পাকড়াও ক'রে নিয়ে এল বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধার বেশ ভূষায় উন্মাদের চিহ্ন। সঙ্গে একটি ছেঁড়া কাঁথার বোঝা। তার মধ্যে বাসা বেঁধেছে বিছে-ইঁদুর-আরশোলা প্রভৃতি কীটপতঙ্গ। সেগুলি কাঁথার বোঝা থেকে বেড়িয়ে পড়লে বৃদ্ধা সেগুলি কুড়িয়ে রাখেন সযত্নে জমিদারবাবু খাজনা আদায়ের কৈফিয়ৎ তলব করলে বৃদ্ধা কাঁথার বোঝাটি ফেলে রেখে চলে গেলেন বাকী খাজনার টাকা আনতে। ইতিমধ্যে নামলো মুষলধারে বর্ষণ। জমিদারের কাছারি প্রাঙ্গণে হাঁটু-জল। কিন্তু বৃদ্ধার কাঁথার বোঝাটি

১. এই আখড়া থেকেই শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন জয়দেব সম্পর্কিত নূতন কাহিনী সম্বলিত গীতগোবিন্দের পুথি আবিষ্কার করেছিলেন। —কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ-ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

ভিজলো না। এই অলৌকিক কাহিনীর প্রচার হলো ; বৃদ্ধা 'ক্ষ্যাপা-মা' রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন। আজও ক্ষ্যাপামায়ের আখড়ায় দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিকারকল্পে সেই ছেঁড়া কাঁথার টুকরো দেওয়ার প্রথা আছে।

॥ কান্দপুর ॥ বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানার অন্তর্গত কান্দপুর গ্রামের শ্রীপাটটি একটি উচু ঢিবির উপর অবস্থিত। তার পাশেই রয়েছে গ্রামদেবতা ধর্মরাজের পুরাতন মন্দির। শ্রীপাটটি যে প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। আখড়ার স্বতন্ত্র কক্ষে পূর্বতন মোহান্তদের সমাধিগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে ; অন্যত্র দেখেছি খোলা জায়গায় সমাধিস্থান। সমাধিস্তুপগুলি নামাবলী দ্বারা আবৃত। গৃহের মধ্যে রয়েছে তাঁদের পাদুকা, অজিনাসন এবং কুলুঙ্গিতে পাত্ভাড়ির মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতের পুথি, নরোত্তম প্রমুখ মহাজনদের পদাবলীর খাতা, কিছু জীর্ণ পুরাতন-পত্রিকা। পুথিগুলিতে নিয়মিত ফুল-জল দেওয়া হয়। এইসব মোহান্তদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত সুদূর অতীতে সাধন-ভজনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কিন্তু সেসব গৌরবময় কাহিনী বিবৃত করার মতো আজ আর কেউ নেই। বর্তমানে আখড়ায় যে মোহান্ত ও দু'জন মাতাজী আছেন তাঁরা মাধ্বসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ; কারণ এঁদের গোত্র অচ্যুতানন্দ। চৈতন্যচরিতামৃতের চর্চা ও নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা পদাবলীর সুমধুর সঙ্গীতে একদা এই শ্রীপাট মুখরিত হ'তো। এই সব নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব হলেও নব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাবধারায় এরা পরিপুষ্ট হয়েছিল এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন ক'রে অদ্যাপি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। মোহান্তদের সেবার জন্য জোতজমাও আছে যথেষ্ট। এই গ্রামের অদূরে রয়েছে একটি দরবেশী আখড়া।

॥ সুপুর ॥ বোলপুর রেলস্টেশনের ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অজয় নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত এই গ্রামটি অতি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সম্বলিত। গ্রামে অনেক ঢিবি, পোতা, পুরাতন টেরাকোটা খচিত দেব-মন্দির, প্রাচীন দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তি যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। গ্রামের বৈরাগী পাড়ায় এখনও কয়েক ঘর বৈষ্ণব বাস করেন, তাঁদের গোত্র অক্রুতানন্দ বা অচ্যুতানন্দ। এঁদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন আখড়াধারী বৈষ্ণব।

গ্রামবৃদ্ধদের মতে, পূর্বে এই গ্রামে আরও দু'টি আখড়া ছিল। একটি মনে হয় নিম্বার্ক ও রামায়েৎ সম্প্রদায়ের। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের

আখড়াটি সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে ; কিন্তু গ্রামে কয়েকঘর বৈষ্ণব নিজেদের রামায়েৎ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। সুপুর নিবাসী শ্রীনাথ দাসবৈরাগ্যের বিবৃতি অনুসারে তাদের গুরুপ্রণালী নিম্নরূপ—

অযোধ্যা ধর্মশালা। চিত্রকূট সুখবিলাস। গোদাবরী প্রদক্ষিণ। ক্ষেত্র ধনুক তীর্থ। রামনাথ ধাম। শুক্ল বর্ণ। সীতা ইষ্ট। জানকী মন্ত্র।

প্রাচীন গড়বেষ্টিত শ্যামসুন্দরের মন্দিরটির গঠনরীতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হয়। মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। প্রবাদ, অষ্টাদশ শতকে আনন্দচাঁদ গোস্বামী এই মন্দির সংস্কার করিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন একজন সিদ্ধ-সাধক এবং মহাশক্তিধর-পুরুষ। বীরভূমে বর্গীর হাঙ্গামার মোকাবিলা করেছিলেন তিনি। যে মাঠে আনন্দচাঁদের সঙ্গে বর্গীদের যুদ্ধ হয়েছিল সে মাঠ আজও 'বর্গী মারার মাঠ' নামে জনশ্রুতিতে পর্যবসিত হয়েছে। এই মাঠেই তিনি বর্গীদের শায়েস্তা করেছিলেন। প্রবাদ অনুসারে ইনি ছিলেন অলৌকিক শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ। খুস্টিকুরীর কাজীসাহেব বাঘের পিঠে চড়ে তাঁর সঙ্গে মুলাকাৎ করতে এসেছিলেন। আনন্দচাঁদ দেওয়ালের উপর চড়ে দেওয়াল চালিয়ে অগ্রসর হয়ে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করে সমুচিত জবাব দিলেন। বন্ধুর জন্য আনা সওগাত গোমাংস গোঁসাই-এর হাতে এলো গোলাপ ফুল হয়ে। এ সব কাহিনী এই অঞ্চলের লোকেদের মুখে মুখে ফেরে।

॥ মির্জাপুর ॥ অজয়ের উত্তরতীরে অবস্থিত সুপুরের নিকটবর্তী মির্জাপুর গ্রামনামের সঙ্গে মুসলমান যুগের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই গ্রামে তিনটি আখড়া ছিল। সেগুলি সম্ভবতঃ মাধ্ব, নিম্বার্ক ও রামানুজ সম্প্রদায়ের। এই আখড়ার যে এককালে বোলবোলাহ্ ছিল তার নীরব সাক্ষী হয়ে আছে প্রাসাদোপম অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ গুলি। গ্রামবাসীদের মতে, এই অট্টালিকাগুলি ছিল পুরাতন শ্রীপাটের মোহান্তদের বাসগৃহ। ভগ্ন অট্টালিকার অদূরে ক্ষুদ্র জলাশয় এবং বাঁশবাগানের মধ্যে কয়েকটি সমাধিস্থান এবং একটি ভগ্নমন্দির আছে। এই স্থানটি ছিল মোহান্তদের 'সমাজবাড়ী'।

॥ কাঁকুট্যা ॥ মির্জাপুরের অদূর-পশ্চিমে কাঁকুট্যার বর্তমান নাম কাঁকুটিয়া। গ্রামটি অজয়ের বন্যায় বিধ্বস্ত। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় অবস্থিত বিখ্যাত কালাচাঁদ দাসের শ্রীপাট। কেউ কেউ বলেন, লোচন দাসের পাট। নাটমন্দিরযুক্ত বৃহৎমন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির পাশে কালাচাঁদের পূজাও

করা হয়। কৃপানন্দ গোস্বামীর সমাধি-মন্দিরটি অদূরে। এই শ্রীপাটে দ্বাদশ-গোপালের সেবা প্রচলিত আছে। এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আখড়া।

গ্রামের উত্তরপাড়ায় রয়েছে মাধ্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের বাস। এদের পূর্বপুরুষগণ আখড়াধারী বৈষ্ণব ছিলেন; বর্তমানে এঁরা গৃহী বৈষ্ণব। বসতবাটীর অদূরে সমাজবাড়ী। এরা সম্পন্ন গৃহস্থ। সমাধিস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বেশ বোঝা যায়। সেখানে কয়েকটি ছোট সমাধি মন্দিরের মাঝখানে একটি টেরাকোটা-সজ্জিত পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট বৃহৎ মন্দিরও আছে। টেরাকোটাগুলি অন্ততঃ দু'শ বছরের পুরানো।

॥ **কর্মকারপাড়া** ॥ কাঁকুটিয়ার ৪ মাইল পশ্চিমে অজয় নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত এই গ্রামটির নাম চেল্লা-কামারপাড়। গ্রামের বৈরাগী-পাড়ায় কয়েকটি মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব পরিবার বাস করেন। বর্তমানে তাঁরা গৃহী এবং কৃষিকর্মে দিনাতিপাত করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে এঁরা বিস্মৃত; তবে গোত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি; একমাত্র গোত্র জিজ্ঞাসা করেই জানা যায় এঁরা মাধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। এই গ্রামের পূর্বে গোপালনগর গ্রামে একটি বিখ্যাত দরবেশী আখড়া আছে এবং নিকটবর্তী রাঘনগর গ্রামে আছে মনোহর দাসের শ্রীপাঠ।[১] অজয় নদীর তীরবর্তী এই অঞ্চলটি যে প্রাক্‌চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এগুলি তার প্রমাণ।

চেল্লা কামারপাড়া গ্রামের গ্রামদেবী 'বিষহরি' স্থানীয় জনগণের কাছে অত্যন্ত জাগ্রতা দেবী। আধিদৈবিক আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক নানারকমের উৎপাত থেকে তিনি পরিত্রাণ করতে পারেন এই বিংশ শতকেও। গ্রামের সদ্‌গোপগণ দেবীর দেয়াশী। এঁদের পদবী বাসুরি। এঁদের পূর্বপুরুষগণ রাজপুতানা থেকে এদেশে এসেছিলেন বলে কথিত আছে। বাসুরি পদবীযুক্ত রাজপুত-সদ্‌গোপ জাতির কুলদেবতা বিষহরি। এই সব তথ্য থেকে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেছেন, 'বাসুলি' শব্দ থেকেই বাসুরি পদবীর উৎপত্তি হয়েছে। বাসুরিদের কুলদেবতা বিষহরি এবং বহুবিতর্কিত দেবী 'বাসুলি' অভিন্ন। কিন্তু আমাদের আলোচ্য দেবী বিষহরি 'মনসা' ছাড়া আর কিছু নয়। 'বিষধরিকা' (বিষ ধারণে সমর্থ) শব্দ থেকে যদি বিষহরি শব্দের উৎপত্তি হয় তাহলেও তিনি মনসা এবং বিষহরিকা (অর্থাৎ বিষহরণে সমর্থ) শব্দ থেকেও

১. মনোহরপুর গ্রামের প্রসঙ্গে এঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি বিষহরি শব্দ নিষ্পন্ন হয় তাহলেও তিনি মনসা রূপে প্রতিপন্ন হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বজ্রেশ্বরী বা বিশালাক্ষী বা বিষাইল আঁখি প্রমুখ দেবীগণের রূপান্তরে বাসুলি দেবীর উৎপত্তি হয়নি। বজ্রেশ্বরী বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী; বিশালাক্ষীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে দেবী চণ্ডী বলে চেনা যায়; বিষাইল আঁখি হলেন মনসা। সে যাই হোক, বাসরী জাতির শিল্পকলাতেও দক্ষতা সুবিদিত। এ বিষয়ে প্রখ্যাত কলা-সমালোচক অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন।

চেল্লা-কামারপাড়ার ৬ মাইল পশ্চিমে পায়ের গ্রামে একটি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পুরাতন শ্রীপাট আছে। বর্তমানে এটির ভগ্নদশা। বিশ্বভারতী সংগৃহীত মাধবসঙ্গীতের পুথির একখানি প্রতিলিপি এই আখড়ায় রক্ষিত ছিল। নিম্বার্ক বৈষ্ণবদের মধ্যে মাধবসঙ্গীত গ্রন্থের প্রচার ছিল। কারণ স্বকীয়া পদ্ধতিতে এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের বিবাহের বর্ণনা আছে। নিম্বার্ক সম্পদায় এই রীতিতে বিশ্বাসী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বিশ্বভারতী-সংগ্রহে রক্ষিত মীরা, দাদূ, তুলসী দাস, কবীর-প্রমুখ সন্তগণের ভনিতাযুক্ত অনেকগুলি পুথি সংরক্ষিত আছে। সেগুলির অধিকাংশই বীরভূম অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত। এ থেকে অনুমান হয়, এই সকল সন্ত-কবিদের সাধনমার্গের চর্চা বীরভূমের আলোচ্য আখড়াগুলিতে প্রচলিত ছিল। অদূরে জয়দেবের স্মৃতিপূত কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলীর শ্রীপাটটি নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত। কেন্দুবিল্ব শ্রীপাটের মোহান্তগণও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সাধক। এঁদের গুরুপ্রণালী এইরূপ—মথুরা ধর্মশালা। ক্ষেত্র গোমতী। বৃন্দাবন সুখবিলাস। গোবর্ধন পরিক্রমা। দ্বারাবতি ধাম। রুক্মিণী ইষ্ট। গোপাল উপাসী। বংশগোপাল মন্ত্র।

এই সকল প্রাপ্ত তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, প্রাক্-চৈতন্য যুগে অজয় নদীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে মধ্বাচার্য রামানুজ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ প্রচার লাভ করে। তার মধ্যে তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের প্রচার হয়েছিল বেশী।

তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড অভিঘাতে এই শ্রীপাটগুলি যেমন বিপর্যস্ত হয়েছিল তেমনি ষোড়শশতকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দেশব্যাপী প্লাবনে এগুলি কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তারমধ্যে যে সব শ্রীপাট এই নবপ্রবর্তিত ধর্মধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনে সক্ষম হয়েছিল সেগুলির অস্তিত্ব বজায় ছিল এবং যেগুলি সমন্বয় সাধনে কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছিল

সেগুলি নির্মূল হয়ে যায় চিরতরে। তারপর এসেছে বর্গীর হাঙ্গামা ও অত্যাচার। শ্রীপাট সুপুরের তৎকালীন মোহান্ত গোস্বামী-আনন্দচাঁদের সঙ্গে বর্গীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয়।

সবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ আগমনের ফলে এদেশের ধর্ম-সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের আমূল পরিবর্তনে এই বৈষ্ণব পীঠস্থানগুলির সর্বাত্মক বিলুপ্তি ঘটে।[১]

॥ মধ্যযুগে বাঙ্গালী গ্রাম-সমাজ ॥

মানবদেহের মতো সমাজও অখণ্ড। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার সুবিধার জন্য নগর-পত্তন, জাতিভেদ, অর্থনৈতিক অবস্থা (কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য), জাতকর্ম, নিত্যকর্ম, ব্যাধি ও প্রতিকার, শিক্ষা-প্রকরণ ইত্যাদি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অখণ্ড সমাজের চিত্র পরিবেশনায় যদিও এইরকম বিভাজন কৃত্রিম।

আমাদের আলোচ্য প্রধানতঃ ষোড়শ শতাব্দী। কিন্তু অখণ্ড কাল-প্রবাহে মধ্যযুগের ষোড়শ শতাব্দী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হলেও স্বতন্ত্র একটি বিষয় নয়। তাই পারম্পর্য রক্ষার জন্য পঞ্চদশ শতকে রচিত এবং সপ্তদশ শতকে রচিত কোনো কোনো কাব্য থেকে তথ্যাদি গৃহীত হয়েছে ষোড়শ শতকের ক্রমবিবর্তন দেখানোর জন্য অষ্টাদশ শতকে রচিত কাব্যগ্রন্থ এবং পত্রাদি থেকেও তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদের 'মধ্যযুগের বাঙ্গালী গ্রাম-সমাজ' নামকরণের এইখানেই সার্থকতা।]—গ্রন্থকার

॥ নগর-পত্তন ॥ কৃষিজীবি অস্ট্রিক ভাষাভাষী কৌমগুলির সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা ছিল একান্তভাবে গ্রাম-কেন্দ্রিক। মূলতঃ গ্রামকে কেন্দ্র

১. তথ্যানুসন্ধান উপলক্ষে যাঁরা সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে সিয়ান গ্রামের কালাচাঁদ দাসবৈরাগ্য, অবলাবালা দাসী, বাঁধগোড়া গ্রামের ৺সাতকড়ি মণ্ডল, সুরুল গ্রামের শ্রীননী দাস ঠাকুর, বল্লভপুর গ্রামের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মনোহরপুর গ্রামের শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য এম এ, শ্রীতমালকৃষ্ণ ঘোষ, বিষ্ণুখণ্ডা গ্রামের শ্রীসত্যকিঙ্কর মোহান্ত, নোবড়া গ্রামের শ্রীগণপতি দাসবৈরাগ্য, মহিলডাঙ্গার ভক্ত বৈরাগী, চঞ্চলাবালাদাসী, চেল্লা-কামারপাড়া গ্রামের কংসারি বাসুরি, সুপুর গ্রামের শ্রীনাথচরণ দাসবৈরাগ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। সুদূর গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান সূত্রে পর্যটন সহায়ক রূপে অক্লান্তভাবে সহায়তা করেছেন বিশ্বভারতীর পুঁথিশালার কর্মী আদিত্যপুর নিবাসী শ্রীসুকদেব আচার্য।

করেই তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হতো। তাই সেকালে গ্রামগুলি ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। সেকালের গ্রাম-সমাজ মূলতঃ কৃষিপ্রধান হলেও ব্যবসায়ী ও শৈল্পিক গোষ্ঠীর (Guild) বসবাস ছিল গ্রামাঞ্চলে। সেযুগের স্বর্ণশ্রেষ্ঠী বর্তমান ভুরসুট গ্রামে প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠীগণের নিবাস ছিল।[১]

গ্রাম-প্রধান বাংলাদেশে গ্রাম ও নগরের একটি আদর্শায়িত রূপ গড়ে উঠেছিল সু-প্রাচীন কাল থেকে। কিন্তু সেকালের আদর্শ নগর বিজয়স্কন্ধাবার বা রামাবতী এবং কালকেতু প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরীর বিন্যাসরীতি স্বরূপত ভিন্ন। গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় কৃষিনির্ভর গ্রাম-সভ্যতা এবং বাণিজ্য নির্ভর নগর-সভ্যতা এই দ্বৈত ধারার বিচিত্র সমন্বয় লক্ষণীয়।

॥ নগরবিন্যাস ॥ কবিকঙ্কণের বর্ণনা অনুসারে, নবপ্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে—'চারি চৌরি চতুঃশালা মাঝে পিণ্ডি কাঁচ ঢালা নাছ বাট পাষাণে নির্মিত।' নগরে পাঠশালা নির্মিত হ'লো 'বিবিধ বিচ্ছন্দে'। 'আওয়াসের' (বাস গৃহ) পূর্ব দিকে বিচিত্র কলস সজ্জিত সারিবন্দী বিষ্ণুদেউল। নগরের বাম ভাগে দুর্গামেলা-প্রাঙ্গণ, তৎসংলগ্ন নাটশালা এবং সিংহদ্বার (নগরের প্রবেশ তোড়ণ)। পূর্বদিকে জলাশয়, উত্তরে খড়কি (মূল সং-খড়ক্কি > অধুনা খিড়কি) ও জলহরি (< জলভরিকা = যে পবিত্র পুষ্করিণী থেকে পূজার ঘট ভরা হয়। নগর-চত্বরে স্থাপিত হ'লো শিবমণ্ডপ, অনাথমণ্ডপ এবং অতিথিশালা; বাসাড়ে (< বাসাবাড়িয়া = ভাড়াটে, পর্যটক) জনের জন্য নির্মিত হ'লো দীঘল মন্দির (সম্ভবতঃ অতিথিসদন)।[২]

দোলমঞ্চ সংলগ্ন কদম্ব কানন স্থাপিত হলো নগরের শোভাবৃদ্ধি এবং ধর্মীয় কারণে। 'গিরিসম আলয়' (বৃহৎ অট্টালিকা) মন্দিরাদি নির্মাণে ব্যবহৃত ইষ্টক সরবরাহ করলো কুম্ভকাররা।

নগরের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় (পশ্চিম অংশে) তৈরী হ'লো সারি সারি নমাজগৃহ, দালান ও মসজিদ। এই অংশের স্বতন্ত্র নামকরণ হ'লো হাসনহাটি।

নবপ্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে কৃষকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলো সবচেয়ে বেশী। তাদের সম্মানিত করা হলো ধান্য গরু এবং নগদ টাকা দিয়ে। উপরন্তু রাজা ঘোষণা করলেন—

---

১. বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃ.—৭৯

২. অর্থের বিনিময়ে বাড়ী ভাড়া দেওয়া সেকালে নিন্দনীয় ছিল।

তু. বাসা দিয়া লয় কড়ি মড়ায় পূর্ণিত বাড়ী ঘর তার শ্মশান সমান। —ক. ক. চ.—পৃ. ১১৭

আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ তিন সন বহি দিহ কর ।
হাল পিছে এক তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥
খন্দে নাহি নিব বাড়ি রহে বসে দিব কড়ি ডিহীদার নাহি দিব দেশে ।
সেলামী বাঁশগাড়ী............... .. না লইব গুজরাট বাসে । ইত্যাদি ॥[১]

নবপ্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে ব্যবসায়ী এবং শিল্পীরা এলো দলে দলে। তাম্বুলি-বণিক, গন্ধবাজা, শঙ্খবেনে, সুবর্ণবণিক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, পঞ্চভোহর (স্বর্ণশিল্পী), মালী, বারুই, নাপিত, আগরি, সরাক (<জৈন শ্রাবক, বৃত্তিতে তন্তুবায়, নিরামিষভোজী) গোপ সকলেই তাদের কারবার ফেঁদে বসলো। কামার, কোদালী, কুঠারী, ফাল, টাঙ্গী, আজরাখি, শেল নির্মাণ করতে লাগলো। কাঁসারি নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের পসরা সাজালো আর 'মোদক প্রধান রাণা করে চিনি কারখানা খণ্ড লাড়ু করয়ে নির্ম্মাণ।' এইভাবে বণিকও 'নবশায়ক'গণ নগরের বিভিন্ন ভিতে স্থান পেলো।

ইতর জাতিগণের মধ্যে কলু, বাইতি, বাগদী, মাছুয়া ধোবা, দরজী, সিউলি, ছুতার, পাটনি গুজরাটের একপাশে বসতি স্থাপন করলো। চৌদুলি, চূনারী, মাঝি, কোরঙ্গা, ভরদ্বাজী, মাল, কোল স্থান পেলো নগরের বাইরে।[২] মারাটা, চামার, ডোম, স্বতন্ত্র পল্লীতে নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত হলো। বারবধূগণও বাদ রইল না; গুজরাট নগরের এক ভিতে তার অধিষ্ঠান।[৩] নগরের বাইরে অদূরে স্থাপিত হ'লো দুটি বাণিজ্যকেন্দ্র—'দক্ষিণে বিজয়ী হাট বামে গোলা হাট।'[৪]

রাজধানী, প্রখ্যাত তীর্থস্থান, ব্যবসায় কেন্দ্র, জলপথে বা স্থলপথে যোগাযোগের সুবিধা-ইত্যাদি নানান কারণে নগর গড়ে ওঠে। গুজরাট নগর স্থাপিত হয়েছিল দৈবাদেশে, বনভূমি কর্তন ক'রে। কবির এই পরিকল্পনা ঐতিহাসিক

১. ক. ক. চ—পৃ-৮৪

২. প্রসঙ্গত স্মরণীয়—নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ—চর্যা-১০

৩. ক.ক. চ.—পৃ-৮৮-৯০

৪. ক. ক. চ.—পৃ-৯১, ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে গোলাহাট নামে স্বতন্ত্র একটি পালা আছে।

তথ্যসিদ্ধ।[১] গুজরাট কবিকল্পলোকের কোনো স্থান নয়; বিশেষজ্ঞগণের মতে এই গুজরাট বর্তমান হুগলী জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত গুজরাট গ্রাম।

॥ জাতিভেদ ॥

॥ প্রাক্-কথন ॥ মূলতঃ জাতিভেদকে কেন্দ্র করেই বাঙ্গালী সমাজ। কেবল বাঙ্গালী সমাজ নয় সমগ্র ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার মূলভিত্তি। তাই বাঙ্গালী সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণে জাতিভেদের আলোচনা অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, কোনো এক বিশেষ যুগে আকস্মিকভাবে জাতিভেদ সৃষ্ট হয় নাই; যুগে যুগে সমাজ বিবর্তনের স্বাভাবিক পথ অতিক্রম করে বিভিন্ন বর্ণের উদ্ভব হয়েছে।

বর্ণবিন্যাস আর্যগণের সমাজব্যবস্থার প্রধানতম অবলম্বন।[২] আর্যগণ এ দেশে বসবাস করার ফলে এদেশের সমাজব্যবস্থাতেও এর প্রবর্তন হয়।[৩] আর্য আগমনের পূর্বে এদেশে নিষাদ, কিরাত, শবর, পুণ্ড্র, রাক্ষস, নাগ, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সব জাতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাস করতো তারা মূলে ভারতীয় কি অ-ভারতীয়, অস্ট্রো-এশিয়াটিক কি দ্রাবিড়-মঙ্গোল-গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গঠিত[৪] নৃতত্ত্বের এই জটিল আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর; জনৈক পণ্ডিত এদের আদিম-আর্য, 'প্রাগ্‌ব্রাহ্মণ্যআর্য' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছেন। কালক্রমে এরা সমাজে 'ব্রাত্য' রূপে স্থানলাভ করে।[৫]

॥ চতুর্বর্ণ ॥ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র আর্য-সংস্কারের এই চারবর্ণের বিভাজন সেকালের সমাজে কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছিল, সে এক স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়, পরবর্তিকালে অ-অব্রাহ্মণ যে ছত্রিশবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গজাত সন্তান থেকে সৃষ্ট।

১. পূর্ণিয়ার পশ্চিমে একটি বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল; খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে আবাদী জমিতে পরিণত হয়েছে। বাঁকুড়ার জামকুড়ির বন, হুগলীর গড় মান্দারণের বিস্তীর্ণ আরণ্য এলাকা খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে পরিষ্কৃত হয়। —[বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত (পৃ—৭-৮)]। কবিকঙ্কণের বনভূমি কর্তন করে নগর স্থাপনের পরিকল্পনায় উক্ত ঘটনার পরোক্ষ প্রভাব থাকা সম্ভব। বর্ধমান জেলায় অজয় তীরবর্তী বনকাটি অযোধ্যা গ্রাম নামে অনুরূপ স্মৃতি বিধৃত হয়ে আছে।

২. বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃ—২৫৭

৩. বাংলাদেশের ইতিহাস পৃ-১৫৭

৪. ভারতবর্ষের আদিবাসীর পরিচয় পৃ২৫৩-৭২

৫. সাহিত্য প্রকাশিকা ৪। ভূ. পৃ—১৬৩

এই মিশ্রণের প্রকৃতি অনুসারে, বৃহদ্ধর্ম পুরাণে ছত্রিশটি বর্ণকে—উত্তম-সংকর, মধ্যম-সংকর ও অধম-সংকর এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে ছত্রিশটি বর্ণের উল্লেখ থাকলেও তালিকায় একচল্লিশটি বর্ণের নাম আছে।[১] সুতরাং এইরূপ অনুমান অসঙ্গত হবে না যে তৎকালীন সমাজে তালিকা-বহির্ভূত আরও অনেক বর্ণের অস্তিত্ব ছিল এবং তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে, সুতরাং এই বিভাজন অনেকাংশে কৃত্রিম এবং সমাজব্যবস্থা এই নিয়ম অনুসারে চলে নাই।

॥ ব্রাহ্মণ্য শাসন ॥ হিন্দু সমাজ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য-শাসিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের ফলে এই সমাজ প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিল কিন্তু স্থিতবস্থ এই সমাজে ব্রাহ্মণ্য শাসনের সনাতন ধারা ক্ষুন্ন হয় নাই।[২] ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশে তথা সমগ্র পূর্বভারতে জনমানসে যে নবজাগরণের চেতনা প্রবাহিত হয়েছিল তার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য যেমন অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছিল তেমনি ধর্মশাস্ত্রগুলিরও নবমূল্যায়ণ ঘটেছিল এবং তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্মার্ত রঘুনন্দন, দেবীবর প্রমুখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দন বিপর্যস্ত সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা প্রচারিত করে সমাজকে রক্ষা করেছিলেন।[৩]

॥ সংগৃহীত তথ্যালোচনা ॥ বাঙ্গালাদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের আগমন সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত এবং এ সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। সেগুলির উল্লেখ বা মূল্যায়ণ বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর ; তবে একথা ঐতিহাসিক সত্য যে ব্রাত্য-প্রধান এই সমাজে ব্রাহ্মণগণের স্বাতন্ত্র্য সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। আর্য-শূদ্র বিবাহের মতো এদেশে আগত ব্রাহ্মণগণের অনুলোমবিবাহ সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৪] জীমূতবাহন তাঁর দায়ভাগ গ্রন্থে অনুলোম-পরিণীত স্ত্রীদের গর্ভজাত পুত্রদের ধনবণ্টনের ব্যবস্থা দিয়েছেন।[৫] শূদ্র স্ত্রীগ্রহণ ছাড়াও

---

১ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, এই গ্রন্থে তিন পর্যায়ে ছত্রিশটি উপবর্ণ বা জাতের কথা বলা হয়েছে কিন্তু তালিকাভুক্ত হয়েছে একচল্লিশটি জাত। ছত্রিশটি ছিল বোধ হয় আদি সংখ্যা পরে আরও পাঁচটি উপবর্ণ এই তালিকায় ঢুকিয়া পড়িয়া থাকিবে। বা.ই—পৃ ৩০৩

২. বা না ই – ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃ-২৫৭

৩ সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন—ভূ. পৃ-১

৪. বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—জাতিভেদ পৃ-৪৬-৪৯

৫. " " " " পৃ-২৬৬

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে গুপ্ত ব্যাভিচার এবং মিথুনমৈত্রীর নানা কাহিনী সমকালীন্ সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই অন্ত্যজ রমণী-প্রীতি সম্ভবতঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে[১] এবং কালক্রমে এঁরা বেদবিহিত আচার-অনুষ্ঠানে অক্ষম হয়ে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণরূপে ব্রাহ্ম-সমাজে স্থান লাভ করেন।[২]

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু-প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতির আগমনের বর্ণনা থেকে তৎকালীন্ সমাজে বর্ণ-বিন্যাসের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। সেকালেও কুলীন ব্রাহ্মণেরা ছিলেন মুখটি, চাটতি, বন্দ্য-পদবীযুক্ত এবং ঘোষাল, কাঞ্জীলাল, গাঙ্গুলী[৩]-পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণগণ অ-কুলীন। এদের মধ্যে পুতিতুণ্ড, রাইগাঁই, ঝিকরাড়ী, মালখণ্ডী, পলসাঁই, কুসুমগাঁই, সাঁইগাঁই ইত্যাদি নানা গাঞীভেদে বিভক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বেদবিহিত আচারে অভ্যস্ত ছিলেন। 'গ্রামযাজী' মূর্খ বিপ্রের-ও অভাব ছিল না। এছাড়া ঘটক, গ্রহবিপ্র[৪], সপ্তশতী[৫] ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১. নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ। ছোই ছোই জাই সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ। চর্যা-১০
ব্রাহ্মণ মণস চণ্ডালিএঁ তুটঠা। ......মাউগ চণ্ডালী ব্রাহ্মণে পইসই।
দেখু চণ্ডালীর ব্রাহ্মণ জার। পাঞ্চ নম ভইল একাকার।—বিনয়শ্রী

২. ব্রাহ্মণ বৃত্তিভেদে দশ প্রকার যথাক্রমে—দেব, দ্বিজ, ক্ষাত্র, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল ব্রাহ্মণ. Kane—P-130। সমাজে বর্ণের ব্রাহ্মণরূপে এখনও এদের অস্তিত্ব আছে। ডোম-পণ্ডিত মুচি-পণ্ডিতেরা ধর্মঠাকুরের পুরোহিত। উপবীতধারী আর্যচণ্ডাল ও আর্য ভাষাভাষী ডোম সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য—বা. সা.ই-১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃ—৯

৩. মিথিলার গঙ্গৌলি মূলগ্রামী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সমাজের গাঙ্গুলী অভিন্ন। চি.প.স—১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃ—১৬৪

৪ গ্রহবিপ্রগণ শাকদ্বীপি নামেও পরিচিত। কথিত আছে, গরুড় শাকদ্বীপ থেকে এঁদের মধ্যদেশে আনয়ন করেন। বা. দে. ই. পৃ—১৮৩

৫. কুলজী গ্রন্থের মতে, এঁরা সাতশত ঘর বর্তমান ছিলেন, তাই এঁরা সপ্তশতী নামে পরিচিত। এ ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। আসলে এঁরা সপ্তশতী বা চণ্ডী চর্চা করতেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে উল্লেখ আছে 'শতেক ব্রাহ্মণ নিত্য পড়ে সপ্তশতী—ক.ক.চ. পৃ-৪৫

অতঃপর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির আগমন বর্ণিত হয়েছে। কবি ক্ষত্রিয় অর্থে মূলতঃ ভানুবংশ এবং চন্দ্রবংশসম্ভূত মহাজন এবং মল্লযোদ্ধাদের কথাই বলেছেন। প্রাচীন তাম্রশাসনে ক্ষত্রিয়ের 'চন্দ্র' 'সোম' ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য উপাধি থেকে পণ্ডিতগণ মনে করেন এঁরা মূলতঃ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন; পরে ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ অর্থাৎ বাহুবল প্রয়োগে কুশলতা প্রদর্শন করে সমাজে ক্ষত্রিয়রূপে স্থান পেয়েছিলেন[1]। কবিকঙ্কণের ভানুবংশ বা চন্দ্রবংশের উল্লেখ এই ঐতিহ্যের স্মৃতিবাহী হওয়া সম্ভব। বাহুবল প্রদর্শন বা অন্য কোনো কারণে এদেশের প্রাগার্য আদিম অধিবাসিগণ কালক্রমে বর্ণাশ্রমি সমাজে ক্ষত্রিয়রূপে সম্মানিত হয়েছিলেন।[2] সৈন্যদলে বা পুরীরক্ষার কাজে ডোম চোয়ার প্রভৃতি জাতির উল্লেখ মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়।[3]

বৈশ্য অর্থে কবিকঙ্কণ প্রধানতঃ কৃষক, গোরক্ষক এবং ব্যবসায়ীদের কথা বলেছেন। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত, কর পদবীযুক্ত বৈদ্যগণের বর্ণনায় কবি একাধারে বাস্তবনিষ্ঠা ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অগ্রদানী ব্রাহ্মণরাও বৈদ্যগণের সঙ্গে মুমূর্ষু রোগীর সন্ধানে সদাব্যাপৃত থাকতেন।

নগরের 'দক্ষিণ আওয়াসে' বসতি স্থাপন করলো কায়স্থ মহাজনগণ। তাদের মধ্যে কুলপ্রধান বসু, মিত্র, ঘোষ এবং অকুলীন পাল, পালিত নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, রাহা পদবীযুক্ত সকলেই বসবাস করতে লাগলো নির্বিবাদে।

গুজরাট নগরে বণিক ও নবশায়কদের আগমন হলো যথারীতি। এদের মধ্যে কৃষিকর্মে অভ্যস্ত 'গোপ'-নামক একটি জাতির উল্লেখ আছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণোক্ত তালিকায় 'উত্তম শংকর' পর্যায়ে 'গোপ' বর্ণের উল্লেখ আছে। তারা বৃত্তিতে লেখক। বর্তমানে এদেশে কৃষিকর্মে অভ্যস্ত সদ্‌গোপ' জাতি এদের বংশধর হতে পারে।

অতঃপর 'বণিক এবং নবশায়ক' গণের আগমন বর্ণিত হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, অনুলোম বিবাহের ফলে সমাজে বিভিন্ন শংকর-বর্ণের উৎপত্তির ফলে জাতিভেদের কঠোরতা প্রবল রূপ ধারণ করে নাই। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পান-ভোজন সম্পর্কিত বিধি নিষেধের কঠোরতা ক্রমশঃ গড়ে

১. জাতিভেদে পৃ—১৩৮, ২০০

২. ঐ পৃ-১৩৫-৩৬

৩. চৌদিকে চোয়াড় পুরী রক্ষিবার—ঘনরাম পৃ-.
চোয়াড়ে লোকে কাঁড়—ভারতচন্দ্র পৃ-৭৫৯

ওঠে পরবর্তিকালে।[১] রঘুনন্দন সেকালের সমাজে ব্রাহ্মণেতর ভদ্র জাতিগুলিকে 'সৎশূদ্র' আখ্যা দিয়েছেন। ভট্টপল্লী থেকে আবিষ্কৃত ১৫১০ খ্রীঃ রচিত বলে কথিত আনন্দভট্টের বল্লাল-চরিত নামক একখানি সংস্কৃত পুস্তিকায় বলা হয়েছে—গোপ, মালী, তাম্বুলী, কাংসার, তন্ত্রি, শাংখিকা, কুলাল (কুম্ভকার), কর্মকার এবং নাপিত এই নয়টি বর্ণ নবশায়ক ; তৈলিক, গান্ধিক এবং বৈদ্য সৎশূদ্র ; সৎশূদ্রদের মধ্যে সর্বোত্তম কায়স্থ।[২] এছাড়া এদেশে বহুল প্রচলিত লৌকিক ছড়ায় নবশাখ-ভুক্ত নয়টি বর্ণের এই রকম উল্লেখ পাওয়া যায়—তিলি-মালী-তাম্বুলী, গোপ নাপিত-গোছালি,[৩] কামার-কুমার-পুঁটুলী (গন্ধবণিক)। কবিকঙ্কণ নবশায়কদের বর্ণনায় যথাক্রমে—তেলী, কামার, তাম্বুলী, কুম্ভকার, তন্তুবায়, মালী, বারুই (বারুজীবি), নাপিত, আগরী, মোদক, সরাক (তন্তুবায়), গন্ধবাণ্যা, শঙ্খবেনে, কাঁসারি সুবর্ণবণিক, পশ্যতোহর (স্যাকরা) এবং পল্লব-গোপ জাতির উল্লেখ করেছেন। এই জাতিগুলির মধ্যে সেকালে জল-আচরণীয় ছিল কিনা জানা যায় না ; তবে প্রত্যেকটি জাতি নিজ নিজ বৃত্তির দ্বারা সেযুগে সমাজসেবা করেছিল এবং এযুগেও করে চলেছে।

কবিকঙ্কণের বর্ণনায় সেযুগে সমাজের ইতর জাতিগুলির নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। কলু, বাইতি, বাগ্দি, মাছুয়া, কোচ, ধোবা, দরজী, সিউলি, ছুতার, পাটনি, চৌদুলি, চুণারী, মাঝি, কোরজা, ভরদাজী, মাল, চণ্ডাল, মারাটা, কোল, হাড়ি, চামার, ডোম সেকালে ইতর জাতিরূপে বিবেচিত হ'তো।

'রাঢ়'-শব্দটি জাতিবাচক কি না এ বিষয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে। 'রাঢ়' জাতিবাচক শব্দ নয়—এই বিশ্বাসের প্রতি বর্তমানে কোনো কোনো পণ্ডিতের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু রাঢ' সম্পর্কে কবিকঙ্কণের উক্তি[৪] এবং বীরভূম অঞ্চলের প্রবাদ[৫] থেকে রাঢ় শব্দটি যে জাতিবাচক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। জৈন প্রজ্ঞাপণা গ্রন্থে বঙ্গ ও লাড় (রাঢ়) কোম দু'টিকে আর্য কোম বলা হয়েছে।[৬] পরবর্তিকালে এই লাড়

১. সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন পৃ. ২৭৩
২. মধ্যযুগে বাংলা পৃ. ৪২২-২৩
৩. সম্ভবতঃ মাহিষ্য ; কারণ গুছাইত পদবী এদের মধ্যে প্রচলিত আছে।
৪. কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়। ক. ক. চ. পৃ. ৭৭
আমার দেশের কাঁকড়া রাঢ় চোয়াড়ে খায়। ঐ পৃ. ১৯৯
৫. বীরভূম অঞ্চলের প্রবাদ—ওমা রাঢ়ে ছুঁয়ে দিলে। রাঢ়র সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর পৃ.
৬. বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃ. ২৬৮-৬৯

বা রাঢ় জাতি সমাজে অন্ত্যজরূপে স্থান পেয়েছিল। কবিকঙ্কণের কাব্যে অন্যত্র বলা হয়েছে—ব্যাধ গো হিংস্র রাঢ়। এ থেকে অনুমান হয়, পশুবধ ছিল এদের উপজীবিকা।

চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয় কাব্যে 'ডিঙ্গাল' নামে একটি জাতির উল্লেখ আছে।[১] ধর্মপুরাণকার যাদুনাথ 'ডাঙ্গর'-জাতির উল্লেখ করেছেন।[২] ডাঙ্গর এবং ডিঙ্গাল অভিন্ন জাতি। চর্যাপদের যুগে এরা ছিল দুর্ধর্ষ লুটেরা—অদয় দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।[৩] (=নির্দয় দঙ্গাল দেশ লুটিল)। 'ডাঙ্গলে কালী' এদেরই পূজিতা দেবী। 'ডাঙ্গাল', 'ডাঙ্গালপাড়া' ইত্যাদি নামযুক্ত গ্রামে এই জাতির বসতি ছিল। 'ডাঙ্গলে' পদবীযুক্ত ভদ্রেতর জাতির অস্তিত্ব এখনও এদেশে আছে।

॥ মুসলমান সমাজে জাতিভেদ ॥ এদেশে আগত পাঠানরা মূলতঃ সাবানি, লোহানি, লোদানি ও সুরয়ানি[৪] এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। পরে সম্ভবতঃ হিন্দু সমাজের অনুকরণে এদের মধ্যে অনেক উপবর্গের সৃষ্টি হয়েছিল মূলতঃ বৃত্তিভেদের ভিত্তিতে।[৫] এই ভেদ ধর্মত না হলেও এর সামাজিক মূল্য ছিল যথেষ্ট।

তবে মুসলমান সমাজের এই জাতিভেদ হিন্দুদের মতো প্রবল আকার ধারণ করে নি। সপ্তদশ শতকের কবি রূপরাম চক্রবর্তী মুসলমানের একতার উল্লেখ করেছেন—এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়।[৬]

॥ জাতিভেদ সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের উদারতা ॥ জাতিভেদ সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উদারতা সুবিদিত। শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসী যদি পুনরায় বিবাহ ক'রে সংসারী হন তবে তিনি ও তাঁর বংশ পতিত হয়; সমাজে তিনি 'বান্তাশী' রূপে উপহসিত হন।[৭] নিত্যানন্দ প্রভু যখন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তখন তিনি অনাচরণীয় শূদ্রের অন্নগ্রহণ করতেন।

১. সত্তাকারে বেচ পিঞা ডিঙ্গালের ঘরে গৌরাঙ্গ বিজয় পৃ. ৬৭
২. আইল ডাঙ্গর মুখচুষী ধর্মের জননী পৃ. ৯
৩. চর্যা ৪৯
৪. সাবানি লোহানি আর লোদানি সুরয়ানি চার পাঠান বসিল নানা জাত। ক.ক.র. পৃ. ৮৬
৫. দ্র. ক. ক. চ. পৃ. ৮৬
৬. ম. বা. বা. পৃ. ৬
৭. গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা পৃ.৬১

পরে তিনি একাধিক শূদ্রকন্যা বিবাহ করেন। বসুধা দেবীর সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয়েছিল প্রচলিত রীতিতে কিন্তু জাহ্নবা দেবী বাগদত্তা এবং ঠাকুরাণী যৌতুকে প্রাপ্তা। শেষোক্ত দুইজনের সঙ্গে শাস্ত্রবিহিত নিয়মে বিবাহ হয় নাই।[৮] বীরভদ্র-প্রভু জাহ্নবা দেবীর গর্ভজাত সন্তান কিন্তু এই বীরভদ্র ও জাহ্নবার ধারা এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে মাননীয় গুরুর পদবীতে অধিষ্ঠিত। কায়স্থ কুলজাত হয়েও রঘুনাথ দাস ছয়গোস্বামীর অন্যতম রূপে বৈষ্ণব সমাজে অদ্যাপি পূজ্য। সুবর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্তকে দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম রূপে পূজা করতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

কিন্তু চৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচরবর্গের মধ্যে জাতিভেদ সম্পর্কিত রক্ষণশীলতা বজায় ছিল পূর্ণমাত্রায়। শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখ আচার্যগণ ছিলেন রক্ষণশীল। সামাজিক ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্য শাসন এঁরা মেনে চলতেন কঠোরভাবে। পক্ষান্তরে, ঘনশ্যাম দাসের গুরু জয়গোপাল দাস উচ্চনীচ জাতিভেদ মানতেন না। সেইজন্য এঁরা জয়গোপাল দাসকে বর্জন করে ছলেন। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে ভক্ত ও ভক্তিধর্ম প্রচারক রূপে জয়গোপাল দাস ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্তু বৈষ্ণব মহান্তরা এঁকে পরিত্যাগ করায় ইতিহাস এঁর সম্পর্কে নীরব হয়ে গেছে।[৯]

॥ বঙ্গীয় অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট ॥ কৃষি ॥

॥ প্রাক্‌কথন ॥ বাঙ্গালাদেশ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান ভূভাগ। এখানকার ভূপ্রকৃতি কৃষিকর্মের অনুকূল। এদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে এবং গ্রামবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকর্ম। গ্রামাঞ্চলে সাধারণে বহুল-প্রচলিত কৃষিবিষয়ক ডাক ও খনার বচনগুলি থেকে অনুমান হয়, কৃষিকার্য বাঙ্গালীর প্রাচীনতম বৃত্তি-বিশেষ।

॥ কৃষিজাত পণ্যাদি ॥ কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের একচত্বারিংশৎ প্রকরণে সীতাধ্যক্ষ বা কৃষিকর্মাধ্যক্ষের কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন। মহাকবি কালিদাসের 'আপাদপদ্মপ্রণতাকলমাইবতেরযুম্'—বর্ণনায় বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ

৮. এঁদের কাহিনীর বিস্তৃত আলোচনা আছে যদুনন্দনের 'সংগ্রহতোষণী'তে।

৯. বা. সা. ই—পৃ-৪২৬, ৫০৮

সুপ্রসিদ্ধ 'কলমা' ধানের কথা বলা হয়েছে।[১] প্রাকৃত ছড়ায় "ওগ্‌রা' চালের উল্লেখ আছে। সিদ্ধাচার্য ভুসুকুর রচনায় আমন ধানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে শতাধিক প্রকার ধান্যের নাম আছে।[৩]

ধান ছাড়া চর্যাগীতিতে কঙ্গুচিনা[৪] ও কার্পাসের উল্লেখ আছে কৃষিজাত পণ্যরূপে। একসময়ে দক্ষিণ রাঢ়ে কার্পাস-চাষ বহুল-প্রচলিত ছিল। এখনও সেখানে দো-ফসলের জমিকে 'কাবাসে জমি বলা হয়। সেকালে দো-ফসলকে বলা হ'তো কর্পফসল।[৫] এদেশে আখচাষের ঐতিহ্য-ও সুপ্রাচীন। ইক্ষুজাত গুড়ের সঙ্গে 'গৌড়' নাম সম্পৃক্ত বলে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল; বর্তমানে এ ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে। ইক্ষু-ক্ষেতের দেবতা পণ্ডাসুর পুণ্ড্রাসুরের বিবর্তন-জাত হতে পারে। পুণ্ড্র-জাত আখ 'পুঁড়ি' আখরূপে অদ্যাপি সুবিখ্যাত। আখমাড়াই শালের কৃত্য ও সাজসরঞ্জামের নাম ও বিবরণ থেকে বোঝা যায় আখচাষ বহু পুরাতন কাল থেকে বাঙ্গালীর সর্বপ্রাচীন বৃত্তিরূপে আদৃত হয়ে আসছে।

আমাদের আলোচ্য শতাব্দীতে ধান ছাড়াও গম, তিল, মুগ মাষ, বুট, সর্ষপ কার্পাস—ইত্যাদি ছিল প্রধান কৃষিজাত পণ্য।[৬] চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে সুগন্ধি অন্নের বহুল বর্ণনা[৭] থেকে অনুমিত হয় নানাপ্রকার সুগন্ধি সৌখীন ধানের চাষ সেযুগে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

। **কৃষি প্রকরণ** । পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কৌটিল্য তাঁর অর্থ-শাস্ত্রের একচত্বারিংশ প্রকরণে সীতাধ্যক্ষ বা কৃষিকর্মাধ্যক্ষের কর্তব্য নির্ধারণ

১ ম. বা—পৃ—৩৬২

২ গঅণে উঠি চরস্ব অমন ধাণ ॥ - চর্যা - ২১

৩ শূণ্যপুরাণ—পৃ—১৯১-৯৪

৪ কঙ্গুচিনা—চীনাঘাসের বীজ

৫ দি-প-স-১ম খণ্ড পূর্বার্ধ - পৃ—৫২৩

৬ গোম তিল মুগ মাস বুট সর্ষপ কার্পাস সভায় পূরিত নিকেতন। ক. ক. চ পৃ—৮৮

৭ গন্ধকস্তুরি ধান্যের দিব্য অন্ন দিল। গো. বি—পৃ—৭৫

করেছেন। অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত কৃষি-প্রকরণ বাঙ্গালাদেশে অদ্যাপি অনুসৃত হয়; তবে তার কালোপযোগী পরিবর্তন ঘটেছিল অবশ্যম্ভাবী কারণে।

শস্য উঠবার উপযোগী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিরূপিত হয়েছে—জাঙ্গল বা মরুভূমির মতো উচ্চ দেশসমূহে। ষোড়শদ্রোণ পরিমিত বর্ষণ জল জমা হলে তা শস্য উৎপাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত বর্ষণের সূচনা বলে গণ্য হবে। অনুপ বা জলাদেশে এর দেড় গুণ অর্থাৎ চব্বিশ দ্রোণ বর্ষা পর্যাপ্ত বলে গৃহীত হবে। 'আহার' নামক বৃহৎ জলাশয়ে জল সঞ্চিত রেখে প্রয়োজন অনুসারে সেচ ব্যবস্থা উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের অনেক স্থানে প্রচলিত ছিল। তবে ষোড়শ শতাব্দীর দিকে এই ব্যবস্থার প্রচলন কমে যায়, বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা থেকে ধারণা হয়, তখন বৃষ্টিপাত-ই ছিল কর্ষণোপযোগী জলের একমাত্র উৎস।[১]

॥ সংগৃহীত তথ্যালোচনা ॥ কবিশেখর দৈবকীনন্দনের গোপাল-বিজয় কাব্যে উপমা প্রয়োগে কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশের চিত্র পরিস্ফুট।[২] কবি-কঙ্কণ নিজবৃত্তির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন—"দামিন্যায় চাষ চষি নিবাস পুরুষ ছয় সাত।" ব্রাহ্মণরা সচরাচর হাল ধরতেন না, কৃষিকর্মের জন্য তাঁদের কৃষাণ নিযুক্ত থাকতো। সম্পন্ন জোতদারও কৃষিকর্মের জন্য বেতন-ভোগী কৃষাণ নিযুক্ত করতেন।

'ক্ষেত্রকর্মে অতি দড়' অর্থাৎ প্রথমশ্রেণীর কর্মঠ কৃষাণরা পারিশ্রমিক দাবী করতো ত্রিসন্ধ্যা ভোজন চারিখানি বস্ত্র এবং একমাসে এক তঙ্কা। কিন্তু বস্ত্র ও নগদ টাকার ব্যাপারে জোতদার দর কষাকষি করতো হামেশাই। তাদের দাবী একখানি বস্ত্র ও তিনসন্ধ্যা ভোজন।[৩] অবশ্য এই দরাদরির ব্যাপারে সম্পর্কে গ্রন্থে কোন ইঙ্গিত নেই থাকলে ইতিহাস সর্বাঙ্গসুন্দর হ'তো। বিপ্রদাসের কাব্যে হাল চালনার একটি মনোরম বর্ণনা আছে—

১ দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয়। ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়। চৈ ভা. পৃ ১৪

২ লাঙ্গলের ঈষ সম বক্র দশন।
ইক্ষুবন সম যার ভ্রূ হি যুগলে ॥ গোপালবিজয় পৃ ৪১

৩ একখানি বস্ত্র লইয়া তিন সন্ধ্যে অন্ন খাইয়া থাক বুড়া বাটীতে আমার। —মনসাবিজয় পৃ—১৬৩

শস্তেক কৃষাণ সদা আছে নিয়োজিত। চষিতে গমন কৈল বড় হরষিত॥
জোয়ালি জুড়িয়া গরু লৈল খেদাইয়া। হরিষে চলিল হাথে পাচনি লইয়া॥
বুহিতা বাকুড়ি গিয়া দিল দরশন। লাঙ্গল জুড়িয়া চাষ চষে সর্ব্বজন॥[১]

তুষ উড়িয়ে ধান সংস্কার করার উল্লেখ আছে চৈতন্যচরিতামৃতে—ধান্য রাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে। পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে॥[২]

কৃষিপ্রধান পল্লী-বাঙ্গালায় এই চিত্র চিরন্তন। ধান তিল, কলাই প্রভৃতি শস্য 'মড়াই' এ সংরক্ষিত থাকতো।[৩] কাপাস সংরক্ষিত থাকতো ডোল[৪] এবং 'মালু'তে।[৫]

॥ জমির পরিমাপ ॥ এদেশে জমি সাধারণতঃ 'আল' দিয়ে খণ্ড করা থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তির পরিমাণ অনুসারে এই খণ্ড ছোট-বড়ো হয়। বৃহৎ ভূমিখণ্ড অর্থে 'বাকুড়ি' শব্দের প্রয়োগ গ্রামাঞ্চলে অদ্যাপি প্রচলিত।

পূর্বে নল দিয়ে জমি মাপা হতো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে নলের দৈর্ঘ্য ভিন্ন রকমের ছিল। সমতটীয় নল ও বৃষভঙ্কর নলের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে জমির পরিমাণ-সূচক কুল্যবাপ' ও 'দ্রোণবাপ' এই দুটি নামের ব্যবহার হতো।[৬] এই কুল্যবাপ থেকে কুড়া শব্দের উদ্ভব হতে পারে। বিপ্রদাসের কাব্যে 'কুড়ি'[৭] শব্দের প্রয়োগ আছে। কবিকঙ্কণের বর্ণনায় 'কুড়া' শব্দ বিঘা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।[৮] প্রচলিত নিয়মে ১ বিঘা=২০ কাঠা। কিন্তু ডিহিদার মামুদ সরিপের আমলে অধিক খাজনা আদায়ের জন্য জমির পরিমাণের কৃত্রিম বৃদ্ধি করা হলো ২০ পরিবর্তে পনর কাঠায় কুড়া' হিসাব করে।

॥ ভূমিস্বত্ব ও ভূমিরাজস্ব ॥ যারা জমি চাষ করতো তাদের জমির স্বত্ব কি রকম ছিল, রাজা অথবা জমিদারকে কি হারে খাজনা দিতে হ'তো

১ মনসাবিজয়—পৃ—৬৩
২ চৈতন্যচরিতামৃত পৃ - ২৫০
৩ কত গণ্ডা উড়ে গেল ধানের ধানের মড়াই। রূপরামের ধর্মমঙ্গল পৃ - ১০১
৪ স্রোতে ভাসি গেল মোর কাপাসের ডোল। ক. ক. চ - পৃ - ৮০
৫ তিলের মরাই উড়ে কাপাসের মালু॥ —রূপরামের ধর্মমঙ্গল পৃ - ১০১
৬ চ প. স - ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃ - ৭০১
৭ বাকুড়ি একেক কুড়ি এনাম পাইব। পৃ ৬৬
৮ মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া নাহি শুনে প্রজার গোহারি। ক. ক. চ ৬

প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না কাব্যে। কবিকঙ্কণের বর্ণনায় ভূমিরাজস্ব সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। কালকেতু নবনির্মিত গুজরাট নগরে রাজস্ব নির্ধারণ করলেন 'হাল পিছে একতঙ্কা'।[১] তবে তিনি নবাগত প্রজাদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করেছিলেন, দেশে প্রকৃত রাজস্বের হার স্বভাবতই এর চেয়ে অনেক বেশী ছিল।

দেশের অভ্যন্তরে রাজস্ব আদায় কর্মে পাঠান রাজারা সম্পূর্ণরূপে হস্তক্ষেপ করেন নাই। স্থানে স্থানে শাসন ও শান্তিরক্ষার নিমিত্ত যেসব জায়গীরদার ছিলেন তারা এ ব্যাপারে হিন্দুদের উপর নির্ভর করতেন। এজন্য পাঠান অধিকারকালে বহু হিন্দু-ভূস্বামী ও অধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] ভাতুরিয়া অঞ্চলের ভূস্বামী গণেশ গৌড়ে রাজা হয়ে সেকালের হিন্দু জমিদারের অসীম শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাহেরপুরের রাজারাও প্রবল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। গৌড় অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ও সপ্তগ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার হিরণ্য ও গোবর্ধনের কাহিনী চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে সবিস্তারে।[৩] এঁদের আদায় ছিল বিশ লক্ষ টাকা, জমা দিতে হতো আট লক্ষ, ফলতঃ এঁরা বারো লক্ষের অধিকারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এই ধনশালী হিন্দুরাই তখন কৃষি-বাঙ্গালার মালিক। নবাবগণের অনুগ্রহপুষ্ট তালুকদারের নাম ছিল 'নিয়োগী' 'চৌধুরী'।[৪] এক কোটি 'দাম' রাজস্ব আদায়কারীর নাম ছিল 'কড়োরি'। তাঁদের ক্ষুদ্র রাজ-রূপের নাম ছিল 'ভূঞা'। প্রাচীনকালে প্রজারা পুরুষ-পরম্পরায় একইস্থানে বসবাস করে জমির দখলিস্বত্ব অর্জন করতো। মুঘল আমলে নানাশ্রেণীর মধ্যে স্বত্বাধিকারী ভূস্বামী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রজার ভূস্বত্ব ক্রমে সংকুচিত হয়ে পড়ে।[৫]

১ ক ক. চ—পৃ—৮৪

২ ম. বা - পৃ - ১৪০

৩ চৈ. চ-অ-৬/১৮ - ৩২

৪ সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥ ক.ক.চ -পৃ ৬

৫ চি প স - পৃ ৩০৩

শেরশাহ (খৃঃ১৫৩৯-৪৫) দেশকে কতকগুলি সরকার ও পরগণায় বিভক্ত করেন। আমিন দ্বারা প্রত্যেক রায়তের জমি স্বতন্ত্র ক'রে ফসলের এক চতুর্থাংশ রাজস্ব ধার্য করেন। রাজস্ব নগদ্ বা ফসলের মাধ্যমে আদায় দেওয়া হতো। প্রত্যেক রায়তকে তার ভূসম্পত্তির কবুলিয়ত দিতে হ'তো। রায়ত পাট্টা পেতো।[১] সাধারণতঃ রাজস্ব আদায় করতেন মুকাদ্দম; সরাসরি আদায় দেওয়ার রেওয়াজও ছিল।

শেরশাহের ব্যবস্থায় রাজস্ব-আদায়-পরিদর্শন এবং প্রজাদের স্বত্বরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতি পরগণায় সরকারী আমিল্, শীকদার ও কারকুন নিযুক্ত হবার নিয়ম ছিল। রাজপথে বা নিজ নিজ এলাকাভুক্ত অঞ্চলে চুরি রাহাজানি প্রভৃতির নিমিত্ত এই সময় থেকে চৌধুরী ও গ্রামমণ্ডলদের দায়ী করা হ'তো। জমিদারী বন্দোবস্তের হিসাব রক্ষার জন্য 'কানুনগো' নিয়োগ প্রথা পাঠান আমলেই প্রবর্তিত হয়। আকবরী ব্যবস্থায় শেষে পরগণা কানুনগোর উপর একজন প্রধান কানুনগো নিযুক্ত হয়েছিলেন। মহালের বন্দোবস্ত পর্যবেক্ষণের জন্য 'ডিহিদার' থাকতো। তারা প্রজারক্ষার ভার পেলেও সময়ে চৌধুরী ও জমিদারের উৎকোচের লোভে ভক্ষকে পরিণত হতেন। কবিকঙ্কণ-বর্ণিত ডিহিদার 'মামুদ শরীফ' তার কলঙ্কময় দৃষ্টান্ত।[২] মুসলমান থানাদার ও ডিহিদারের সাময়িক অসদাচরণের কথা কাব্যাদিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু এই শ্রেণীর অত্যাচার প্রকৃতক্ষেত্রে হতো কদাচিৎ।[৩]

জায়গীরের অধীনে যে সকল চৌধুরী ও জমিদার ছিল তাদের কথা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ভূস্বামীদের অবস্থা আলোচনা করলে দেখা যায়, সেকালের জমিদার বর্তমানের মতো ভূমিতে স্বত্ববিশিষ্ট ভূম্যাধিকারী না হলেও দেশীয় প্রথামতো পুরুষানুক্রমে আদায়কারী হওয়ায় কালক্রমে স্বত্বাধিকারীতে পরিণত হতেন। 'অর্ধ-ভূমি-গ্রাম' দিয়ে তারা প্রজাকল্যাণ সাধন করতেন। ধর্মার্থে দান, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচিত হ'তো। এছাড়া,

---

১ ম. বা - পৃ - ৩০১-২ ; কবিকঙ্কণের কাব্যে পাট্টার উল্লেখ আছে—হাল পিছু এক তঙ্কা কাহে না করিহ শঙ্কা পাট্টায় নিশান মোর ধর। ক.ক.চ - পৃ - ৮৪

২ ম. বা - পৃ ২০৪

৩ ঐ ঐ - পৃ. - ২০৪

গুণীজন সম্বর্ধনা, কাব্যরচনায় পৃষ্ঠপোষকতার বহু কাহিনী মধ্যযুগের কবিদের আত্মকাহিনীতে বিধৃত আছে।

কৃষি ছিল সম্পদের মূল। আর কৃষকের শ্রম-ই ছিল সেযুগে উৎপাদনের প্রধান উৎস। সমাজের উন্নতি কৃষকের উন্নতির উপর নির্ভরশীল এই সত্য উপলব্ধির অভাব সম্ভবতঃ সে যুগে ঘটে নাই। কালকেতুর নব-প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে কৃষকদের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হ'লো এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলো সবচেয়ে বেশী।[১]

॥ **কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি** ॥ দেশের মৌল সম্পদ ছিল কৃষি। আর প্রধান কৃষিজ সম্পদ ছিল ধান। জনগণের হাতে নগদ অর্থ আসতো ধান বিক্রি করে।[২] একালের মতো সেকালেও ধানের দর ওঠা-নামায় দেশের আর্থিক অবস্থার নির্দেশ পাওয়া যেতো। হরিদাস ফুলিয়ায় উচ্চৈস্বরে হরিসংকীর্তন আরম্ভ করায় সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভেবেছিল যে এর ফলে দেশের অকল্যাণ হতে পারে। প্রতিরোধের উপায়ও তারা ঠিক করে রেখেছিল—যদি ধানে কিছু মূল্য চড়ে। তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে।[৩] আখেরে কি ফল হয়েছিল তার নির্দেশ চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায় না।

॥ **শিল্পকলা** ॥ বাংলাদেশ মূলতঃ কৃষিপ্রধান ভূভাগ হলেও এদেশে শিল্পচর্চার অপ্রতুলতা ঘটে নাই। বয়ন তক্ষণ, ধাতু, মৃৎ ও অন্যান্য শিল্পে বাঙ্গালী অতিপ্রাচীন কাল থেকেই ঐতিহ্যের অধিকারী।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ক্ষৌম, দুকূল, পত্রোর্ণ ও কাপাসিক—এই চার প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে।[৪] বস্ত্রবয়ন শিল্পে বাঙ্গালীর খ্যাতি সুদূরবিস্তারী ছিল সুপ্রাচীন কাল থেকে। এদেশের সূতী ও রেশমী কাপড়ের সমাদর ছিল উত্তর ভারতের সর্বত্র। চতুর্দশ শতাব্দীতে মিথিলার কবি জ্যোতিরিশ্বর তাঁর সুবিখ্যাত বর্ণনরত্নাকর গ্রন্থে পট্টাম্বরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের মেঘউদুম্বর গঙ্গাসাগর, লক্ষ্মীবিলাস এবং গাঙ্গের, শিলহটী দ্বারবাসিনী—

---

১ ক. ক. চ - পৃ - ৮৪

২ ধর্মাজ্ঞানত শস্যহানিতে সাধারণের খেদোক্তি—দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়। পৃ চৈ. ভা ১৬৬

৩ চৈ. ভা. - পৃ - ৮৬

৪ চৈ প. স-পৃ - ৩০১

প্রভৃতি পট্টাম্বর এবং বঙ্গাল প্রভৃতি নিড়্‌'বণ বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।[১] খ্রীঃ প্রথম শতকে 'বাঙ্গালাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবস্ত্র বিদেশে চালান যেতো। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জগদ্বিখ্যাত বঙ্গাল-মসলিন অতি-প্রাচীন যুগ থেকে এদেশে তৈরি হয়েছিল।[২]

॥ সংগৃহীত তথ্যালোচনা ॥ বয়নশিল্প ॥ আলোচ্য শতাব্দীতে খুঞা[৩] (< ক্ষৌম শণের সূতায় প্রস্তুত মোটা কাপড়) পাড়ি, পাছুড়ি[৪] (মোটা চাদর বা বস্ত্রাঞ্চল) পিবাণ[৫] (_ ফেরানি, খাটো মোটা কাপড়) প্রভৃতি ছাড়াও পট্টবস্ত্র, সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র[৬] খাসাধুতি[৭] (উৎকৃষ্ট মলমল), পাট-পাছরা[৮], কৃষ্ণকেলি[৯], রেফন ভোট[১০], তসর-কসব[১১] ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায় প্রচুর। মাণ্ডুয়া বসন[১২], শঙ্খপাটের শাড়ি, রাঙ-নাত-বস্ত্র[১৩], সাজিধুতি[১৪], জর্জর ধুতি[১৫] ইত্যাদি বস্ত্র-নামও সমকালীন সাহিত্যে উল্লেখিত হয়েছে। কবিকঙ্কণ-বর্ণিত নব-প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরের তাঁতিরা প্রধানতঃ ভুণী-ধুতি (মোটা ধুতি), খাদি (খদ্দর) এবং গড়া (মোটা কাপড়) কাপড় বোনায় সিদ্ধহস্ত ছিল।[১৬] তৈলধুতি[১৭] সাধারণতঃ ব্যবহৃত হ'তো স্নানের সময়, গাত্রমার্জনার জন্য ব্যবহৃত হ'তো সাঙলি গামছা।[১৮]

সূক্ষ্মবস্ত্রের কদর সেকালে সাধারণের মধ্যে তেমন ছিল না। এই সকল বস্ত্রাদির ব্যবহার সেকালের সমাজে নিন্দনীয় ছিল। পরবর্তিকালে অতিসূক্ষ্ম 'জামদানি দোলাই' ও চন্দ্রকোণার ধুতি পরিধান ক'রে তথাকথিত

১ ম. বা. ধা - পৃ - ৪৬
২ চি প স - পৃ - ৩০১
৩ ক ক. চ পৃ ৬৮, ৬৯
চৈতন্যমঙ্গল - পৃ ৩১
৪ ক. ক চ - ৬৯, ২৮৬
৫ ক. ক. চ - ৬৮, ৬১
৬ গো বি পৃ — ৩৪
৭ গো. বি - পৃ - ৮৭
৮ ঐ পৃ - ৩৪
৯ ঐ পৃ - ৫৪
চৈ. ম - পৃ - ৫২
১০ গো বি - পৃ - ৮৭
১১ ঐ - পৃ - ৮৭
ক ক. চ পৃ - ২৮৬
১২ চৈ ভা. পৃ - ৩৪৫
১৩ গো. বি. পৃ - ৮৬
১৪ চৈ ভা - ২৮-২৯
১৫ ক. ক চ পৃ - ৮৮
১৬ ঐ - পৃ - ৮৯
১৭ গো. বি - পৃ - ৮০
১৮ ক. ক. চ পৃ - ২৮৫
গো. বি - পৃ - ৬৮

আধুনিক যুবক-যুবতীগণের দম্পটি-দম্পতি হওয়ার চমকপ্রদ সংবাদ মেলে একখানি পুরাতন পত্রে।[১]

সমকালীন সাহিত্যের বর্ণনা থেকে অনুমান হয়, সূচীশিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছিল সেকালে। কাঁচলিতে ভারত পুরাণ বা কালীয়দমন লীলার বিচিত্র লিখন[২] সম্ভবতঃ সূচীশিল্পের দ্বারাই সম্পন্ন হ'তো। সীবন শিল্প ছিল সম্ভবতঃ মুসলমানদের একচেটিয়া বৃত্তি।[৩] পরবর্তি কালে এই শিল্প হিন্দুদের মধ্যেও প্রসারিত হয়।

॥ মৃৎ-শিল্প ॥ বৃহৎ অট্টালিকার উল্লেখ সমকালীন কাব্য-গ্রন্থাদিতে পাওয়া গেলেও[৪] সাধারণ লোকের বাসগৃহ মাটি দিয়ে তৈরী হ'তো। বাঙ্গালাদেশের গ্রামাঞ্চলে মাটির গৃহনির্মাণ একটি বিশেষ শিল্পে পরিণত হয়েছিল। চৌ-আরি ঘর ছিল গৃহস্থের ভদ্রাসন, তার সঙ্গে সংলগ্ন থাকতো পড়াশুনার ঘর ও ভিতরে 'জলহরি'।[৫] এছাড়া টুঙ্গিঘর ও বলভীর উল্লেখ প্রাচীন-সাহিত্যে পাওয়া যায়। আকৃতিভেদে গৃহের নামকরণ হ'তো—লক্ষ্মীবিলাস[৬], কামটুঙ্গি[৭], জলটুঙ্গি[৮] ইত্যাদি। আট পাঁচী বা দৈর্ঘ্যে ৮ এবং প্রস্থ ৫ হাত মাপের কাঁচা ঘর নির্মাণ এদেশের পুরাতন প্রথা।[৯] গোশালা এবং ঢেঁকিশালা সেকালে গৃহস্থের অপরিহার্য ছিল।

---

১ চি প. স - ২ পৃ - ৪২৭

২ বেণুরায়ের কন্যা রঞ্জা পরিল কাঁচুলি। .... ॥
নানাবর্ণ অবতার কাঁচাল লিখন। লিখিয়াছে সম্মুখে কালারি নিধুবন ॥
চারিদিকে লিখন গোপীগণ নাচে। ...... ॥
দানখণ্ড লেখা আছে তাহার দক্ষিণে। .... ॥
আর সেইখানে লেখা পারিজাত হরণ ॥
কাঁচাল উপরে লেখা নানা অবতার। কালিয়া দমন লেখা জগতের সার ॥ রূপরামের ধর্মমঙ্গল পৃ - ১০৭-৮

লক্ষ টাকার কাঁচুলি করিল পরিধান।
বিচিত্র লিখন তার ভারত পুরাণ ॥ রূপরামের ধর্মমঙ্গল - পৃ - ১১৬

৩ জীব সের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন। — চৈ. চ. অং. ১৭/২৩১

৪ গোপালবিজয় - পৃ - ৭৮

৫ গোপালবিজয় - ভূ. পৃ - ৮৮

৬ চৈতন্যমঙ্গল - পৃ - ৮১ ; ৭ বংশীদাস পৃ—২৭৭, ৩২৩ ; ৮ গোর্খবিজয়

৯ চি. প. স - ১ প - ৪৫৭

মাটির দেওয়াল অলংকৃত করা হতো নানাভাবে। তার মধ্যে উলুটি উলু (খড়) ও মাটি মিশিয়ে প্রলেপের কাজ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উলুটি চার প্রকার—খড়ুটি, ভুঁষুটি, পেটুটি ও তুলুটি। বিশেষ পদ্ধতিতে মাটির সঙ্গে খড়, তুষ, কুড়ো, পাট বা পেঁজা-তুলো মিশ্রিত ক'রে দেওয়ালে প্রলেপ দিয়ে ছোট কর্ণিক বা বাঁশের অতি-পাতলা চিয়াবি দিয়ে কেটে মূর্তি ও অন্যান্য সূক্ষ্ম কারুকার্য করা হতো।[১] পোড়ামাটির ফলক দ্বারা দেওয়াল অলংকরণ করা হতো সাধারণতঃ মন্দিরগাত্রে। পৌরাণিক দেবদেবী ছাড়াও সমাজ-জীবনের নানা দুর্লভ চিত্র এগুলিতে বিধৃত হয়েছে। মাটির সঙ্গে পাট বা শণের টুকরো মিশিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে মূর্তি নির্মিত হতো। পূজা-পার্বণে দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পুরাণোক্ত কাহিনীর মূর্তি নির্মাণ করিয়ে রাখা হতো, এযুগের প্রদর্শনীর মতো করে। চৈতন্যদেব কানাই-নাটশালা গ্রামে মৃৎশিল্পে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ঘটনাদি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পুতুলনাচের মূর্তি হতো কাঠের তৈরি।[২]

নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্রাদির মধ্যে 'কলসী' হাঁড়ি, হোলা[৩], বেসালি[৪] প্রভৃতি অপরিহার্য ছিল তবে সমকালীন কাব্য গ্রন্থাদিতে মৃৎপাত্রের উল্লেখের অপ্রতুলতা থেকে অনুমান হয় আলোচ্য শতাব্দীতে মৃৎপাত্র বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। মাটিয়া পাথরা[৫] ব্যবহৃত হতো নিতান্ত দরিদ্রদের মধ্যে।

॥ **ধাতুশিল্প** ॥ ধাতুশিল্প ছিল প্রধানতঃ কর্মকার শৈল্পিক-গোষ্ঠীর 'Guild' একচেটিয়া বৃত্তি। পরবর্তিকালে কর্মকার সম্প্রদায় বোনপেসে (বনপাস), চাকরা (চেক্রীগড়), ভালকী (গুয়োতা ভালুক) প্রভৃতি নানা গাঞীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে কর্মকার বা কামারের প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—'কামিল্যা'। কামিল্যা সম্ভবতঃ কর্মকার-দের কোনো গাঞী-নাম। বর্তমান বর্ধমান জেলার বনপাস-কামারপাড়া

১ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—অমলেন্দু মিত্র-রচিত 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থে সংকলিত পঞ্চানন মণ্ডল বিরচিত প্রবন্ধ—'মাটির দেওয়াল ও উলুটি'।

২ কাঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় - চৈ. চ - অ ৪/৮৫

৩ গৌরাঙ্গবিজয় - পৃ - ১৮

৪ গোপালবিজয় - পৃ - ৫২ ৫ ক. ক চ - পৃ - ৬৯

অঞ্চলের কর্মকারগণ সেকালে লৌহশিল্পে বিশেষ পারদর্শী ছিল। কাটারি[১] কোদালি[২], মুটুকি[৩] ক্ষুর[৪] ছাড়াও তরবারি, ছোড়া, বর্ম, বন্দুক ইত্যাদি নির্মাণেও এদের নৈপুণ্য ছিল সুবিদিত।[৫] লোহার কাজ ছাড়াও কাঁসা ও পিতলের তৈজসাদি এবং পিতলের সূক্ষ্ম শিল্পকর্মে এদের খ্যাতি ছিল সুদূর-বিস্তৃত তবে কাঁসা ও পিতলের কাজ প্রধানতঃ ঢ্যাকরা কর্মকারদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল। অজয়নদের তীরে অবস্থিত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত 'ঢেক্করীগড়ের' নাম অনুসারে এই গার্ঙী-নামের উৎপত্তি বলে পণ্ডিতগণের ধারণা। পরবর্তিকালে এরা বর্ধমান জেলার দাঁইহাট, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পিতল-কলস, সরঙ্গী-থাল, পিতল-ঝারি, রসবাটিকা, রসখুরী, ত্রিপদিকা, ডাবর-বাটা, গুবাকসম্পুট, আলবাটি, বিচিত্র সাপুড়া, শ্রীরামখানি জগ্‌কা প্রভৃতি নির্মাণেই এদের পটুত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না, পিতলনির্মিত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, গ্রামাঞ্চলে শস্য পরিমাপের একক পিতল নির্মিত 'পাই' ইত্যাদির সূক্ষ্ম কারুকার্য অতিউচ্চ-স্তরের শিল্পরীতির নিদর্শন। ধাতুনির্মিত দেবদেবীর প্রাচীন মূর্তিগুলি ঢালাই ও তক্ষণশিল্পের গৌরবময় দৃষ্টান্ত। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার শিল্পেও এদের খ্যাতি ছিল সুদূরবিস্তৃত। আলোচ্য শতাব্দীতে অলঙ্কারাদি ছাড়াও স্বর্ণ-নির্মিত তৈজসপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রচুর।[৬]

॥ **ভাস্কর্য** ॥ বাঙ্গালাদেশে প্রস্তর সুলভ না হলেও এই শিল্পের উন্নতি হয়েছিল এদেশে। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিভিন্ন দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তি ছাড়াও এদেশে মন্দির খিলান, স্তম্ভগাত্রে যে শিল্পরীতির নিদর্শন দেখা যায় সেগুলি অত্যন্ত উঁচুদরের। দাঁইহাটের ভাস্কররা পূর্বাবধি প্রস্তরশিল্পে পটুত্ব দেখিয়েছে।[৭] Laterite বা মাকরা পাথর, Sand stone বা বেলেপাথর এবং শ্বেতপাথরের মূর্তি এদেশে গ্রামাঞ্চলে যত্রতত্র পরিদৃষ্ট হয়। বীরভূম জেলায় 'মাকরা' নামে গ্রাম আছে। একসময় উক্ত গ্রামে মূর্তি নির্মাণের উপযোগী মাকরা পাথর পাওয়া যেতো।

১ চৈ. ভা - পৃ - ৫৭ ; ২ চৈ. ভা. প - ১৩০ ; ৩ চৈ. ভা. - ১৭০ ; ৪ চৈ. ভা - ২৪৭ ;

৫ ম বা - পৃ - ৩১০.

৬ সুবর্ণ থালি - চৈ. ভা প. - ২৮৬ ; চৈ. চ ম - ৮/৮২ ;
সুবর্ণের সিংহাসন - চৈ. ভা. - ২৭৩ ইত্যাদি।

৭ ম. বা - পৃ - ৩২৫

॥ কাঠের কাজ ॥ কাঠের কাজে সেকালের বাঙালীর নৈপুণ্য কম ছিল না। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নৌকা নির্মাণের বিস্তৃত ও খুটি-নাটি বিবরণ পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের মনসাবিজয় কাব্যে 'বারো হাজার গজ' দীর্ঘ নৌকার বর্ণনা[১] নিছক কবিকল্পনা না হওয়াই স্বাভাবিক কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিকলো কন্টি ভারতে জাহাজ নির্মাণ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভিনিসের লোক, জাহাজেই অভ্যস্ত।[২] কবিকঙ্কণের কাব্যে ডিঙ্গা নির্মাণের বর্ণনায় বলা হয়েছে কোনো কোনো ডিঙ্গা দৈর্ঘ্যে শত-গজ ও প্রস্থে বিশ-গজ হতো।[৩] নৌকা তৈরী হতো নানা ধরণের। আয়তন অনুসারে নৌকার নাম রাখা হতো—বিশহাতী, বাইশ, পঁচিশ, আঠাইশা ইত্যাদি। সিংহমুখী, ব্যাঘ্রমুখী, হংসমুখী[৪] ইত্যাদি নাম থেকে অনুমান হয় এই সব জন্তুর প্রতিকৃতি নৌকার গলুইয়ে খোদিত হ'তো। ময়ূরপঙ্খী নামও সম্ভবতঃ এই বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক।

মাটির বাড়ির খুঁটিতে, দরজার দু'পাশে, শতদলে কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য সেযুগে বহুল প্রচলিত ছিল; এযুগে চোখে পড়ে কদাচিৎ। বাত্তাবন্দী, পায়রাখোপী কপাট নির্মাণে সেযুগের সূত্রধরদের কলানৈপুণ্য এবং তক্ষণ কার্যের দক্ষতার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। কাঠের তৈরি বিষ্ণুখট্টা,[৫] দোলা[৬] খাট-পালঙ্ক[৭] সেযুগে ব্যবহৃত হ'তো। জুতার উল্লেখ পাওয়া গেলেও[৮] কাঠের খড়মের[৯] প্রচলন ছিল অধিক।

॥ শর্করা ও অন্যান্য শিল্প ॥ এদেশে ইক্ষু জন্মাতো প্রচুর পরিমাণে। ইক্ষুরস থেকে গুড় তৈরির ঐতিহ্যও এদেশে অনেক দিনের।[১০] চিনি তৈরির পদ্ধতি এদেশে অপরিজ্ঞাত ছিল না। "মোদক প্রধান রাণা করে চিনি কারখানা"[১১] কবিকঙ্কণের এই বর্ণনা থেকে অনুমান হয়, ষোড়শ শতকের বহু পূর্ব থেকেই এদেশে চিনি তৈরি হতো। পোর্তুগীজ পর্যটক বারবোসার (আঃ ১৫১৬ খ্রীঃ) মতে, বাঙ্গালাদেশে "খুব উৎকৃষ্ট সাদা চিনি তৈরী হয়

১ মনসাবিজয় - পৃ - ১৪২ ;
২ ম. বা. পৃ - ৩৪৪ ; ৩ ক. ক. চ - ২২২
৪ ম. বা. বা. - পৃ - ৪৭ ; ৫ জয়ানন্দ - পৃ ১৪৭ ; ৬ ক. ক. চ - পৃ ৪৮, চৈ ভা - ৭৭
৭ গৌ. বি - পৃ - ৬৬ ; ৮ গৌ. বি - পৃ - ৬৮
৯ ক ক. চ - পৃ - ৮৯ ; ১০ চি-প-স - পৃ - ৩০৮, ৩২৭
১১ ক. ক. চ - পৃ - ৮৯ ;

এবং অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া চালান যায়।" ১৬১৬ খ্রীঃ স্যার টমাস রো লিখেছেন, "বাঙলাই......সমগ্র ভারতে চিনি যোগায়।" কবিকঙ্কণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, 'সিউলি'রা খেজুর গাছের রস থেকে উপাদেয় গুড় তৈরি করতো। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নবাতের উল্লেখ আছে।[১] নবাত খেজুর রসের গুড় থেকে তৈরি মিষ্টান্ন-বিশেষ।

বাঙ্গালাদেশে বাঁশ ও বেতের প্রাচুর্য হেতু বাঁশনির্মিত ঝুড়ি. চুপড়ি, চাঙ্গারী প্রভৃতি নির্মাণ রীতির প্রচলন হয়েছিল বহু পূর্ব থেকে।[২] আলোচ্য শতাব্দীতে ধুচনি রঞ্জন-চুপড়ি চালুনি, ঝাঁটা, টোকা, ছাতা তৈরি করতো ডোমজাতি। বর্তমানে এদেশে এই শিল্প মূলতঃ ডোমজাতির মধ্যে কেন্দ্রীভূত। বেত্রনির্মিত পেটিকা, সোলার টোপর, ডাকের সাজ নির্মাণে বাঙ্গালীর খ্যাতি দীর্ঘকালের। বর্তমানকালে বহির্ভারতে এই সকল শিল্পের সমাদর উল্লেখযোগ্য-রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাঙ্গালাদেশে 'দক্ষিণাবর্ত' শঙ্খের আমদানি হ'তো সিংহল থেকে।[৩] শাঁখা হিন্দু রমণীর অঙ্গসজ্জার অপরিহার্য উপকরণ। শঙ্খ কেটে শাঁখা নির্মাণ করতো শঙ্খবণিকেরা।[৪] সমকালীন সাহিত্যের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সেকালে শাঁখার নানারকম চিত্র অঙ্কিত থাকতো। কুলুপিয়া শঙ্খ বা খিলান শাঁখার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রাদিতে কড়ি-খচিত সুদৃশ্য আলনা, ঝাঁপী কিছুকাল পূর্বেও বাঙ্গালী-গৃহের শোভা বর্ধন করতো। শীতকালে বাংলাদেশে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরি হ'তো। গরম-জল সারারাত্রি মাটির নীচে গর্ত করে রেখে বরফ প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল।

চীনা পর্যটকেরা লিখেছেন যে বাংলায় গাছের বাকল থেকে উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরি হতো। লাক্ষা ও রেশম শিল্পের উল্লেখও আছে।[৫]

॥ মন্দির ও গৃহনির্মাণশিল্প ॥ ইতিহাসের নির্ভুল সাক্ষ্য অনুসারে, মুসলমানগণ তুর্কানা রীতির অনুসরণে এদেশে বহু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস

১ জয়ানন্দ - পৃ - ১০৬
২ চর্যা—নং—১০, ৫০ ;
৩ ক. ক. চ - পৃ - ২২৩
৪ ক. ক. চ - পৃ - ৮৯
৫ বা. দে. ই - পৃ - ১৩০

করে এবং মন্দিরের ভগ্নাংশ দ্বারা মসজিদ মকবারা প্রভৃতি নির্মিত হয়।[১] সুতরাং বাংলার মধ্যযুগের হিন্দুমন্দির বা দেবদেবীর মূর্তির যে বিশেষ কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না তাতে আশ্চর্য বোধ করার কোনো কারণ নাই।

এই ধ্বংসলীলার মধ্যেও এদেশে অনেক প্রাচীন মন্দির আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। বীরভূম অঞ্চলের কিছু প্রাচীন সমাধি-মন্দির তারমধ্যে অন্যতম। মধ্বাচার্য-রামানুজ-নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এই মন্দিরগুলি আয়তনে বৃহৎ নয়। এগুলি এতো পুরাতন যে কোথাও কোথাও মৃত্তিকাগর্ভে আংশিক প্রোথিত হয়েছে। বাঙ্গালাদেশের চিরপরিচিত কুঁড়েঘরের গঠনপ্রণালী বা দেউলের স্থাপত্যরীতির গঠন কারুকার্যে মন্দিরগুলি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এগুলি ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত হলেও ঊর্ধ্বমিলনরেখা এবং কার্নিসগুলি খড়ের চালের মতো বাঁকানো। আবার কোথাও এই সমাধিমন্দির রত্নমন্দিরের রূপ ধারণ করেছে। পাঁচ-শিখর, নয়-শিখর-বিশিষ্ট মন্দির প্রায়ই চোখে পড়ে। মন্দির-গাত্রে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ দেখা যায়।

এছাড়া দক্ষিণরাঢ়ে কিছু অষ্টকোণাকৃতি দেহারা (দেবগৃহ) দেখা যায়। এগুলির গঠনরীতি রাসমঞ্চের মতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দিরের উপরিভাগে কোনো চূড়া বা জগমোহন নেই; ছাত সমতল।

পোড়ামাটির ফলকদ্বারা মন্দিরগাত্র অলংকরণের ঐতিহ্য এদেশে সুপ্রাচীন। পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি, রাসলীলা, কৃষ্ণলীলা ছাড়াও সমাজ-জীবনের নানা দুর্লভ চিত্র এগুলিতে বিধৃত হয়েছে; মিথুন শৈলীর অনুসরণ কদাচিৎ দেখা যায়। নানা রঙের পোর্সিলেনের টুকরো দিয়ে বিচিত্র কারু-কার্যের নিদর্শনও পাওয়া যায়।[২] 'মুক্তার চুন' দিয়ে দেওয়াল চিত্রিত করার

১ দ্রঃ অল্-বীরুনী ও সংস্কৃত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় - বিশ্বভারতী পত্রিকা (কার্ত্তিক-পৌষ - ১৩৩২)

বা. দে ই - ২ পৃ - ৪৬৪

পুঁ. প - ভূ. পৃ - ৬ - ৮। বর্তমান হুগলী জেলার বালিয়া পরগণার মায়াপুরের ১২ মাইল উত্তর-পূর্বে মায়াচণ্ডীর মন্দির ও কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত বিগ্রহের ভগ্ন-প্রস্তর দ্বারা মৌলানা সিরাজুদ্দিনের মকবারা নির্মিত হয়। আরামবাগের ইতিহাস - পৃ ১৯-২০

২ অজয়তীরে জয়দেব - কেন্দুলির সন্নিহিত বেতাগ্রামের শিবমন্দিরে এই কারুকার্য আছে। মন্দিরটি দুইশত বৎসরে পুরাতন।

উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন সাহিত্যে।[১] এই শিল্প পরবর্তীকালে পদ্মের কাজে রূপান্তরিত হয়েছে। কলস দিয়ে গৃহসজ্জিত করার ঐতিহ্য আরও প্রাচীন। ইটের ব্যবহার সেযুগে অজ্ঞাত ছিল না। গৃহনির্মাণের উপকরণ ছিল—ইট, চুন, সুরকি। ইষ্টক নির্মিত রাজপথের উল্লেখও পাওয়া যায়।[২] আম বা কুলকাঠের আগুনে 'ছিলেট' পদ্ধতিতে পোড় দেওয়া পাতলা গড়িয়া ইটের ব্যবহার সেযুগে প্রচলিত ছিল। পরবর্তিকালে সুরকি ও চুনের সঙ্গে রাসায়নিক পদ্ধতিতে খদির মিশ্রিত জল দিয়ে গাঁথ্‌নি করার রীতি চালু হয়। বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামের বাঁকারায়ের মূল মন্দির, অজয়তীরবর্তী ইছাই ঘোষের প্রাচীন দেউল এই পদ্ধতিতে নির্মিত বলে পণ্ডিতদের ধারণা। পূর্বে উল্লিখিত বীরভূমের মধ্বাচার্য-রামানুজ-নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সমাধি মন্দিরগুলি অধিকাংশ পাতলা গড়িয়া ইটের নির্মিত। গোয়ালন্দ-রাজবাড়ী, চাঁদরায়ের মঠ ষোড়শ শতাব্দীর নির্মাণ-প্রণালীর নমুনা।[৩]

॥ চারুকলা ॥ পটুয়াদের অঙ্কিত পট দেখিয়ে কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ গানের ঐতিহ্য এদেশে প্রাচীন। সম্ভবতঃ এই রীতির অনুসরণে চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলির Illustration চিত্র দেখিয়ে গান গাওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল চৈতন্য পরবর্তিযুগে। আনুমানিক দুই শত বৎসর পূর্বে অনুলিখিত একখানি পুথির পুষ্পিকায় লিপিকর নিজবৃত্তির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"চৈতন্যমঙ্গলের ছবিতে গান করি।"[৪]

অনেক প্রাচীন পুথির পাতার দুই প্রান্তে, প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে নক্সা-চিত্রণ এবং লিপির ভ্রান্তি-সংশোধনে অর্থাৎ অক্ষর বা শব্দ কাটতে গিয়ে চিত্ররূপ দেওয়ার প্রবণতা থেকে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হবে না যে, সেকালে লিপিকরগণ অনেকে উৎকৃষ্ট চিত্র-শিল্পী ছিলেন। এছাড়া প্রাচীন পুথির পাটায় অঙ্কিত রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য নক্সা-চিত্রে সেকালের চিত্র-শিল্পীদের রঞ্জন-সৌষম্য ও কলানৈপুণ্যের স্বাক্ষর অদ্যাপি অক্ষয় হয়ে আছে।

॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছিল এদেশে।

১ গো. বি - পৃ - ৭৮ :
২ গো. বি - ৭৮, ক. ক. চ - পৃ - ৭৯—৮০
৩ ম. বা. - পৃ - ৩২৫ ৪ বিশ্বভারতী পুথি—৭৮৩৩ (খ)

নদ-নদীর প্রাচুর্যহেতু শিল্পজাত দ্রব্যাদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণের সুবিধা ছিল জলপথে। দেশের নানাস্থানে বারাসত, গোলাহাট, গঞ্জ প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

সেযুগের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। আর দেশের প্রধান কৃষিজ সম্পদ ছিল ধান। ধান বিক্রি করে জনসাধারণের হাতে নগদ অর্থ আসতো।[১] বিনিময় প্রথা (Burter system) সেযুগে প্রচলিত ছিল।[২] ধানের মতো গরুও ছিল সেকালে হিন্দুগৃহস্থের অন্যতম প্রধান সম্পদ। সময়বিশেষে স্বর্ণনির্মিত অলংকারাদি বিক্রয় করে নগদ অর্থ দিয়ে খরচ-পত্র চালানো হ'তো।[৩]

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, বাঙ্গালাদেশের সূতী ও রেশমী কাপড়ের সমাদর ছিল উত্তর ভারতের সর্বত্র। সমসাময়িক বৈদেশিক পর্যটকগণের বিবরণ থেকে জানা যায়, আলোচ্য শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশ থেকে সূতী ও রেশমী কাপড় জলপথে বিদেশে রপ্তানি হতো প্রচুর পরিমাণে। বাঙ্গালায় জাত ধান গম ইক্ষু কার্পাস প্রভৃতি কৃষিপণ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশে চালান যেতো অল্পবিস্তর। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে নানাবিধ দ্রব্য আমদানি হ'তো এদেশে। কাশ্মীর দেশের ক্ষুর[৪] বারাণসীর ত্রিপদিকা[৫], ভোট-কম্বল[৬] (ভুটান-তিব্বত অঞ্চলে জাত মোটা কম্বল বিশেষ) ইত্যাদি ছিল সেকালের অপরিহার্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেকালে একটি উৎকৃষ্ট মানের ভোট-কম্বলের দাম ছিল তিন মুদ্রা।[৭]

॥ আন্তর্দেশিক বাণিজ্য ॥ দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো যথাসম্ভব অবাধে। আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের উপর সাধারণতঃ বাদশাহেরা হস্তক্ষেপ করতেন না।[৮] এইসময়ে পোর্তুগীজ বণিকেরা এদেশে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল। বঙ্গদেশে আগত পোর্তুগীজগণ অনেকে জলদস্যু (Pirate) বৃত্তিতে অভ্যস্ত ছিল। এদের কার্যকলাপ সেযুগে দেশীয় বণিকদের মনে

১ ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়। —চৈ. ভা - ১৪৩

২ খন্দ লইয়া জাই নদীয়া নগরে। ধান্য বদলে কলাই আনিবার তরে। গৌ. বি - পৃ - ৬৯

৩ দিবা স্বর্ণ তোলা দুই দিলা তান হাতে।......ইহা ভাঙ্গাইয়া বায় করহ সকল॥ —চৈ. ভা-আ-৬

৪ জয়ানন্দ - পৃ - ১১; ৫ জয়ানন্দ - পৃ - ১১; ৬ গৌ. বি - পৃ - ৮৭

৭ চৈ. চ - ম - ২০/৯২; ৮ বা. দে. ই — ১৯০

রীতিমতো ত্রাসের সঞ্চার করে।[১] ষোড়শ শতকের শেষদিকে কবিকঙ্কণ লিখেছেন,—ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে॥ এই হারমাদ বা হার্মাদ কুখ্যাত জলদস্যু। মতান্তরে' 'হারমাদ' পোর্তুগীজ আরমাডা (Armada-রণতরী বহর) শব্দের অপভ্রংশ।[২]

॥ স্থানীয় বাজার ॥ ভোগ্যদ্রব্যের (Consume goods) স্থানীয় চাহিদা সাধারণতঃ স্বগ্রামেই মিটতো। বাঙ্গালাদেশে গ্রামে গ্রামে তাঁতি পাড়ায় তাঁতখানা কর্মব্যস্ত, ঘানির শব্দে তেলিপাড়া মুখরিত থাকতো। গন্ধবণিক, তাম্বুলী, শঙ্খবণিকরা তাদের নিজ নিজ পসরা সাজিয়ে বসতো। আর থোর, কলা, মূলা, মোচা, খোলা ইত্যাদির পসরা দিতেন 'খোলাবেচা-শ্রীধর' প্রমুখ ব্যক্তিরা। তবে সমকালীন কাব্যের বর্ণনা থেকে ধারণা হয়, গ্রাম্য-ব্যবসায়ীদের ব্যবসাদার-সুলভ মনোবৃত্তি ছিল না। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুসারে,

উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে। দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্করে॥
'ভাল বস্ত্র আন' প্রভু বলয়ে বচন। তন্তুবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ॥
প্রভু বোলে এ বস্ত্রের মূল্য কি লইবা। তন্তুবায় বোলে তুমি আপনে যে দিবা॥

দর দস্তুর ক'রে যদি বা মূল্য স্থির হ'লো, ক্রেতার হাত খালি—

মূল্য করি বোলে প্রভু এবে কড়ি নাঞি। তাঁতি বোলে দশ পক্ষে দিবা বা গোসাঞি॥

গন্ধবণিকও একই ভাষায় বললেন, 'তোমা স্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্ত হয় ?' মালাকারের বাড়ীতে প্রভু বললেন, '......ভাল মালা দেহ মালাকার। কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার।' শঙ্খবণিকের সঙ্গেও যথারীতি ধারে কারবার। শঙ্খবণিক চৈতন্যদেবকে সরল বিশ্বাসে বললেন, শঙ্খ লই ঘরে তুমি

১ ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীখণ্ডের নবহরি সরকার একবার ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে কারবার করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন। শিষ্য কবি-লোচনদাসকে লুঠেরাদের কাছে গচ্ছিত রেখে তিনি মুক্তি পান—(ম. বা. বা - পৃ - ৪৬)। সপ্তদশ শতকে রামগোপালদাস লোচনদাস সম্পর্কে বলেছেন—"গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গিসদন॥ —শাখানির্ণয় - পৃ - ২০৭

২ বা. দে. ই – পৃ - ২৩৩

চলহ গোসাঞি। পাছে কড়ি দিহ না দিলেও দায় নাঞি।[১] শ্রীচৈতন্যদেব সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন; সকলেই তাকে স্নেহ করতো; কিন্তু সামগ্রিক-ভাবে মনে হয় ব্যবসায়ী সুলভ কথা বলা কারোর স্বভাবেই ছিল না। পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়ে লক্ষপতি ধনপতি সদাগর দাসীকে বাজারে পাঠিয়েছেন ধারে জিনিস কেনার ইঙ্গিত দিয়ে– 'বেসাতি করিতে যদি নাহি আঁটে কড়ি। তঙ্ক দুই চারি লয়ো বণিকের বাড়ী॥'[২] এই সব তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, নগদ অপেক্ষা ধারে কারবার সেকালে অধিক প্রচলিত ছিল।

পক্ষান্তরে, কবিকঙ্কণের বর্ণনা অনুসারে, মুরারি শীলের মতো ঝানু ব্যবসাদারের অভাব ছিল না দেশে। দেবীপ্রদত্ত মূল্যবান অঙ্গুরীয় কালকেতু বিক্রি করতে গেল মুরারি শীলের গদিতে। প্রবঞ্চক মুরারি আংটি যাচাই ক'রে নির্বিকারভাবে বললো, 'সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিত্তল। ঘষিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জ্বল॥' অবশেষে কালকেতু আংটি ফেরৎ চাইলে মুচকি হেসে মুরারি বললো– এতক্ষণ পরিহাস কৈলু ভাইপো রে।[৩]

॥ বহির্বাণিজ্য ঃ সমুদ্রযাত্রা । প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরা ॥ সমুদ্রপথে বাঙ্গালাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো সুপ্রাচীন কাল থেকে।[৪] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পণ্যাধ্যক্ষ—নামক প্রকরণে কোনো বণিক জলপথে গিয়ে বাণিজ্য করার পূর্বে 'যানভটক' অর্থাৎ নৌকাদির ভাড়া, পথ্যদন বা পথের রাহা-খরচ, নিজপণ্য ও পরপণ্যের মূল্য সম্পর্কে তারতম্য বিচার, যাত্রাকাল, ভয় ও তার প্রতীকার, পণ্যপত্তন-চারিত্র বা নিজপণ্য বিক্রয়ের জন্য যে পরপত্তনে যেতে হবে সে দেশের আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় উত্তমরূপে জেনে নেবার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫]

গঙ্গানদীর মোহনায় 'গঙ্গে'—নামক বৃহৎ বন্দর ছিল। বণিকেরা সেখান থেকে জাহাজে দক্ষিণভারত, লঙ্কাদ্বীপ ব্রহ্মদেশ, মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে গমন করতো। বাঙ্গালী বণিকের 'রোম', চীন—

---

১ চৈ. ভা. পৃ - ৫৭—৫৮ ; ২ ক. ক. চ—পৃ—৭৪

৩ ক. ক. চ - পৃ - ৭৪

৪ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—ম. বা - পৃ - ৩৩৪-৩৬

৫ চি. প. স. পৃ - ৩১৯

পদবী[১] থেকে অনুমান হয়, উক্ত দেশসমূহে বাঙ্গালীর বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের একদাতন অধিবাসী দ্রাবিড় তামিলগণ বর্তমানের বাঙ্গালী তামলি জাতি পেশায় ছিল তাম্রলিপ্তের সমুদ্রবণিক। ধীবরগণও নদীপথে বিদেশে যেতো।

॥ **সংগৃহীত তথ্যালোচনা** ॥ সেকালে নৌকা তৈরী হতো নানা ধরণের। আয়তন অনুসারে নামকরণ হ'তো—বিশহাতী, বাইশা, প'চিশা, আঠাইশা ইত্যাদি। সেযুগে সদাগরী নৌকার সাধারণ নাম ছিল—মধুকর। ডিঙ্গা নামক দ্রুতগামী নৌকা বহুল-প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে 'সর্বজয়া', জগদ্দল, সুমঙ্গল, শশিমুখী প্রভৃতি নৌকার নাম পাওয়া যায়।

সমুদ্রগামী বুহিত (< বহিত্র) বা বৃহৎ নৌকায় দিশারু, তারাবিদ্, কর্ণধার বাহক, পবনবেত্তা, গাবর বা নাউর্য়া, যানশিল্পী থাকতো। সদাগরেরা যখন স্বগ্রামে থাকতেন, বাণিজ্যে যেতেন না, তখন ডিঙ্গাগুলি কাছাকাছি কোনো দহে ডোবানো থাকতো। বাণিজ্যযাত্রার পূর্বে ডুবুরি দিয়ে নৌকা তুলে এনে দুবপাল্লায় যাত্রার উপযোগী প্রস্তুত করা হতো। যাত্রার প্রাক্কালে 'ডিঙ্গা-মঙ্গলা' নামক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতো রীতিমতো।

অনেক সমালোচকের মতে, বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্রযাত্রার আয়োজনের এই খুটিনাটি বর্ণনা, যাত্রাপথের বিবরণ ইত্যাদি ভিত্তিহীন কবিকল্পনা। "প্রাচীনেরা কাব্যকলার কম হইলেও সমুদ্রযাত্রার কথা ভালো জানিতেন, আর ভিতর রাঢ়ে শুকনা ডাঙ্গায় বাস করিয়া মহাকবি হইলেও মুকুন্দরাম ইহাতে হাত ফলাইতে পারেন নাই। অনেকে ভ্রমরা বিলের জল হইতে জাহাজ তুলিয়াছেন।"[২] কিন্তু এই মন্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ উজানি মঙ্গলকোট অঞ্চলে অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে তান্ত্রিক দেবী ভ্রামরীর স্মৃতি-বিজড়িত ভ্রমরাদহ অদ্যাপি বিদ্যমান। এই দহে ধনপতি সদাগরের ডিঙ্গা ডু'বয়ে রাখার কাহিনী অবাস্তব নাও হতে পারে ; কারণ চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগরের কাহিনী উক্ত অঞ্চল থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল।[৩]

১ চি প. স পৃ - ৩০২

২ ম বা. – পৃ ৩৪১

৩ প. ব. স - পৃ - ২৭৫-৭৫

এছাড়া. সিংহল-পাটনে যাত্রাপথের বর্ণনায় মঙ্গলকাব্যের কবিগণ চিঙ্গড়িয়া দহ, কাঁকড়ার দহ, সর্পদহ, কুম্ভীরিয়া দহ. শঙ্খদহ, হাথিয়া দহের যে বিবরণ দিয়েছেন সেগুলি কবিকল্পনা হলেও প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কিত জনশ্রুতি. প্রবাদ এবং গল্প-কাহিনী সেকালের-সমাজে প্রচলিত ছিল তার উপর ভিত্তি করেই এগুলি রচিত হয়েছে।

সমুদ্রপথ অতিক্রম ক'রে বিদেশের পাটনে বাণিজ্যিক লেনদেন এদেশে একসময় খুবই প্রচলিত ছিল অন্যান্য সূত্র থেকে তা প্রমাণিত হয়। 'গোরখ বাণী' গ্রন্থে বর্ণনা আছে—'মণসা দেবী বোপার বাঁধো পবন পুরষি উৎপণা। জ্যাগো জোগী অধ্যাত্ম লাগো কায়া পাটণ মৈঁ জানা।'[১] এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় সেকালে সমুদ্রযাত্রাকাহিনী দেহ-সাধন তত্ত্বে 'কায়াপাটন' রূপকে গৃহীত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালাদেশে বর্গীর অত্যাচারের কাহিনী অনুরূপভাবে কায়াসাধনতত্ত্বের রূপক ভাবনায় পরিণত হয়েছিল।[২] কবিকঙ্কণের কাব্যে সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে কালীদহে মায়াকমলবন মধ্যে রাজপদ্মিনী দর্শন, 'চৌষট্টি যোগিনী হইলা কমলের পাতা' ইত্যাদির উল্লেখ আছে। এগুলিও বিশেষ ধর্মতত্ত্ব প্রভাবিত বর্ণনা। এই সকল বর্ণনা Illusion না Hallucination সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর; তবে এই সকল অলৌকিক কাহিনীতে তান্ত্রিকতার প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়।

॥ সুপ্রাচীন ঐতিহ্য পরম্পরা ॥ সুবর্ণবণিক ও গন্ধবণিকেরা প্রধানতঃ নদ নদী বহুল বর্ধমান ও হুগলী জেলায় বসতি স্থাপন করেন। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে রাঢ়ের এই সকল অঞ্চলকে পণ্যভূমি বা বণিকভূমি বলা হয়েছে। কালক্রমে বর্ধমানের কর্জনাকে কেন্দ্র করে রাঢ়ী সমাজ এবং হুগলীর সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র ক'রে সপ্তগ্রামিক সমাজ গড়ে ওঠে।[৩] কবিকঙ্কণের কাব্যে জনাই ওঝার

১ গোরখবাণী - পৃ - ১৫

২ চি. প. স - ২ পৃ - ৪৩৯

৩ প. ব. স - পৃ - ২৬৮ ; সপ্তগ্রামের বণিকরা সম্ভবত বাণিজ্যের জন্য বিদেশে গমন করতেন না। তাঁদের কারবার সীমাবদ্ধ ছিল স্বদেশের মধ্যে। কবিকঙ্কণের বর্ণনা—সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়। ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়। (পৃ .৮৬) এই অনুমানের সমর্থক। স্বয়ং নিত্যানন্দ-প্রভু সপ্তগ্রামের বণিকদের বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন।

পাত্র নির্ব্বাচন' শীর্ষক অংশে[১] এবং ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত কুটুম্ববর্গের নাম-তালিকায় যে সকল বণিকের নাম ও বাসস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা প্রধানতঃ বর্ধমান ও হুগলী জেলাকে কেন্দ্র করে। বাস্তববাদী কবি মুকুন্দরাম এই বণিকদের বাসস্থানের ভৌগোলিক নির্দেশ যে রকম নিষ্ঠার সঙ্গে দিয়েছেন তাতে অনুমান হয় এঁরা কেউ-ই কাল্পনিক চরিত্র নন। এঁদের মধ্যে চম্পক নগরীর চাঁদসদাগর ধনেমানে সর্বাগ্রগণ্য। 'বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা।' —অর্থাৎ বহির্বাণিজ্যে তাঁর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা থাকতো।

বর্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত মল্লসারুল গ্রামে আঃ ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে উক্ত অঞ্চলের মহত্তর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ করা হয়েছে ; তার মধ্যে বণিকশ্রেণীর প্রসঙ্গে এই নামগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য —

বক্কত্তকবীথী - সম্বন্ধ অর্ধকরক · অগ্রহারের মহত্তর হিমদত্ত,

বটবল্লক অগ্রহারের মহত্তর মহিদত্ত ষষ্ঠীদত্ত ও শ্রীদত্ত,

গোধগ্রাম অগ্রহারের মহিদত্ত ও রাজ্যদত্ত—

উপরোক্ত গ্রামগুলির অধিকাংশ অধুনা বর্ধমান জেলায় অবস্থিত, যেমন বক্কত্তক (অধুনা বাকতা) গোধগ্রাম (অধুনা গোদা) ইত্যাদি। মহত্তরদের মধ্যে এই হিমদত্ত, ষষ্ঠীদত্ত, শ্রীদত্ত, মহিদত্ত এঁরা পূর্বোক্ত বণিককুলের আদি-পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ নন।[২] সুতরাং প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে বর্ধমানে তথা দক্ষিণরাঢে এই গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক ও তাম্বুলি - বণিকরা যে এদেশে বসবাস করতেন তার নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের বাণিজ্যযাত্রার নানা কাহিনী এতদঞ্চলে সুপ্রচলিত ছিল। মূলতঃ তারই উপর ভিত্তি করে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে দক্ষিণরাঢ়ের কবিগণ মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের বাণিজ্যযাত্রা কাহিনীর অবতারণা করেছেন। মল্লসারুল তাম্রশাসন থেকে মুকুন্দরাম পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর বা ত্রিশ চল্লিশ পুরুষের ব্যবধান। তার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত তাম্রশাসনোল্লিখিত হিমদত্ত, ষষ্ঠীদত্ত, শ্রীদত্ত, রাজ্যদত্ত, মহিদত্ত—প্রমুখ মহত্তররা যদি সকলেই

১ ক. ক. চ - পৃ - ১১০-১৮

২ প. ব. স. - পৃ - ২৭০

নির্বংশ না হয়ে থাকেন তাহলে ত্রিশ-চল্লিশ পুরুষ পরে ধনপতি সদাগর ও চাঁদ সদাগরের কাহিনী অলীক না হবার সম্ভাবনাই বেশী। অন্ততঃ তাদের ধনদৌলত সঞ্চয় ও বাণিজ্যের কাহিনী অবাস্তব নয়। যে সাতশত প্রতিষ্ঠাবান বণিক পরিবারের প্রতিনিধিদের সমাগম হয়েছিল ধনপতিগৃহে উজানীতে, তাঁরা কেউ ভুঁইফোঁড় নন, তাঁদের স্থানীয় বসতিও এক-আধ শতাব্দীর নয়।[১]

॥ **রপ্তানি দ্রব্য** ॥ পঞ্চদশ শতকের কবি বিপ্রদাস তাঁর মনসাবিজয় কাব্যে রপ্তানি-দ্রব্যের না-তালিকা দিয়েছেন—ঝুনা নারিকেল, খোম-ধুতি (ক্ষৌম বস্ত্র=মোটা কাপড), খাসা আদি বসন (সূক্ষ্ম কাপড), নিম্বপত্র, সুকতা পাত, কাল্যজীরা, মেথি, পাড়ু কুমরা (পাকা কুমড়া), তৈল, ঘৃত, মাষ, মুগ তণ্ডুল প্রভৃতি।[২]

॥ **বিনিময় দ্রব্য** ॥ বিপ্রদাসের কাব্যে বিনিময়-দ্রব্যের তালিকাও আছে। যথা—ঝুনা নারিকেল বদলে দাক্ষিণাবর্ত শঙ্খ হরিদ্রার বদলে সোনা, খোম ধুতির বদলে পাট-ভোট, পাঁড়ু কুমুড়ার বদলে সিসার থাপড মেষের বদলে অশ্ব ও দন্তী, তণ্ডুলের বদলে মুকুতা ও প্রবাল, পিপ্‌লি, জোয়ানি, কাল্যজিরা, ভেলা, নিম্বপত্র ও হরিতকীর বদলে গুডত্বক[৩] মরিচ লবঙ্গ, জায়ফল, জইত্র, কর্পূর, হিঙ শুক্তা পত্রের বদলে তেজপাতা।[৪]

কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে বিনিময় দ্রব্যের তালিকা প্রদান করেছেন একাধিকবার। তাঁর বর্ণনা অনুসারে, "বদলাশে নানা ধন আন্যাছি সিংহলে। যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতূহলে॥" কুরঙ্গ (হরিণ) বদলে তুরঙ্গ (ঘোড়া), নারিকেল বদলে শঙ্খ, বিড়ঙ্গ (কৃমিনাশক উদ্ভিজ্জ ঔষধ বিশেষ) বদলে লবঙ্গ, শুঠীর (শুষ্ক আদা) বদলে টঙ্ক, প্লবঙ্গ[৫] বদলে জায়ফল, বহেড়া বদলে গুয়া, সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল (পারদ গন্ধক ঘটিত রক্তবর্ণ দ্রব্য-বিশেষ), গুঞ্জার (কুঁচফল) বদলে পলা (প্রবাল), পাট-শণ বদলে ধবল চামর, কাঁচের বদলে নীলা (মূল্যবান গ্রহরত্ন বিশেষ), লবন বদলে সৈন্ধব (করকচে লবন), যোয়ানী বদলে

১ প. ব. স - পৃ - ২০৩

২ মনসাবিজয় - পৃ - ১৩৯-৪০

৩ দারুচিনি

৪ মনসাবিজয় - পৃ ১৪৯ ৫ বানর

জীরা, আকন্দ (অর্কমন্দার এর ফল থেকে তুলা প্রস্তুত হয়) বদলে মাকন্দ (আম) হরিতাল (গন্ধক ঘটিত পীতবর্ণ দ্রব্য বিশেষ) বদলে হীরা (মূল্যবান খনিজ প্রস্তরস্তু বিশেষ) চৈয়ের (মসলা-বিশেষ) বদলে চন্দন, পাগের (পাগড়ী নির্মাণের উপযোগী বস্ত্র) বদলে গড়া (মোটা কাপড়), শুকুতার (<শুক্তি=ঝিনুক) বদলে মুক্ত, ভেড়ার বদলে ঘোড়া ইত্যাদি ।[১]

বিপ্রদাসের মনসাবিজয় এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল রচনায় প্রায় শতাব্দীর ব্যবধান । কিন্তু উভয় কবির বিনিময়-দ্রব্য তালিকা বর্ণনায় আংশিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । মনে হয় সেযুগে মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয় তালিকা প্রদান বিশেষ কাব্যিক রীতিতে (Poetical convention) পরিণত হয়েছিল এবং কাব্যিক প্রয়োজনে অধিকাংশক্ষেত্রে দ্রব্য-নামগুলি পদের অন্ত্যানুপ্রাসের মিলের প্রতি দৃষ্টি রেখে রচিত । তথাপি এই সমুদয় তালিকা কবিকল্পনা নয়, সমকালীন্ বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের প্রদত্ত বিবরণ থেকে তাই ধারণা হয় ।

ইতালীয় পর্যটক ভার্থেমা (১৫০৫ খ্রীঃ) এদেশের বন্দরের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তার বিস্তৃত বাণিজ্য সম্ভার বিশেষতঃ সূতা ও কাপড়ের উল্লেখ করেছেন ২ আঃ ১৫১৪ খ্রীঃ পোর্তুগীজ পর্যটক বার্বোসা এদেশের বাণিজ্যের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, "......সমুদ্রতীরের বন্দরগুলিতে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই আছে । ইহারা জাহাজে করিয়া বাণিজ্য-দ্রব্য বহুদেশে পাঠায় । ......এই দেশের প্রধান বন্দরের নাম 'বেঙ্গল' । ......এ দেশের বড় বড় বণিকদের বড় বড় জাহাজ আছে এবং ইহা নানা দ্রব্যে বোঝাই করিয়া তাহারা করমণ্ডল উপকূল, মালাবার, কাম্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, লঙ্কা ও মলাক্কায় যায় । এদেশে বহু পরিমাণ তুলা, ইক্ষু, উৎকৃষ্ট আদা ও মরিচ হয় । এখানে নানা রকমের সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হয় । এবং আরবে পারস্যে ইহা দ্বারা এত অধিক পরিমাণে টুপি তৈয়ারি করে যে প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া এই কাপড়ের চালান যায় ।[৩]

১ ক. ক. চ - পৃ ২২৩

২ বা. দে. ই - পৃ - ৩২৪-২৫

৩ ঐ - পৃ - ২৩৪ ; বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য ম. বা. পৃ - ১৪১-৫৪

॥ মুদ্রা ॥ সেকালে টাঁকশালের মধ্যে লক্ষ্মণাবতী, ফিরোজাবাদ, সাতগাঁও, ফতেহাবাদ, হুসেনাবাদ, নসরতাবাদ এবং পাণ্ডুা উল্লেখযোগ্য। শেরশাহ্ খাঁটি সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা ও নূতন ধরণের তাম্রমুদ্রা চালু করেন। সে মুদ্রা অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ, এক-অষ্টমাংশ এবং এক-ষোড়শাংশে বিভক্ত করা হয়েছিল।[১] মোহর বা সুবর্ণমুদ্রা একদা এদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[২] আর্কট, জিতল, দাম প্রভৃতি মুদ্রার প্রচলন ছিল তবে স্থানীয় লেন-দেনের ক্ষেত্রে কড়ির প্রচলন ছিল সর্বাধিক।[৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও এদেশে কড়ির প্রচলন ছিল।[৪] সপ্তদশ শতকে মানুচির বর্ণনা থেকে জানা যায়, মালদ্বীপ থেকে কড়ি আমদানী হতো এদেশে।[৫] ওজনের একক ছিল 'মন'[৬]। ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ছিল যথাক্রমে তোলা, মাষ, রতি, পল ইত্যাদি।[৭] শ-ও মূলে, ঝুড়ি মূলে, বিশাদরে জিনিষপত্র বিক্রয় হতো স্থানীয় বাজারে[৮]

দেশে Banking ব্যবস্থা ছিল না, বলাবাহুল্য। সংলোকের জিম্মায় টাকা রাখার রেওয়াজ ছিল। সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে গিয়ে প্রচুর সুবর্ণমুদ্রা 'ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল[৯]।' মুদির দোকানেও জমা রাখা হতো কিছু।[১০] আর বাইশ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা মৃৎ-প্রোথিত করলেন।[১১] জন-সাধারণের পক্ষেও এটাই ছিল বোধ হয় অর্থসঞ্চয়ের নিরাপদতম ব্যবস্থা। গচ্ছিত অর্থ মারা-ও যেতো অনেক সময়।[১২]

॥ জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা ॥ ভূপ্রকৃতির আনুকূল্যে বাঙলাদেশ সুফলা এবং শস্যশ্যামলা। এদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি।

১ চি প. স - পৃ - ৩০৫

২ পঞ্চাশ মোহর রাণী হাথে তাতে নেও। —রূপরামের ধর্মমঙ্গল - পৃ - ১০৯

৩ দ্রঃ 'দুর্ব্বলার বেসাতি' ক. ক. চ – পৃ - ১৫৫

৪ চি. প. স - পৃ - ৩০৩

৫ চি. পি স - পৃ - ৩১০ ; ৬ আইন - ই - আকবরী

৭ মনসাবিজয় - পৃ - ৪০ ; ৮ ক. ক. চ - পৃ - ১৫৬

৯ চৈ. চ-পৃ-৫২০

১০ গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে। সনাতন ব্যয় করে রহে মুদি ঘরে - চৈ. চ - পৃ - ৫৬০

১১ বাইশ লক্ষ স্বর্ণ পোঁতা থাকিল সে গৌড়ে। চৈতন্যমঙ্গল (জয়ানন্দ) - পৃ - ১৩৬

১২ চি. প. স. - ২ পৃ - ২৭৯-৭৭

সুতরাং ধারণা করা অসঙ্গত হবে না, এদেশের জনসাধারণের খাদ্যের অস্বাচ্ছল্য সে যুগে ঘটে নাই।[১] বার্ণিয়ারের (১৬৫৮-৬৮ খ্রীঃ) মতে, বাঙলা মিশর অপেক্ষাও ফলন্ত দেশ। প্রচুর ধান ও চিনি বাইরে যায়। ...মিষ্ট দ্রব্য বিখ্যাত। ভাত, ঘি, তিন-চার প্রকারের শাক-শব্জী বাঙালীর খাদ্য। .. মাছও প্রচুর।[২] সেযুগে দেশের জনসংখ্যাও ছিল অল্প, রাজধানী গৌড়ের কথায় ষোড়শ শতাব্দে পোর্তুগীজ পর্যটক ডি ব্যারস্ বলেন, সেখানে দু'লক্ষ লোক বাস করতো। অবশ্য বহু জমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল তথাপি দেশ সমৃদ্ধ, উদরান্নের চিন্তা ছিল না। সমাজের অভিজাত এবং ধনী বণিক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার ঐশ্বর্যোজ্জ্বল চিত্র সেযুগের কাব্যগুলিতে বর্ণাঢ্যরূপে অঙ্কিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে, বিপরীত চিত্রও আছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে 'ভাঙ্গা কুড্যাঘর তালপাতার ছাওনী', বেঙচের ফল খায়া করি উপবাস, কিছু খুদ কুঁড়া পাই উদর না ভরে, শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন, কিরাত নগরে বসি না মিলে উধার, চালুসেরে বাধা দিলু[*] মাটিয়া পাথরা, আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান—ইত্যাদি বর্ণনাও সুলভ।[৩] ধর্মদাস বণিকের 'নিরঞ্জনপুরাণে' কবিকঙ্কণের বর্ণনার সমর্থন আছে নিম্নলিখিত অংশে—

তালপাতার কুড়া৷ ছিল পোখড়ের পাড়ে। ভুঞ্জে ভাত খাথ্য সেই পাণি পিথ্য ভাড়ে।
বেত দিঞা কোমরে পরিথ ছিঁড়াকানি। মাঝাতে আছিল খাল খাইতে আমানি।।[৪]

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত 'চৈতন্যভাগবতে' ও যুগপৎ দারিদ্র্য[৫] ও ঐশ্বর্যের[৬] বর্ণনা আছে।

উপরোক্ত তথ্যাবলীর সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, আর্থিক বৈষম্য সর্বকালের সমাজের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। তবে সুলতানী শাসনের অবসানে বাঙ্গালার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল এবং ক্রমশঃ তা অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। বাঙলায় মুঘল শাসন ক্রমশঃ শোষণের রূপ

১ ম. বা. - পৃ - ৩১৫ ; ২ চি. প. স - পৃ - ৩০৮
৩ ক. ক. চ - পৃ ৬৮-৬৯
৪ নি. ভা. পুঁ - ৪০৮ ;
৫ মহাচাষা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে। ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া রাত্রি জাগি মরে ॥
চৈ. ভা. - পৃ - ১৪৯
৬ তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে। দশবিশজন যার আগে পিছে নড়ে ॥
চৈ. ভা. - পৃ - ১৪৯

ধারণ করে এই অবক্ষয়কে আরও ত্বরান্বিত করলো—সমসাময়িক সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে প্রচুর।[১] এদিকে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের প্রাবল্য এদেশের জনমানসে নির্বীর্যতা, অকর্মণ্যতা, বাস্তববিমুখতা ও পরলোক-প্রীতির মোহের সঞ্চার করে দেশ তথা জাতিকে পরলোকের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল দ্রুতগতিতে।[২] পরবর্তিকালের বাঙলার অর্থনৈতিক ইতিহাস তাই অবক্ষয় এবং অবনতির ইতিহাস।

॥ **জাতকর্ম** ॥ ॥ বর্ণাশ্রমি সমাজে দশসংস্কার—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম, উপনয়ন এবং বিবাহ-বিধি ধর্মের অঙ্গরূপে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল।[৩] কিন্তু বিশেষ কোনো যুগে অথবা কোনো সমাজে এই সকল সংস্কার একই সঙ্গে প্রতিপালিত হতো—এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালাদেশে আর্য উপনিবেশের ফলে আর্যভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অন্য অঙ্গ এদেশে প্রচলিত হয়েছিল।[৪] প্রাগার্য ভাষা ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই, নূতনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত রূপে তার অস্তিত্ব বজায় রয়েছে।

মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থোক্ত দশসংস্কার পরবর্তিকালে জীমূতবাহন শূলপাণি রঘুনন্দন দেবীবর প্রমুখের গ্রন্থে যুগোপযোগী পরিবর্তন লাভ করেছিল। যে সমাজে এই চিরন্তন ধারা প্রচলিত ছিল সে সমাজ বর্তমানে শিথিলবন্ধন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সমাজ-শাসন বৈশ্য-শূদ্রে গ্রাস করেছে। বর্ণাশ্রমবদ্ধ সংহত কাঠামোর বাইরে অনেক বর্ণ ও গণের উদ্ভব ঘটেছে। ফলে পুরাতন নিয়ম ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু আমাদের সমীক্ষিত যুগে ব্রাহ্মণ্য-শাসন অপ্রতিহত ছিল। সুতরাং জীমূতবাহন, শূলপাণি দেবীবর, রঘুনন্দনের স্মৃতির অনুশাসনে বদ্ধ এই সমাজে দশসংস্কার বিধির অনুসরণ একান্তভাবে লক্ষণীয়।

১ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—ম. বা. বা - পৃ - ৪০-৪১

২ দি. প. স - পৃ - ৬৩ ; ৩ ম. সা—পৃ - ৪৪ ;

৪ বা. দে. ই - পৃ - ১৩

· ষোড়শ শতকের শেষদিকে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত জাতকৃত্য বিবিধ বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কাব্যের প্রথমদিকে আখেটিক-খণ্ডে তথাকথিত ভদ্রেতর ব্যাধ-নিষাদ সমাজের এবং দ্বিতীয় অংশে বণিকখণ্ডে ভদ্রসমাজে প্রচলিত জাতকৃত্যানুষ্ঠানের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তারমধ্যে মৌল প্রভেদ না থাকলেও কতকগুলি সংস্কার একান্ত-ভাবে ভদ্রেতর সমাজের পালনীয় বিধি। উক্ত কাব্যের দু'টি কাহিনী অবলম্বনে জাতকৃত্যসমূহের তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান অনুচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বণিকখণ্ডের জাত-কৃত্যের প্রাথমিক অনুষ্ঠান—খুল্লনার প্রথম রজো-দর্শন অনুষ্ঠান। জ্ঞাতি-কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধবের আনন্দ-উল্লাস, নৃত্য-(মদনমঙ্গল) -গীত, কাদা-খেউর, পুরোহিতের স্বস্তিবাচন, জলখেলা—ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হ'তো মহাসমারোহে।[১]

অতঃপর পুনর্বিবাহ। মূল বিবাহের বেদ-বিহিত কৃত্যাদি, পিঠালি নির্মিত একুশপুতুল পূজা, আত্মীয়-কুটুম্বের কৌতুক এবং যৌতুক প্রদানের মধ্য দিয়ে উৎসব সম্পূর্ণ হ'তো। সেকালে ধারণা ছিল, ঋতুমতী রমণীর গর্ভে পরবর্তি নবম রাত্রির শেষে দশম দিনে সন্তান প্রবেশ করে। ফলতঃ ওই দিন উৎসবের আয়োজন হ'তো ঘটা করে। বিবিধ বাদ্যের ঐকাতান, ব্রাহ্মণের স্বস্তিবাচন, দ্বিজ ও মুনিগণ কর্তৃক বেদপাঠ হতো যথারীতি। গর্ভিনী পট্টবাস পরিধান ক'রে স্বামীর পাশে বসে যজ্ঞক্রিয়াদি সম্পন্ন করতেন। পরে কুলদেবতা স্মরণ করে সূর্যার্ঘ্য দেওয়ার রীতি ছিল। শতেক ধেনু প্রদত্ত হ'তো দক্ষিণা বাবদ। ব্রাহ্মণগণ হোমের তিলক কপালে পরিয়ে দিয়ে বেদমন্ত্রে আশীর্বাদ করতেন। আত্মীয় বন্ধুগণ যৌতুক দিত প্রথামতো। তারা সকলে মিলে 'পিটালি মণ্ডলী' অনুষ্ঠান করতো। স্বামী সাতটি পিঠালির পুতুল রাখতো ; স্ত্রী সেগুলি আঁচলে কুড়িয়ে নিতো। পরিহাসীজনেরা যথেচ্ছ পরিহাস করতো। একুশ দিনে নিরামিষ আহারের বিধি ছিল।[২]

তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, পঞ্চদশ শতকে রচিত বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' অথবা সপ্তদশ শতকে রচিত রূপরামের ধর্মমঙ্গলকাব্যে এই

১ ক. ক. চ - পৃ - ১৭০-৭১
২ ঐ পৃ - ১৭১

সংস্কারের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু সেজন্য এরূপ অনুমান অভ্রান্ত নয় যে, কেবলমাত্র ষোড়শ শতকেই এই সংস্কারটির অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবতঃ কবিকঙ্কণ কোনো সুপ্রাচীন সংস্কারের স্মৃতির কাঠামোয় কবিকল্পনার সাহায্যে প্রাণসঞ্চার করেছেন কিংবা এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে এটি একটি নিছক আঞ্চলিক সংস্কাররূপে সেযুগের সমাজে বর্তমান ছিল।

গর্ভবতীর গর্ভকালের দশমাসের দশ অবস্থা বোধহয় সর্বকালে সর্বদেশে একই প্রকার।[১] 'প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।' দ্বিতীয় মাসে গর্ভ-সংবাদ কানাকানি হয় আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে। ক্রমে দুর্বলতা, আলস্য, ন্যাকার, হাই-ওঠা, আহারে অনিচ্ছা, বিশেষ আহার্যের প্রতি আগ্রহ, স্তনবৃন্তের শ্যামবর্ণ ধারণ, সোঁদা-গন্ধযুক্ত মৃত্তিকা ভক্ষণের প্রবল ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।[২] এই সময়ে গর্ভিনীকে সাধভক্ষণ' করানোর প্রথা আছে। নিদয়ার সাধভক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে দু'বার। প্রথম সপ্তমমাসে নববস্ত্র পরিধান ক'রে "জ্ঞাতি বন্ধু নিঞা সভে" এবং পরে নয়মাসে।[৩] রম্ভাবতীর সাধভক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে একবার—সপ্তম মাসে।[৪]

প্রচলিত নিয়মে 'পঞ্চামৃত' অনুষ্ঠিত হয় সাধারণতঃ পাঁচমাসে।[৫] কিন্তু চূড়ামণি দাসের বর্ণনা অনুসারে, শচীদেবীর পঞ্চামৃত অনুষ্ঠিত হয়েছে 'অন্তমাস' অর্থাৎ দশম মাসে।[৬]

গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা হবে দৈবজ্ঞ ডেকে গণনা করানোর প্রথা ছিল। দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎবাণী সবক্ষেত্রে কার্যকরী হ'তো কিনা জানা যায় না; তবে এ কাজের জন্য তারা বিদায় পেতেন যথেষ্ট।[৭]

১ এ বিষয়ে শ্রীজীবনচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁর 'শতাব্দীত্রয়ে সমাজ পরিক্রমা' (অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ) গ্রন্থে ওড়িয়া কবি কবিকর্ণের 'ষোলপালায়' বর্ণিত জাতসংস্কারের সঙ্গে কবিকঙ্কণ-বর্ণিত জাতসংস্কারের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন সবিস্তারে।

২ ক ক চ - পৃ - ৪৩-৪৪, ২০৮-২০৯

৩ ঐ পৃ—৪৪

৪ ঐ পৃ—১১০

৫ পাঁচ মাসে পাঁচ রকম গোটাফল গর্ভিনীর আঁচলে দিয়ে পঞ্চামৃত সংস্কার বাঁকুড়া—মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কুটুম্ব সমাগম ও আহারাদি এই অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ। মালাবারে গর্ভিনী নারীকে সপ্তমমাসে 'সপ্তামৃত' খাওয়ানোর বিধান আছে।

৬ গৌ. বি - পৃ - ১৩-১৪

৭ যদি বা দৈবজ্ঞ পায় মৃগমাংস দেই তায় পুত্র কন্যা গণনের হেতু। ক. ক. চ - পৃ - ১২৫

প্রসববেদনা শুরু হলে ডাক পড়তো প্রসব-অভিজ্ঞা প্রতিবেশিনী বা মন্ত্রবিদ্ ওঝার। 'মন্ত্রীতজল' বা মন্ত্রপূতজল এ ব্যাপারে বিশেষ ফলপ্রদ ছিল।[১] সুপ্রসবের পক্ষে অধিকতর কার্যকর ধর্মশূলের[২] প্রয়োগ করা হতো ক্ষেত্র-বিশেষে। 'পাচাত্তি' (পাচনকর্ত্রী ধাত্রী) ডাকার নিয়ম ছিল সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর। সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে কুমারিকা লতা[৩], বেত্রজাল উপানত্[৪] ইত্যাদি বেঁধে দিয়ে তুক্ করা হ'তো। আগুন করা হতো শুকনো ডাল[৫] বা চালের খড় জ্বালিয়ে।[৬] নবজাতকের নাভিচ্ছেদ করা হ'তো হুলুধ্বনি দিয়ে। গোমুণ্ড দিয়ে ষষ্ঠীস্থাপনা করা হ'তো সাধারণতঃ সূতিকা-গৃহের ডানদিকে।[৭] তিন দিনে গর্ভিনীকে সুপথ্য পাচন দেওয়ার বিধি ছিল এবং 'পাঁচদিনে পাঁচোট পাউস বিসর্জন।'[৮] ছয়দিনে ষাটিয়ারা হ'তো রাত্রি জাগরণের মধ্য দিয়ে।[৯] 'আটদিনে অষ্টকলাই কৈল ধর্ম্মকেতু[১০] এবং নয়দিনে নবনত্তা।'[১১]

১ ক. ক. চ - পৃ - ৭৭, ২১০

২ দেবী সাঙাবিয়া বামা দিল ধর্ম্মশূল। ভূতলে পড়িল তার গর্ভের ফুল॥ ক ক. চ পৃ - ২২০ এই ধর্মশূল ধর্মঠাকুরের পূজার শাল বলে মনে হয়। এই শাল বা শূল কায়াভেদক বলে প্রসূতির আশু গর্ভমোচনের কার্যকরী তুক্ বিশেষ।

৩ মনসাবিজয় – পৃ - ১৫১ ; ৪ ক. ক. চ - পৃ - ২১১ ; ৫ ক. ক. চ - পৃ - ৪৭ ;

৬ ক. ক. চ - পৃ - ১১৩

৭ পপিরাসে বর্ণিত গাভী দেহধারী প্রধান মিশরীয় দেবী হঠোরের (Hothor < সং ষট) সঙ্গে ষষ্ঠী দেবীর যোগসূত্র নির্ণয় প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। চি. প. স - পৃ - ২১

৮ ক. ক. চ - পৃ - ৪৫

৯ ছয়দিনে ষাটিয়ারা কৈল জাগরণ। পৃ ... মনসামঙ্গল-ক্ষেমানন্দ

১০ চূড়ামণি দাসের বর্ণনা অনুসারে এই অষ্টকলাই যথাক্রমে—উরীদ, বাটুল, মুগ, বরবটী, মোট, মুসরী, তেয়ড়ী এবং ছোলা।

১১ ক. ক. চ - পৃ - ৪৭, ১১৩, ২১১ ; নবম দিবসে করিল নবনর্ত্তা ৯থ : ৫০৪৬ ; নয়মাসে নঞা— গোবিন্দবিলাস : যশশ্চন্দ্র। একখানি পুরাতন পত্রে (চি. প. স - ২ পৃ—৫৪৮) সন্তান জন্মের ছত্রিশ দিন পরে 'লতা' হওয়ার সংবাদ মেলে। লতা (যোষিদধিকরণক ইষ্ট দেবতারাধন) শব্দের মূল তৎসম 'নক্তম' হওয়া সম্ভব। এই আচারের শাস্ত্রীয় মূল পাওয়া যায় না তবে নামটি অজ্ঞাত ঐতিহ্যবাহী। এই সংস্কার আর্যেতর হওয়া সম্ভব বর্তমানে সাঁওতালরা 'নপ্তা' পালন করে জাতকৃত্যে। —চি. প. স - পৃ - ৯২

কালকেতুর জন্মের একমাস পূর্তির দিন ষষ্ঠীপূজা বা একুইশা পূজা হলো মহাসমারোহে। এই উপলক্ষে ধর্মকেতু জোড়া বলি দিলেন—দক্ষিণে ঘোড়ারু ও বামে ঢোলকান।[১]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, শ্রীমন্তের ষষ্ঠীপূজা হয়েছে দু'বার। প্রথমবার ছয়দিনে কৈল ষষ্ঠীপূজা জাগরণ।' দ্বিতীয়বার ষষ্ঠীপূজা কৈল তার একুশ দিবসে।[২] কিন্তু কোনোবারেই ষষ্ঠীপূজায় বলিদানের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীমন্তের জাত-কৃত্যের একটি নূতন সংস্কার—সপ্তম দিনে সপ্তঋষির অর্চনা।[৩]

জাতকৃত্যে 'হরিদ্রা তৈল' উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে লিখিত চিঠিপত্রে।[৪] বর্তমানকালেও অনেক বনেদী পরিবারে এই অনুষ্ঠান মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত ও অভ্যাগতদের উত্তমরূপে হরিদ্রা-মিশ্রিত তৈল মাখানো এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এই অনুষ্ঠান নবজাতকের আয়ুবর্ধক এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত। ইহা স্ত্রী-আচার এবং সম্ভবতঃ আর্যেতর বিধি।[৫] রূপরামের ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের জন্মের পর পুত্রের কল্যাণ কামনার্থে এই উৎসব প্রতিপালিত হয়েছিল।[৬] কবিকঙ্কণের কাব্যে এই কৃত্যের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে পুত্রজন্মের সংবাদে 'পুত্রের কল্যাণ হেতু' সাধ্য-মতো দান করতো সকলেই। কালকেতুর জন্মের পর—সুতের কল্যাণ হেতু স্নান করি ধর্ম্মকেতু দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ।[৭]

॥ **জাতক্ষণ** ॥ পূর্বাপর আলোচনায় দেখা যায়, হিন্দুজাতক জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণ্ডীভুক্ত হয় জন্মের পূর্ব থেকে। গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা জ্যোতিষ গণনায় স্থিরীকৃত হয়ে যায় জাতকের গর্ভবাসকালেই। জন্মকালে গ্রহাদির সংস্থান এবং অঙ্গের লক্ষণ বিচার করে জন্মপত্রিকা বা জায়াতি প্রণয়নের রীতি সেকালে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল ব্রাহ্মণ-বণিক প্রমুখ ভদ্রসমাজে।[৮]

১ ক. ক. চ - পৃ - ৪৫ ; ২ ক. ক. চ - পৃ ২১১ ; ৩ ক. ক. চ - পৃ - ২১১
৪ চি প. স - ২ পৃ - ৯১-৯১ ; ৫ বা. দে. ই - পৃ - ১৩ ; চি. প. স - পৃ - ৯২
৬ পথে বস্যা চৌউকি—পথিক ধর‍্যা আনে। তৈল মাখাইয়া তার সোনা দেই কানে॥ - পৃ - ১২৪
৭ ক. ক. চ - পৃ - ৪৫ ; ৮ ক. ক. চ - পৃ - ২১১

কহিলে জনম মাঘে শুক্লা ত্রয়োদশী। অতি সুলক্ষণ অনুরাধা বিষ্ণুরাশি ॥
সর্বগ্রহ তুঙ্গ পূর্ণ একাবলী যোগ। সর্ব্ব-শুভ গ্রহ নিজ ঘরে করে ভোগ ॥[১]
এই সকল বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল ছিল।

দশসংস্কারের সপ্তম সংস্কার অন্নপ্রাশন। মহাভারতের সমাজে এই সংস্কার ছিল বলে অনুমিত হয়।[২] রঘুনন্দনের গ্রন্থে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে।[৩] 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্যের বর্ণনা অনুসারে, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্নপ্রাশনের শুভদিন স্থির হ'লো—'সিত পঞ্চমী হস্তা নক্ষত্র শুক্রবারে।' অন্নপ্রাশনে গন্ধ অধিবাস, হোমযজ্ঞ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায়। চূড়ামণি দাসের মতে, শ্রীচৈতন্যের অন্নপ্রাশনে পৌরোহিত্য করেছিলেন—অদ্বৈতবাদীন্দ্র-আদি অধ্যাপকগণ।

অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে নামকরণের বিধি সেকালেও ছিল। সাধারণতঃ গণকঠাকুর নামকরণ করতেন রাশি বিচার ক'রে।[৪] কোষ্ঠী বিচার ক'রে তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী নামকরণের বর্ণনা চৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়।

জাতকের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পূর্বাভাস জানার জন্য অন্নপ্রাশনের কালে জাতকের কাছে ধান্য, পুথি, স্বর্ণরজতাদি উপস্থিত করা হয়। ধান্য স্পর্শ করলে পাকাচাষী, পুথি ধারণে বিদ্বান, স্বর্ণ-রজত স্পর্শে জাতক ধনবান এবং ব্যবসায়ী হবে এইরকম বিশ্বাস এযুগের মতো সেযুগেও প্রচলিত ছিল।[৫]

॥ শ্রবনবেধ ॥ শ্রবনবেধ বা কর্ণবেধ অনুষ্ঠিত হতো পাঁচ বছর বয়সে।[৬] কুলপুরোহিত দ্বারা এই কৃত্য সম্পন্ন হ'তো। শ্রীমন্তের কর্ণবেধ অনুষ্ঠানে নিখুঁতভাবে কাল-নিরূপন ও কৃত্য-সমাপনের জন্য তামি পাতা হয়েছিল।[৭] এই অনুষ্ঠানে খড়িকা (কাঠি) বা তাড়্যাত পাতায় কান বেঁধা

১ গো. বি - পৃ - ৮; ২ ম. স - পৃ - ৪১

৩ দ্র· অষ্টা - পৃ - ২৩০

৪ গণকে কহিল রাশি রোহিনীতে বৃষ। বিশ্বম্ভর নাম ইহার পরম সদৃশ ॥ —গো. বি - পৃ - ২১

৫ চৈ. ভা. পৃ - ১৯; ৬ পঞ্চম বয়সে কৈল শ্রবন বেধন। —ক. ক. চ - পৃ - ৪৫, ১১১, ২১৫

৭ ক. ক. চ

হ'তো। এই কৃত্য সম্ভবতঃ আর্যেতর বিধি। বীরহোড় জাতির মধ্যে এই অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে।[১]

॥ উপনয়ন ॥ চূড়ামণি দাসের বর্ণনা অনুসারে, শ্রীচৈতন্যের চূড়াকরণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে। এই অনুষ্ঠানে পঞ্জিকা-পুথি দেখে ভট্টাচার্য শুভক্ষণ শুভদিন শুভ তিথি নির্ণয় করলেন যথারীতি। উপনয়নের দিন ধার্য করলেন স্বয়ং গঙ্গাদাস চক্রবর্তী—'অক্ষয় তৃতীয়া তিথি শ্রীবৈশাখ মাসে।' শ্রীচৈতন্যের উপনয়ন উৎসবে যজ্ঞশ্রাদ্ধ, ফলাহার ইত্যাদির বর্ণনা গৌরাঙ্গবিজয় কাব্যে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে।[২] উপনয়ন সংস্কার একান্ত-ভাবে ব্রাহ্মণের পালনীয় সংস্কার; কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায়, দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থদের মধ্যেও এই সংস্কার সুপ্রচলিত। দ্বাদশ-শতকে বৌদ্ধ-পণ্ডিত অদ্বয়বজ্র চণ্ডালদের উপবীত সংস্কারের উল্লেখ করেছেন।

কবিকঙ্কণের কাব্যে নিষাদ সমাজের একটি বিশিষ্ট সংস্কারের উল্লেখ করেছেন—কালকেতুর কর্মজীবনে অভিষেক বা সমাবর্তন। পুত্রের উপযুক্ত বয়স হলে ধর্মকেতু পণ্ডিত এনে শুভদিন শুভবারে কালকেতুর হাতে আনু-ষ্ঠানিকভাবে ধনুর্বাণ অর্পণ করে আখেটি-বিদ্যার যাবতীয় উপদেশ দান করলেন।[৩]

॥ বিবাহ ॥ অতি প্রাচীনকালে নরনারীর যথেচ্ছ সম্ভোগ বা স্বৈরাচার প্রচলিত ছিল। কথিত আছে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য-সমাজে উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু স্ত্রী-পুরুষের নিয়ন্ত্রিত যৌন-জীবনযাপনের বৈধ অধিকার বা বিবাহ-প্রথার প্রথম প্রবর্তন করেন।

বিবাহের প্রকার ভেদ নির্ণয়ে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত থাকলেও গৃহ্যসূত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং স্মৃতির যুগ থেকে—ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য, আর্য, শৈব, গান্ধর্ব আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ ভেদে আট রকম বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কালিদাসের কাব্যে গান্ধর্ববিবাহের প্রসঙ্গ আছে। রাক্ষস-বিবাহে কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে আনা হয়। মহাভারতের যুগে এই বিবাহের প্রচলন

১ The Birhors - P. 237-40

২ গৌ. বি - পৃ - ৫৭ - ৫৯;

৩ ক. ক. চ - পৃ - ৪৬

ছিল। আমাদের সমীক্ষিত যুগে ব্রাহ্ম বা প্রজাপত্য বিবাহ রীতির অনুসরণ লক্ষণীয়। ব্রাহ্ম বিবাহে বেদবিদ্ ও সচ্চরিত্র পাত্রকে বিধিমতে আমন্ত্রণ করে সালঙ্কারা ও সুসজ্জিতা কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়। এই প্রকার বিবাহে সপ্তপদীগমনের পর কন্যার গোত্রান্তর হয়।

কালকেতু ও ধনপতির বিবাহে আচরিত বিভিন্ন সংস্কার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেযুগে বিবাহে বৈদিক আচার এবং বেদাচার বহির্ভূত লৌকিক বা স্ত্রী-আচারের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল। কতকগুলি সংস্কার একান্তভাবে স্থানীয়।

সেযুগে বিবাহের দিন স্থির হ'তো শুভক্ষণ তিথি নক্ষত্র গণনা করে।[১] বিবাহের পূর্বদিন কন্যাগৃহে গন্ধ-অধিবাস-দ্রব্যসহ 'অধিবাস ডালা' প্রেরণের রীতি ছিল। খুল্লনার বিবাহে 'গন্ধাদিবাসের' দ্রব্য-সম্ভারের দীর্ঘ তালিকায় তৈল, সিন্দুর, পান, গুয়া, কোলসরা, সুতা, নাটাই ছাড়াও ঘৃত, দধি, খৈ, চাল, ডাল, মাছ এবং জোড়া জোড়া খার্সার উল্লেখ আছে।

ফুল্লরার বিবাহে ব্রাহ্মণেরা শুভক্ষণে 'ছান্দলা' স্থাপন করলেন। গোময়-মৃত্তিকা লেপন করে বিচিত্র আলিপনায় 'ছাঁদনা তলা' সুসজ্জিত করা হ'লো। হরিদ্রা বাস পরিধান করে পাত্রীকে বসানো হতো। পুরোহিত 'ওঝা' বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে 'গন্ধাদিবাস' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। মহীগন্ধ, ধান্য-শিলা শ্বেতদূর্ব্বা, পুষ্পমালা, দধি, ঘৃত, সিন্দুর, কজ্জল, স্বর্ণ, তাম্র, রৌপ্য গোরোচনা চামর, দর্পণ, কর্পূর প্রভৃতি অধিবাস উপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় মুকুন্দরামের কাব্যে।

অধিবাসের পর কন্যার হাতে সুতো বাঁধা হ'তো। ষোড়শমাতৃকার আরাধনা করে শুরু হতো নান্দীমুখের পালা। খুল্লনার বিবাহে নান্দীমুখের সময় দিনপতি, প্রজাপতি মন্থনষষ্ঠী এবং মৃকণ্ডু-নন্দনের পূজা করা হয়েছে। জনাই পণ্ডিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে খুল্লনার হাতে সুতো বাঁধলেন। গৌরী, পদ্মা, মেধা, শচী, সাবিত্রি, বিজয়া জয়া, দেবসেনা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি ক্ষমা

---

১ ত্রয়োদশী রবিবার নক্ষত্র রেবতী। বিবাহে সঞ্জয়কেতু ছিল অনুমতি॥ ক. ক. চ—৪৭
লগ্ন করিল ওঝা শুভক্ষণ গণি। গণিযা নির্ণয় কৈল উত্তর ফাল্গুনী॥
ত্রয়োদশী রবিবার ইন্দ্র নামে যোগ। দোযাম রজনী মধ্যে মাসের অর্দ্ধভোগ॥ ক. ক. চ
পৃ - ১২১

প্রমুখ দেবদেবীর পূজার্চনা হ'লো এবং "ঘৃত দিয়া সাত ডোরা কাঁথে দিল বসুধরা কৈল নান্দীমুখের বিধান।"

সুমঙ্গল হুলাহুলি ধ্বনির মধ্যে বর এবং বরযাত্রী-দল কন্যা গৃহে উপনীত হলে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে যেতো। বরযাত্রীগণকে যথাবিহিত আদর আপ্যায়ণ করা হতো। সুরসিকা রমণীরা বরের গায়ে 'গুড় ও চাউলি' নিক্ষেপ করে আনন্দ উপভোগ করতো। এবং পরিশেষে গুয়া কাটার ব্যাপারে গণ্ডগোল বাধাতো।

বরকে বিবাহ সভায় উপস্থিত করা হলে ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা হতো। পান-পাতায় মুখমণ্ডল আবৃত করে কন্যাকে বিবাহ সভায় আনা হ'তো। ছামনী বা শুভদৃষ্টির সময় 'নিছিয়া ফেলিল পান' এবং 'গলে তুলি দিল পুষ্পমালা।' সপ্তপ্রদক্ষিণ শেষ হলে সঞ্জয়কেতু হৃষ্টচিত্তে 'হাথে কুশে করে কন্যা দান।' ব্রাহ্মণ গাঁটছড়া বেঁধে দিতেন এবং বর-কন্যাকে অরুন্ধতী দর্শন করানো হতো। রোহিণী ও সোমের বন্দনা হতো হোম করে। এরপর কুসুমশয্যায় নবদম্পতি মধুনিশি যাপন করতো।[১] ধনপতির বিবাহে স্ত্রী আচারের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।[২]

কালুব্যাধের বিবাহের যৌতুক ধনু এবং গোটা তিন খর বাণ।' ধর্মকেতু বৈবাহিক বরণ করলেন 'সাত নলা আঠা জাল ফান্দ' দিয়ে।[৩] ধনপতির বিবাহের যৌতুক 'অঙ্গদ অঙ্গুরী হার ভূষণ চন্দন।[৪] চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় বিবাহে জামাতা বরণ করা হয়েছিল 'পাদ্য অর্ঘ্য, আচমনী, বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে। যৌতুক দেওয়া হয়েছিল—দিব্যশয্যা, ধেনু, ভূমি, দাসী, দাস।'[৫]

বরকন্যা বিদায়ের কালে কুলপ্রথামতো সঞ্জয়কেতুর স্ত্রী ফুল্লরার কোলে আমানি-পূর্ণ পাথরা দিয়ে স্ত্রী-আচার পালন করলেন।[৬] বিবাহের পূর্বে[৭] ও

১ ক. ক. চ - পৃ - ৪৮; ২ ক. ক. চ - পৃ - ১২৪

৩ ক. ক. চ - পৃ - ৪৮; ৪ ক. ক. চ - পৃ - ১২৪

৫ চৈ. ভা - আদি - ১১; ৬ ক. ক. চ - পৃ - ৪৮

৭ বিবাহের পূর্বদিনে কুলধর্ম আছে। নববধূ চলি যায় ভবানীর কাছে॥ চৈ. ভা—১৯১

পরে[১] এই রকম নানাবিধ কুলপ্রথা আচরিত হ'তো সেযুগে ; এযুগেও এই রীতি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই ।

॥ **পাত্র-পাত্রী নির্বাচন** ॥ সেযুগে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য মেলে কবিকঙ্কণের কাব্যে । 'কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসরা' এবং 'রন্ধন করিলে ভাল এই কন্যা জানে ।' এই গুণে ফুল্লরার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে এক কথায় । পক্ষান্তরে, কালকেতু 'নিত্য মৃগ বধ করে' এবং 'ভাত আছে ঘরে' সুতরাং এমন সুপাত্র আর কে আছে । তাছাড়া, তার কুলখ্যাতিও ছিল যথেষ্ট । পাত্র নির্বাচন বিষয়ে অভিজ্ঞ ঘটক দনাই ওঝা পাত্রের কুলশীল, রূপ-গুণ এবং বিদ্যা-বুদ্ধির প্রাধান্য দিয়েছেন । ধনপতি মহাকুল দত্ত-বংশসম্ভূত, প্রথম-যৌবন, মোহন-মূরতি, যেমন রূপ তেমনই গুণ 'বেভার'-ও উত্তম ; দেবদ্বিজ গুরুর চরণে অবিচল শ্রদ্ধা, দানে কর্ণসম, নাটক নাটিকা কাব্যে অভ্যস্ত ; সুতরাং এমন সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় না দিয়ে কন্যার পিতা লক্ষপতির উপায় ছিল না ।

॥ **পণ-প্রথা** ॥ বিবাহে কন্যা বিক্রয়ের প্রসঙ্গ আছে ।[২] আসুর-বিবাহে বরপক্ষের নিকট প্রচুর অর্থাদি গ্রহণ করে কন্যাদান করা হতো । খুল্লনার মাতার উক্তি—হিতাহিত নাহি জ্ঞান না নিবে কন্যার পণ কেন ঝিয়ে করিব দুর্গতি ।[৩] থেকে স্পষ্টতই প্রতিভাত হয় কন্যাপণ নিয়ে বিয়ে দিলে স্বামীগৃহে কন্যাকে দুর্গতি ভোগ করতে হতো সেযুগে ।[৪] প্রাচীনকালে স্ত্রীলোক ছিল পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি-বিশেষ । সেইজন্য বরের পিতার বদলে কন্যার পিতা বিবাহে পণ আদায় করলে অসঙ্গত বিবেচিত হতো না । প্রাচীন হিন্দু সমাজে বরপণের নিদর্শন পাওয়া যায় না । রঘুবংশের বর্ণনা অনুসারে, রাজা বিদর্ভ তাঁর ভগ্নীর বিবাহের পর স্বামীগৃহে গমনের সময় প্রচুর উপহার দিয়েছিলেন ।[৫] তবে এই উপহার প্রদানকে বরপণ বলা চলে না । চৈতন্যদেবের

১ মোর কুলে পরম্পর আছয়ে আচার । বিভা করি নয় মাস নহে নদী পার ॥
ক. ক. চ - পৃ - ২৮৭

২ Kane - P - 503 - 9 ; ৩ ক. ক. চ - পৃ - ১১৮

৪ এদেশে হাড়ি, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি সমাজে কন্যাপণ গ্রহণের প্রথা ছিল কিছু দিন পূর্বেও । বর্তমানে সাঁওতাল সমাজে 'বাপ্‌লা' বা 'কিরিঙ-বিহু' (কন্যাপণ বিবাহ) সুপ্রচলিত ।

৫ চি. প. স - ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ - পৃ - ১৩১

বিবাহে এইরূপ স্বেচ্ছায় প্রভূত যৌতুক দানের বর্ণনা পাওয়া যায়।[১] কিন্তু বরপণের কোন প্রসঙ্গ নাই।

কালকেতুর বিবাহে পণ স্বরূপ নগদ অর্থ পাওয়া গিয়েছিল—'পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন।' এছাড়া, তিনটে পাতন কাঁড়, ঘটকালির বারোপণ এবং কন্যাদর্শনী স্বতন্ত্র। বিবাহের পূর্বে কন্যাকর্তাকে 'গোলাহাটে' গিয়ে পণের কড়ি পরিশোধ করতে হয়েছে কড়ায় গণ্ডায়।[২]

ধনপতির বিবাহে স্বতন্ত্র ব্যাপার। তিনি একে দোজবরে বর' তায় উপযাজক হয়ে ঘটক পাঠিয়ে বিবাহ প্রস্তাব করেছেন; তাই তাঁর বিবাহ হয়েছে বিনাপণে— আহরিয়া বর আনি কহিয়া মধুর বাণী পণ বিনা করে সমর্পণ।' কিন্তু শ্রীমন্ত সদাগরের বিবাহের যৌতুক—"হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া সোনালিয়া জিন" আর বরপণ অর্ধেক রাজত্ব।[৩]

॥ **বিবাহের বয়স** ॥ বর ও কন্যার বিবাহের উপযুক্ত বয়স নির্ধারণে যুগে যুগে জাতিতে জাতিতে প্রদেশে প্রদেশে একইকালে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে পুরুষের বিবাহের বয়স সম্পর্কে কোনো বিশেষ সীমা-রেখা ছিল না। তবে কন্যার বিবাহের উপযুক্ত সময় নির্ধারিত হয়েছিল কন্যা ঋতুমতী হওয়ার পূর্বে। কবিকঙ্কণের কাব্যে 'খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব' শীর্ষক অংশে দ্বিজের উপদেশ বাণীর মধ্যে এই ধারার অনুবর্তন লক্ষণীয়।

শুন হে অবোধ লক্ষপতি—
বার বৎসরের সুতা তোর ঘরে অবস্থিতা কেমনে আছহ সুস্থমতি।
সপ্তম বৎসরের কন্যা বিভা দিলে হয় ধন্যা তার পুত্র কুলের পাবন।
. ...
নবম বৎসরে যদি বর আনি যথাবিধি তনয়া করয়ে সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জল সুরপুরে পায় স্থল পিতৃলোকে পায় বহু মান॥
কেহ না বুঝাল্য তোমা গত হইল দশসমা তথাচ না কৈলে কন্যাদান।

১ পণপ্রথা না থাকলেও সেযুগে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা পুত্র-কন্যার বিবাহে প্রভূত অর্থব্যয় করতেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়—ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়। চৈ. ভা - ১/২

২ ক. ক. চ - পৃ - ৪৭

৩ শ্রীমন্তেরে রাজা যদি কৈল কন্যাদান। নানা ধন দিয়া তার সাধিল সম্মান। অর্ধরাজ্য দিব বাপে করাইয়া ইঙ্গিত॥ —ক. ক চ - পৃ - ২৮৩-৮৬

প্রবেশিলা একাদশে মদন হৃদয়ে বৈশে নব রস হয় একস্থান ॥
না করিলে কর্ম ভাল এগার বৎসর গেল অপযশ করিলে সঞ্চয় ।
দ্বাদশ বৎসর বেলা হয় কন্যা রজস্বলা পুরুষেরে নাহি করে ভয় ॥
তাবত পুরুষে ভয় যাবত পুষ্পিতা নয় রহে সয়ে তার কাম-মনা ।[১]

পুরুষদেরও বিবাহ হতো অল্পবয়সে। 'পঁচিশ বৎসরের হৈল নাহি হয় বিভা।'[২] সেকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

॥ **বহু বিবাহ** ॥ আলোচ্য যুগে বহুবিবাহের উল্লেখ বিরল হলেও এক পত্নীর বর্তমানে একাধিক বিবাহ সমাজে দূষণীয় ছিল না। কালকেতুর উক্তি[৩] থেকে জানা যায়, ভদ্রেতর সমাজে একাধিক দার-পরিগ্রহ করার রীতি সুপ্রচলিত ছিল; ভদ্রসমাজেও একাধিক বিবাহের উল্লেখ আছে প্রচুর।[৪]

॥ **গণিকা বৃত্তি** ॥ বেশ্যাচারের ঐতিহ্য এদেশে সুপ্রাচীন। ঋগ্বেদে সাধারণের উপভোগ্যা পণ্যা রমণীর প্রসঙ্গ আছে।[৫] চর্যাগীতে সেযুগের যৌন জীবনের অনিয়ন্ত্রিত রূপ সুপরিস্ফুট।[৬] ষোড়শ শতকের সমাজ গণিকাবৃত্তি অস্বীকার করে নি। কালকেতু-প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে গণিকাদের স্থান নির্দিষ্ট হলো স্বতন্ত্র পল্লীতে।[৭]

॥ **অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও পারলৌকিক কৃত্যাদি, সহমরণ** ॥ শবর পা'র রচনায় শব-যাত্রার বর্ণনা আছে।[৮] বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সেযুগে শবযাত্রা হতো সংকীর্তন সহকারে।[৯] মৃত্যুর পূর্বে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে

১ ক. ক. চ - পৃ. - ১১৭ ; ২ ক. ক চ - পৃ. - ৯১

৩ শাশুড়ি ননদী নাহি নাহি তোর সতা। কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করা্যা চক্ষু কৈলি রাতা।
ক. ক. চ - পৃ. - ৬৯

৪ কবিকঙ্কণের বর্ণনা অনুসারে, ধনপতির দুই পত্নী—লহনা ও খুল্লনা। শ্রীমন্তের প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় সিংহলী রাজকন্যা সুশীলার সঙ্গে, দ্বিতীয় বিবাহ জয়াবতীর সঙ্গে।

৫ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—চি. প. স. - পৃ. ১৫৩

৬ চর্যা নং—১, ১০, ১৯, ৪৯,

৭ লম্পট পুরুষ আশে বারবধূজন বৈসে এক ভিতে তার অধিষ্ঠান। ক. ক. চ - পৃ. - ৯০

৮ চর্যা নং—৫০

৯ সংকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া। চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্তন করিয়া ॥
যথোচিত ক্রিয়া করি কৈল গঙ্গাস্নান। .... ॥ চৈ. ভা. - পৃ. - ২৩৩
মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথাও ছিল। 'কোন মড়া পোড়ে কূলে কোন মড়া ভাসে জলে।' ক. ক. চ - পৃ. - ৮১

'গঙ্গা অন্তর্জলে' রাখার সংস্কার সেযুগে প্রচলিত ছিল।[১] মৃত্যুর পর 'কুলাচার বেদবিহিত শাস্ত্রবিধানে' শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হতো। ব্রাহ্মণভোজন ও দান ছিল শ্রাদ্ধের অপরিহার্য অঙ্গ। গয়ায় পিণ্ডদানের সংস্কারও অজ্ঞাত ছিল না।[২]

॥ **সহমরণ** ॥ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ও ইউরোপ খণ্ডে এই প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। মনে হয়, বিধবাগণকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা কেবল ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য নয়; এর মূল মানব সমাজের প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার সমূহের মধ্যে নিহিত। বৈদিক সাহিত্যে সতীদাহের কোনো উল্লেখ নেই; বৈদিকমন্ত্রে বা প্রাচীন গৃহ্যসূত্রে এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না। ফলে অনুমান হয়, সহমরণ প্রাক্ বৈদিকযুগের আদিম প্রথা।

মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে সহমরণ প্রথার উল্লেখের অপ্রতুলতা হেতু অনুমান হয় সেযুগে এই প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল না। চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রের অকালমৃত্যু হলে পুত্রবধূরা অনুমৃতা হয়েছিলেন এমন বর্ণনা কোনো কাব্যে নেই। পক্ষান্তরে, বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্কল্প গ্রহণ করলে আত্মীয়-স্বজনরা তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। বেহুলা অল্পবয়সী বিধবার পালনীয় কঠোর জীবন যাপনে রাজী হন নি। অবশ্য কবিকঙ্কণের কাব্যে ছায়ার সহমরণ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩] অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের দিকে মনে হয় এদেশে এই প্রথা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে থাকে। এদেশে সতীদের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে সব সতীর মন্দির দেখা যায় সেগুলির বয়স প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই দু'শ বছরের বেশী নয়।

॥ **ঘরোয়া রীতি-নীতি** ॥ সেকালে ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর রজনী প্রভাত হতো দেবতার নাম স্মরণ করে।[৪] রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্কেত পাওয়া যেতো মোরগের ডাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণনা পাওয়া যায়—তাম্রচূড়া রাএ

১ মিশ্র পুরন্দর গঙ্গা অন্তর্জলে রহি। ....
গঙ্গা অন্তর্জলে লক্ষ্মী দিব্য মালা গলে। চৌদিগে কীর্ত্তন সর্ব্বলোকে হরি বলে।

২ মনসাবিজয় - পৃ - ১৩২, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পৃ - ৩১-৩২

৩ ক: ক. চ - পৃ - ৭৩

৪ রাম রাম স্মঙরণে পোহাল্য রজনী। শয্যা হৈতে প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি ॥
ক. ক. চ - পৃ - ৩০, ১২১, ১২৫

হইল বিহান।[১] তাছাড়া, কাক-কোকিলের ডাকে ঘুম ভাঙ্গার উল্লেখ আছে বৈষ্ণব-পদাবলীতে। সময় মাপার জন্য সেকালে তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না; তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঘটি (ঘটিকা, মুহূর্ত) শব্দের উল্লেখ আছে।[২] ৭ঘটি প্রায় ১৫ দণ্ড পরিমিত সময়।

প্রাতঃকৃত্য সমাপণ হতো নানাভাবে। রাত্রি-বাস ত্যাগ করে শুদ্ধবসন পরিধান করার রেওয়াজ ছিল।[৩] দন্তধাবণ করা হতো মরিচচূর্ণ দিয়ে।[৪] কেশসংস্কারের জন্য সেযুগে কাঁকই বা চিরুনির বহুল প্রচলন ছিল।[৫] কেশ সংস্কারের জনপ্রিয় উপকরণ ছিল সুগন্ধি আঁওলা তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি। এছাড়া, পাকতৈল, বিষ্ণুতৈল মহানারায়ণ তৈল, চন্দনাদি তৈলের উল্লেখ আছে ষোড়শ শতকের কাব্যগ্রন্থে।

চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয় কাব্যে পায়খানা শব্দের উল্লেখ থাকলেও মলমূত্র ত্যাগ করা হতো সাধারণত গৃহের বাইরে। বাইরে থেকে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে কিশোর নিমাই কখনও কখনও নবদ্বীপবাসীদের বিপদে ফেলতেন। চৈতন্যভাগবতে এই রকম বর্ণনা আছে—'কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে। লঘ্‌বী গুর্ব্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে॥[৬] ময়লা কাপড় কাচতো রজকে।

মধ্যযুগে বাঙ্গালীর স্নান পর্বটি খুবই সমারোহপূর্ণ। স্নানের পূর্বে উত্তমরূপে অঙ্গে তৈলমর্দনের ব্যবস্থা ছিল। সম্পন্ন গৃহস্থেরা তৈল মর্দনের জন্য মর্দনিয়া নিযুক্ত করতেন।[৭] এই বৃত্তি নাপিতদের ছিল একচেটিয়া।[৮] অবগাহন-স্নানের পক্ষে নদী ও পুষ্করিণী ছিল প্রশস্ত; তবে উষ্ণোদকে স্নানের

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন; ভারখণ্ড - পৃ - ১০৭

২ ঐ নৌকাখণ্ড পৃ - ৬৩

৩ পঞ্চকন্যা স্মরণ করিল একমতি। রাত্রি বাস এড়াইয়া পরে দিব্য ধুতি॥ রূপরামের ধর্মমঙ্গল পৃ - ১২১

৪ মাজন্ত জতনে রসনা দশনে শোধণ মরিচ চুরে। বি ভা. পৃ - ৪৬৬৪

৫ শ্রীপদমেরু গ্রন্থ , পদকল্পতরু - ৬৬৭ নং পদ। ৬ চৈ ভা. আদি - ৫

৭ মর্দনিয়া রাখ এক করিতে মর্দন। চৈ. চ - পৃ - ২৩৭

৮ নাপিত তনয় জানে মর্দন সুবন্ধ। গৌ. বি - পৃ ৭৫, 'মর্দ্দনে' পদবী এখনও এদেশে নাপিতদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

উল্লেখও পাওয়া যায়।[১] স্নানের সময় সাধারণ লোকে 'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করতো। পণ্ডিতেরা গঙ্গাস্নানে যেতেন গীতা ভাগবতের পুথি সঙ্গে নিয়ে। স্নানান্তে পূজাপাঠ সমাধা হতো গঙ্গাতীরে।[২]

সকালে উঠে কোনো কোনো গৃহকর্তা গৃহিণীকে সম্ভাষণ করে দ্বিপ্রাহরিক আহার্যের বিষয় সবিস্তারে নির্দিষ্ট করে দিতেন। সাধারণ মানুষের প্রাতঃরাশ ছিল খাজারি।[৩] তারপর যে-যার দৈনন্দিন কর্মে নিযুক্ত হতো। গোপ, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, তাম্বুলি, মালাকার, ব্যাধ সকলেই নিজ নিজ বৃত্তির অনুসরণে রুজি-রোজগার করতো। অধ্যাপক অধ্যাপনা কর্মে দিনযাপন করতেন। ধনপতি সদাগরের মতো ধনী ব্যক্তিরা বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়ে পায়রা উড়িয়ে শখ মেটাতেন। কর্মহীন আলস্যে দিনযাপন করতো, এমন লোকের সংখ্যাও কম ছিল না। চৈতন্য-ভাগবতের বর্ণনা থেকে জানা যায়, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বার দিয়ে (রাজপুত্রের মতো সভা করে) বসে থাকতেন।[৪]

বয়স্ক ব্যক্তিরা অবসর-বিনোদন করতেন পাশা-দাবা খেলায়। স্ত্রীলোকদের মধ্যেও এই সব খেলার প্রচলন ছিল। দিবানিদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভদ্রেতর সমাজের রমণীরা অবসর সময় কাটাতো বান্ধবীর মাথার উকুন দেখে।[৫]

চিরুনি দিয়ে কেশ সংস্কার করা হতো। রসাল দর্পণ (পারদের প্রলেপযুক্ত দর্পণ বিশেষ), রত্নদর্পণ বা ঝলকদাপুনি[৬] সামনে রেখে পাটের রঙীন বস্ত্রখণ্ড দিয়ে স্ত্রীলোকেরা কাণড়-ছন্দে কবরী রচনা করতো।[৭] ধনী গৃহিণী স্বর্ণদর্পণ[৮] ও সোনার চিরুনি[৯] ব্যবহার করতো। খোপা অলংকৃত করা

১ উষ্ণোদকে স্নান করে নিত্যানন্দ রায়। গো. বি - পৃ - ৮৭

২ চৈ. ভা - ১/৫ ; ৩ প্রভাতে খাজারি মাগে কাত্তিক গনাই—ক. ক. চ -

৪ চৈ. ভা - মধ্য - ৭

৫ আইস পরাণের সই বইস ভগিনী। মোর মাথার গোটাচারি দেখহ উকুনি॥ ক. ক. চ - পৃ - ২৩১

৬ গো. বি - পৃ - ৪৪

৭ সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বাঁধে। —ক. ক. চ - পৃ - ১৫৩

৮ ক. ক. চ - ১৫৪ ; ৯ রূপরামের ধর্মমঙ্গল - পৃ - ১০৭

হতো গুঞ্জাফলের মালা দিয়ে।[১] 'রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া'—কবিকল্পনা নয়। আউদর কেশের বর্ণনাও অনেক পাওয়া যায়। মৃগমদ কুঙ্কুম কস্তুরি ছিল সেযুগের প্রসাধনের অপরিহার্য উপকরণ। কুঙ্কুম দিয়ে অঙ্গমার্জনা করা হতো।[২] কুঙ্কুমের অভাবে ব্যবহৃত হতো পিটালি ও হরিদ্রা। আলতায় রঞ্জিল নখ',[৩] চুম্বরসে লাক্ষা রাগ না দিল অধরে।'[৪] প্রভৃতি বর্ণনাও পাওয়া যায় অনেক।

যৌবনোত্তীর্ণা রমণীগণ প্রণয়ীর মনোতুষ্টির জন্য যথাসাধ্য রূপসজ্জার প্রয়াস পেতো। তারা চাল থেকে ভোঁতা-চিরুণী (মুড়া প্রসাধনী) এনে গন্ধতৈল সহযোগে 'গুয়া মুটি' ছাঁদে খোঁপা বাঁধতো। সম্ভবত সে খোঁপা গুয়াগুটির রূপ ধারণ করতো। পরণে থাকতো 'মেঘডম্বুর' শাড়ি। লোল পয়োধর বসন দিয়ে আঁট-সাঁট করে তার উপর পরতো মোহন কাঁচুলি এবং কাঁকালে দোমাজ (উত্তরীয়) বেঁধে যুবতী সাজতো রীতিমতো। গলায় দুলতো মণিহার। অতঃপর সযত্নে কাজল ও সিন্দুরে সুশোভিত হয়ে 'মার্জনা করিয়া পরে মণিকর্ণপুরে।[৫]

কঙ্কণ, বাহুটি, গুজরা, পঁইছা[৬], বেশর, রত্নমুদ্রিকা[৭], মুদরী, পাসলী[৮], শতেশ্বরী হার[৯] ইত্যাদি ছিল রমণীর অতি-প্রিয় অলঙ্কার। ধনাঢ্য পুরুষরাও অলঙ্কারাদি ব্যবহার করতেন।[১০] শিশুদের গলায় থাকতো সোনা—বাঁধানো বাঘ নখ, কোমরে সুরঙ্গ পাটের খোপা দেওয়া কিঙ্কিণি, পায়ে নগর-মোহিণী মগড়া-খাড়ু।[১১] দরিদ্র সন্তানদের গলায় জালের কাঁঠি[১২] এবং 'করযুগে লোহার শিকলী'[১৩] শোভা পেতো।

১ বান্ধ্যাছে বিনোদচূড়া নবগুঞ্জা দিযা। —জ্ঞানদাসের পদাবলী - পৃ - ৪৮

২ ধনি মুখ পঙ্কজ কুঙ্কুমে মাজই রসহি পুলক আগরি। ২১খ, বি. ভা. পু - ১৭৬৪

৩ গো. বি - পৃ - ১৫-২৭; ৪ গো. বি - পৃ - ১৯৮

৫ ক. ক. চ - ১৭৪

৬ চৈ. ম. পৃ - ১০৩; ৭ চৈ. ভা. পৃ - ২৩৪; ৮ গো. বি - পৃ - ১৯৮

৯ গো. বি - পৃ - ১৫৬; ১০ জ্ঞানদাসের পদাবলী - পৃ ৭০-৭১

১১ চৈ. ম - পৃ - ৫৬

১২ দক্ষিণ রাঢ়ে শিশুর জালের কাঁঠী ধারণ ডাইনীর কুদর্শণের প্রতিশেধক তুক্ বিশেষ।

১৩ ক. ক. চ - পৃ - ৩৬

সোনা-রূপার গহনা ছাড়াও মণিময় (মূল্যবান প্রস্তর খচিত) অলঙ্কারের ব্যবহার সেকালে সুপ্রচলিত ছিল। মুক্তার ঝারা, হীরাধর কড়ি, মণিখচিত কুণ্ডল ছাড়াও নবগ্রহ মণিময় চাবুকি তাড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] এই নবগ্রহ মণি যথাক্রমে—হীরা, চুনি, পান্না, নীলা, প্রবাল, মুক্তা, গোমেধ, বৈদূর্যমণি এবং পদ্মরাগমণি। ষোড়শ শতকে রচিত কাব্যগ্রন্থাদিতে নবগ্রহ রত্নের বহুল উল্লেখ থেকে ধারণা হয় সেযুগে মূল্যবান রত্নাদি ব্যবহারের বিশেষ প্রচলন ছিল।

ভাস্বর-উর্মিকা (রতন-চূড়) পুরুষেরাও ব্যবহার করতো বিশেষ অনুষ্ঠানে।[২] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেকালে কবি, পণ্ডিত ও বিশিষ্ট গুণীজনদের কবিকঙ্কণ, কবিকর্ণপুর, কবিশেখর রায়মুকুট—প্রভৃতি অলঙ্কারের নামযুক্ত পদবীতে ভূষিত করা হ'তো কারণ তাঁরা ছিলেন সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ। আবার অলঙ্কারের নামে গ্রন্থনাম রাখার রেওয়াজ ছিল। যেমন—রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের 'স্মৃতি-রত্নহার'।

॥ **আহার্য** ॥ ভোজ্য সামগ্রীর বিস্তারিত ও বৈচিত্র্যময় বর্ণনায় মধ্যযুগের কবিগণ প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। আমিষ আহার্যের প্রতি অনীহাবশতঃ চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতে নিরামিষ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন দ্রব্যের তালিকা বিস্তৃততর। পক্ষান্তরে, মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমিষ আহার্যের সবিস্তার বর্ণনা লক্ষণীয়। তবে চৈতন্যদেবের অহিংসাভিত্তিক বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে বাঙ্গালী নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত হয়েছিল এ মন্তব্য যথার্থ নয়। 'মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে', 'মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল'—ইত্যাদি বর্ণনা চৈতন্যচরিত গ্রন্থে আছে। অন্যপক্ষে বৈশাখ মাসে বাঙ্গালীরা নিরামিষ ভক্ষণ করতো।[৩] সরাক জাতি কখনও মাছ-মাংস স্পর্শ করতো না। চণ্ডীমঙ্গলের কোনো কোনো পুথিতে মহামিশ্র জগন্নাথ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি গোপালের উপাসক ছিলেন এবং বহুকাল ধরে মৎস্য মাংসাহার পরিত্যাগপূর্বক গোপালের পূজা করেছিলেন—

১ গো বি - ভূ. পৃ - ১২

২ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—ম. বা. বা - পৃ - ১২

৩ বৈশাখ হৈল বিষ গো বৈশাখ হৈল বিষ। মাংস নাহি খায় সর্ব্বলোক নিরামিষ॥

ক. ক. চ - পৃ - ৬৮

কন্নড়ি অনুজজাত মহামিশ্র জগন্নাথ একভাবে পূজিল গোপাল।
বিনয়ে মাগিয়া বর জপি মন্ত্র দশাক্ষর মীন মাংস ত্যজি বহুকাল॥

তবে কি পরবর্তিকালে তিনি গোপাল উপাসনা বর্জন করে আমিষ আহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত। প্রাকৃত ছড়ায় এ সম্পর্কে প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়—'ওগ্গরা ভত্তা'। অর্থাৎ ওগ্রা নামক কোনো মোটা চালের ভাত। কিন্তু মধ্যযুগে সুগন্ধি সরু শৌখিন চালের ব্যবহারের কথা জানা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে, শুক্ল চাউল,[১] শাল্য অন্ন,[২] সঘৃত পায়স[৩] উত্তমান্ন[৪] ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ—'ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।' মধ্যযুগে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়নি; উপরন্তু তার বিপরীত চিত্রই পরিলক্ষিত হয় চৈতন্যচরিত গ্রন্থাদিতে। চৈতন্যচরিতামৃতে যে সকল খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ আছে সেগুলি যথাক্রমে—অমৃতকর্পূর, অমৃতকেলি, অমৃতগুটিকা, অমৃতমণ্ডা, অমৃতি, আদা, আমসত্তা, আমসি আম্রকাসন্দি, এলাচি, কমলা, কলা, কাঁজিবড়া, কেশুর, কুষ্মাণ্ড, ক্ষীর, ক্ষীরপুলি, খণ্ড খর্জ্জুর, খাজা, গুড়ত্বক, গুবাক, গোধূমচূর্ণ, ঘনদুগ্ধ, ঘৃত, চই-মরিচ চন্দ্রকান্তি, চাঁপাকলা, ছানাবড়া, ছুটাপান, ছোলঙ্গ, ঝাল কাশন্দি, ডালমরিচ লাড়ু, তক্র, তণ্ডুল, তাল, তৈলাম্র, দাড়িম্ব, দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধ লকলকি, দ্রাক্ষা, ধনিয়া, মৌহরির তণ্ডুল, নিম্ববার্ত্তাকী, পটোল, পানিফল, পায়স, পিঠাপানা পেড়া, পৈড়, ভাজা বার্ত্তাকী, বীজতাল, লাফরা ব্যঞ্জন, মণ্ডা, মনোহরা, মানকচু, মানচাকি, মেওয়া, মোচাঘণ্ট, মোদক, রুটি, লবঙ্গ, শালিধান্যের খই, শিখরিণী, শুখরুখা ব্যঞ্জন (চচ্চড়ি) শুণ্ঠিখণ্ড, সন্দেশ, সর, সরপূপী, সরপুরী, সরভাজা, সুখ্‌তা, সূপ, হরিবল্লভ, হুড়ুম।

চূড়ামণি দাস রাঢের খাদ্য-দ্রব্যের বর্ণনায় অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। রুটি লুচি, খিচুড়ি ছাড়াও এদেশের প্রিয় ব্যঞ্জন 'পোস্ত'র উল্লেখ আছে গৌরাঙ্গ বিজয় কাব্যে।[৫] ব্যঞ্জন প্রস্তুতের আদর্শ উপকরণ রূপে ব্যবহৃত

১ চৈ. চ - ২/১০৩; ২ চৈ. চ - অ ৬/১১০; ৩ চৈ. চ - ম - ৩/৫৩

৪ চৈ. চ - ম ৫/১০২

৫ তাহে আত মতিনাশা যে পোস্ত ভাজে। —গৌ. বি - পৃ - ৫২; কবিকঙ্কণের কাব্যে উল্লেখ আছে—পোস্ত খাবার হোলা গেল একি মনস্তাপ - ক. ক. চ - পৃ - ২৪৯

হতো—হিঙ্গ, জিরা, অগোর, কস্তুরী, কর্পূর, কুঙ্কুম (জাফরান)।[১] কটুতৈল যোগে রন্ধন এবং ঘৃতে সন্তোলনের উল্লেখ আছে কবিকঙ্কণের কাব্যে।[২] খাদ্যবস্তুকে মুখরোচক করার জন্য লবণ ব্যবহারের রীতি এদেশে দীর্ঘকালের; তবে সবদেশে সবকালে লবণ সুলভ বস্তু ছিল না। একসময় লবণ যে খুবই মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ছিল প্রাকৃতে রচিত এই কবিতা থেকে অন্ততঃ তাই প্রতীত হয়—

সের একক জই পাবউ ঘিত্তা। মংডা বীস পকাবউ নিত্তা॥
টংকু একক জউ সেধব পাআ। জো হউ রংকো সো হউ রাআ॥

এক সের ঘি যদি পাই রোজ বিশটা মণ্ডা তৈরি করি। একটাকা ওজনের (এক ভরি) সৈন্ধব (লবণ) পেলে দরিদ্রও নিজেকে রাজা বলে মনে করে। কবিকঙ্কণের কাব্য থেকে জানা যায়, সেকালে চণ্ডালরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে লবণ বিক্রয় করতো।[৩]

নকুল পোড়া, জামীরের রস সহযোগে দগ্ধ-মৎস্য ভক্ষণ, কাঁকড়া প্রধানতঃ নীচ জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। টাবা-রস মিশ্রিত মুসুর-ডাল লক্ষপতি ধনপতির পরম আদরের বস্তু ছিল। তেঁতুল পাতার উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুতের সংবাদ মেলে বৃন্দাবন দাসের কাব্যে।[৪] 'বাথুয়া' ঠনঠনি জোন্নার শাক[৫] ছাড়াও আনঝা (জলজ কচুগাছ-বিশেষ)[৬] নামক একপ্রকার অভিনব শাকের উল্লেখ পাওয়া যায় গৌরাঙ্গবিজয় কাব্যে। 'শাক্ষিঞ্চা হিলঞ্চা' শাক সেকালে ব্যবহৃত হ'তো একই সঙ্গে আহার ও ঔষধরূপে। অচ্যুত-শাক (কচু শাক) ভক্ষণে কৃষ্ণ অনুরাগের উদয় হ'তো মহাপাষণ্ডীর অন্তরে।[৭] তালফল থেকে তৈরি বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ আছে গৌরাঙ্গবিজয় কাব্যে। কবিকঙ্কণ 'বারোমেসে পাকা তালের' উল্লেখ করেছেন।[৮]

খাজারি চাল ভাজা, চিড়াভাজা, হুড়ুম, পলাকড়া (পখৌরি), ফুচ্‌কা-ইত্যাদি ছিল সেকালের সামান্য জলযোগের উপকরণ। ঘৃত, লবণ বড়ি,

১ গৌ. বি - পৃ - ১৮ ; ২ ক. ক. চ - ১৫৭—৫৮
৩ ক. ক. চ - পৃ - ৩৬০
৪ চৈ. ভা - অ/৯ ; ৫ ক. ক. চ - পৃ - ৪৩
৬ গৌ. বি - পৃ - ৭২ ; ৭ চৈ. ভা - পৃ - ২৯০ ; ৮ ক. ক. চ - পৃ - ২০৪

তণ্ডুল, মুদ্গ, দুগ্ধ দৈনন্দিন আহার্যের উপকরণরূপে বাঙ্গালী গৃহিণীর ভাণ্ডারে সর্বদা মজুত থাকতো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কিছু অভিনব খাদ্যদ্রব্যের নাম আছে। যথা—মদনকেলি, পদ্মচিনি সোমদত্তা, হংসকেলি, নয়নসুখ, মধুস্রবা, ধূপসরা, হরিবল্লভ, ঝিলিমিলি চন্দ্রকান্তি ইত্যাদি। এগুলি নিছক কবিকল্পনা নয় বলেই মনে হয়।

লাফরা ব্যঞ্জন, কাঁজি পোড়া জগন্নাথদেবের ভোগের অপরিহার্য উপকরণ; বোধহয় সেইকারণে এদেশেও উক্ত খাদ্য-পানীয় সাধারণ্যে সমাদর লাভ করেছিল। এদেশে কাঁজি বা আমানি ভদ্রেতর জাতির উত্তম পানীয় রূপে বহুলপ্রচলিত। কবিকঙ্কণের কাব্যে হরিদ্রা মিশ্রিত কাঞ্জী এবং রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে কাঁজী পোড়ার উল্লেখ আছে।

ভোজনান্তে মুখশুদ্ধিরূপে ব্যবহৃত হ'তো কর্পূর তাম্বুল, গুয়াপান। কর্মে নিযুক্তি, বরণ, নিমন্ত্রণ প্রভৃতি কর্মে গুয়া-পানের ব্যবহার হ'তো। আজও সুদূর গ্রামাঞ্চলে গুয়া-পান দিয়ে নিমন্ত্রণ করার রীতি বিশেষ প্রচলিত।

রন্ধন ছিল সেকালের গৃহিণীদের শিল্প-বিশেষ। 'রান্ধনের জুর্তি'[১] (রন্ধন-দক্ষতা) হারিয়ে যাওয়ার মতো বিপদ আর কিছুতে ছিল না। রন্ধন-ক্রিয়া এবং ভোজন সেযুগে বাঙ্গালীর ধর্মাচরণের অঙ্গ-বিশেষ রূপে বিবেচিত হ'তো। খুল্লনা রন্ধনশালায় প্রবেশ করে কর্মারম্ভের পূর্বে দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করেছেন।[২] ধনপতি-ও অন্নগ্রহণের পূর্বে বিধিমত আচমন ক'রে জনার্দন স্মরণ করেছেন।[৩]

॥ **পত্র-লিখন** ॥ পণ্ডিত ব্যক্তিরা পত্র লিখতেন সংস্কৃতে, ছন্দোবদ্ধ রীতিতে। ভাষায় থাকতো নানারকমের প্রহেলিকার কারসাজি।[৪] সাধারণ স্ত্রীলোকেরাও পত্রালাপ চালাতেন 'কপট প্রবন্ধে'।[৫] সংগুপ্ত পর্যায়ের

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বংশী খণ্ড

২ ক ক. চ - পৃ - ১৫৭ ; ৩ ক ক. চ - পৃ - ১৮০

৪ গঙ্গাদাস চক্রবর্তী পত্রখানি লিখিয়াছেন সংস্কৃত ভাষ।
…………আখরেব ছন্দবন্ধ এ বাগবিলাস ॥ —গৌ. বি - পৃ - ৬৯—৭২

৫ কপট প্রবন্ধে পত্র লেখে পদ্মাবতী—ক. ক. চ - ১৩৮ ; ভক্তিরত্নাকরে ১৪শ তরঙ্গে এই রকম কয়েকটি পত্র সংকলিত হয়েছে।

সংবাদ-সম্বলিত রাজকীয় পত্রাদিতে বিশেষভাবে মোহর দেওয়া থাকতো।[১]

॥ গমনাগমন ॥ সাধারণ-মানুষ যাতায়াত করতো পদব্রজে। দোলা ও ঘোড়ায় চড়তেন সম্পন্ন ও সুকৃতিবানরা। তাঁদের সামনে ও পিছনে থাকতো কমপক্ষে দশ-বিশজন পাইক-পেয়াদা। তবে ধনী হলেও তাঁরা দাম্ভিক ছিলেন না।[২] দোলা ছিল নানারকমের। সাহেবান দোলায় ঝালর দেওয়া ঘেরাটোপ থাকতো। চতুর্দোলা বা চৌহুলি ব্যবহৃত হতো বিবাহাদি উৎসব শোভাযাত্রায়।

খেয়া পারাপার করা হতো নৌকায়। মনুষ্যেতর জীব পার করতে পারানী লাগতো অনেক বেশী।[৩] ক্ষেত্রবিশেষে পারানী দিতে হতো বস্ত্র। সময়মতো নৌকা না পাওয়া গেলে নদী পার হবার নানা ফন্দী লোকেদের জানা থাকতো।[৪] ভারবহনের জন্য ব্যবহৃত হতো শকট। সপরিবারে দূরযাত্রা বা ভারবহনের জন্য গো-শকট ছিল প্রশস্ত যানবাহন। যাত্রাক্ষণের শুভাশুভ নির্ণয়ে 'শুভ শকুন'[৫] ছিল অত্যন্ত কার্যকরী। গমন লগ্নে হাঁচি জেঠির বাধা পড়লে 'দুঃখ পাবে বিধির বিপাকে' উছোটা. নেতের আঁচলে সিয়াকুলের কাঁটা লাগা. মাথার উপর ডোমচিল. কাঠুরিয়ার কাষ্ঠভার বহন. শুকনো ডালে বসে কাকের ডাক অর্ধখান লাউ হাতে যোগিনীর ভিক্ষা, কমঠ দর্শণ, তেলির তৈলবিক্রয়, বামে ভুজঙ্গ ও দক্ষিণে শৃগালী দর্শণে ধনপ্রাণ নাশ অনিবার্য —এই সব বিশ্বাস জনমানসে বদ্ধমূল ছিল।[৬] পশুপক্ষীর গতিবিধি[৭] এবং

১ মোহর ভাঙ্গিয়া পত্র দরবারে পড়িল। —রূপরামের ধর্মমঙ্গল - পৃ - ৭১

২ বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে। নামিয়া করেন নমস্কার ভালমতে ॥ চৈ. ভা - ৬৮

৩ দশপণ কড়ি দিয়া কুকুর পাড কৈল। চৈ. চ - ৩

৪ ঘট বুক দিয়া কেহো গঙ্গায় সাঁতারে। কেহো বা কলার গাছ বান্ধি করে ভেলা ॥ —চৈ. ভা - ১৭৬

৫ দ্র. গোপালবিজয় ভূ. পৃ - ৯১; জ্যোতির্বিদ্যার অন্যতম শাখা 'শাকুনবিদ্যা'।

৬ ক. ক. চ - পৃ - ১৯৫

৭ প্রভাত সময়ে কাক কোলাহলি আহার বাঁটিয়া খায়। বৈষ্ণবপদাবলী (ক. বি সং) পৃ - ১০০

অঙ্গস্পন্দনে শুভাশুভের পূর্ব-সংকেত পাওয়া যেতো।[১] 'প্রতি অঙ্গে হাথ দিয়া রক্ষামন্ত্র' পাঠ করা হ'তো পুত্রের মঙ্গল কামনায়। মন্ত্রের দ্বারা দশদিক বন্ধন করা হতো অমঙ্গল নিবারণের জন্য।[২]

॥ **বিনোদন** ॥ উৎসবাদিতে অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠানরূপে 'ভারথ পুরাণ' ও ভাগবত পাঠ করানোর রেওয়াজ ছিল। শাস্ত্র পণ্ডিতেরা আবৃত্তি করতেন চণ্ডীর পোথা, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে গাইতেন বেদগাথা, ভাটগণের 'রায়বার' পাঠে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হ'তো। বিবিধ বাদ্য সহকারে নাটুয়ারা নৃত্য করতো মহোল্লাসে আর 'বাজিয়া সকল নাচে নানা বাজি ধরে।'[৩]

'ললিতলবঙ্গলতা' পদ অর্থাৎ গীতগোবিন্দের শ্লোক গাওয়ার বিশেষ প্রচলন ছিল সেযুগে।[৪] চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রমুখ মহাজনগণের পদ, রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ-বল্লভ নাটক, বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ সপার্ষদ আস্বাদন ক'রে আনন্দলাভ করতেন শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং।[৫]

'শুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহাস'[৬] সত্ত্বেও সেযুগে কীর্তন গান হতো ঘটা করে। গোপাললীলায় মাধবানন্দ ঘোষের 'দানখণ্ড' গান না হলে আসর জমতো না।[৭] মৃদঙ্গ মন্দিরা ছিল কীর্তনের অপরিহার্য বাদ্যবিশেষ।[৮] তবে দুর্গা-পূজাতেও সেকালে মন্দিরা-মৃদঙ্গ ধ্বনিত হতো ঘরে ঘরে।[৯]

১ হেনকালে বামচক্ষু নাচিতে লাগিল। নবদ্বীপচন্দ্র লক্ষ্মী সমুখে দেখিল। চৈ. ম - পৃ - ৪০
বামবাহু স্ফুরে তার স্ফুরে বাম আঁখি
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি॥ —ক ক. চ - পৃ - ৬৩ ; এছাড়া, মুখ হৈতে খসে পান, কপালে টনক পড়ে, অলক ধুতি নাহি উড়ে, খাইতে দন্তে বাজে জিহ্বে, গমনে উছট বাজে, ভোজনে বিষম খাই, কাল পেঁচা ডাকযে সম্মুখে। (ক. ক. চ - পৃ - ২৫৬) —প্রভৃতি লক্ষণ অমঙ্গলসূচক বিবেচিত হতো।

২ মন্ত্র পড়ি ঘর কেহো চারিদিগ বেড়ে। নানা মন্ত্রে দশদিগ কেহো বন্ধ করে॥
চৈ. ভা - পৃ - ১৮

৩ গো. বি - পৃ - ৭৩

৪ চৈ. চ - পৃ - ৩৪৫ ; ৫ চৈ. চ - ৩৭৯

৬ চৈ. ভা - পৃ - ৫২

৭ দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ। শুনিয়া অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ। চৈ. ভা অ/৫
সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্তনে তৎপর। হেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥ চৈ. ভা অ/৫

৮ চৈ. ভা - পৃ - ১৬৯ ; ৯ চৈ. ভা - পৃ - ১৫

সেকালের আদর্শ কীর্তনীয়ার পূর্ণ আলেখ্য পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায়। তাদের মাথায় থাকতো পট্টবাসের পাগড়ী, বহুবিধ মালায় পাগড়ী সুশোভিত থাকতো। গলায় মণিমুক্তা ও স্বর্ণহার কানে মুক্তার দুল, হাতে সোনার অঙ্গদ বলয়, গোরোচনা চন্দন লেপিত অঙ্গ, দশ আঙুলে সুবর্ণ মুদ্রিকা পরণে থাকতো পরম বিচিত্র শুক্ল, নীল, পীত বর্ণের পট্টবাস, হাতে থাকতো বেত্র বংশী ছড়িকা।[১] 'চামর বিচ্ছন্দে' চৈতন্যমঙ্গল গান করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল সেযুগে।[২] এযুগে মনসামঙ্গল গায়কদের হাতে চামর থাকে।

কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী অবলম্বনে কৃষ্ণযাত্রা অনুষ্ঠিত হ'তো সাড়ম্বরে।[৩] এই উপলক্ষে 'কাচ-সজ্জ' করা হ'তো। শঙ্খ, কাঁচুলি, পাটশাড়ী ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে 'রুক্মিণীর কাচ' করতেন গদাধর-প্রভু। বড়াই-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন নিত্যানন্দ-প্রভু। 'মহাদুই গোঁফ করি বদন বিলাস' এবং মাথায় মহাপাগ ও ধটী পরিধান ক'রে ভ্রূকুটি করে নৃত্য করতেন শান্তিপুর নাথ—অদ্বৈতপ্রভু। আর নাম-ভূমিকায় অভিনয় করতেন চৈতন্যদেব নিজে এবং তিনিই ছিলেন মঞ্চ-নির্দেশক।[৪]

মঞ্চে কৌতুক-নক্সা পরিবেশিত হতো সম্ভবতঃ মূল পালা আরম্ভের পূর্বে।[৫] বিচিত্র কাচে নারদ ও বড়াই সেজে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শণ করে দর্শক-সাধারণের মনোরঞ্জন করা হতো।[৬] এই জাতীয় নাট্যাভিনয় সেকালে সমাজে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ছোটো ছেলেরাও নারদ সেজে নিজেদের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পেতো।[৭]

এই ধারার প্রাক্‌রূপ লক্ষ্য করা যায় বড়ু-চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'। কাব্যের প্রারম্ভে—পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ। বামন শরীর মাকড় বেশ॥ নাচএ নারদ ভেকের গতী। .... নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।

১ চৈ. ভা - পৃ - ৩১০

২ চৈ. ম - পৃ - ৩

৩ শ্রীঅদ্বৈত কহে মিশ্র দিয়া ত মন। কৃষ্ণজন্ম যাত্রা আজি কর। গৌ. বি - পৃ - ২৭

৪ চৈ. ভা - ১৮৮-৮৯ ; ৫ প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ—চৈ. ভা পৃ - ১৯১

৬ কাধে নড়ি কাঁকে ডালি নেত পরিধান। চৈ. ভা. পৃ - ১৯১

৭ কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া। —চৈ. ভা. পৃ - ১৯১

তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ । লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে ।। ……
…… … মেলে ঘন ঘন জীহের আগ । রাআ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ ।।[১]
—এইভাবে নারদের প্যারডি চরিত্র দ্বারা কৌতুক পরিবেশনের বর্ণনা আছে। আলোচ্য শতাব্দেও উক্ত ধারার পরম্পরাগত অনুসরণ লক্ষণীয় । তবে শ্রীচৈতন্যদেব অধ্যাত্মব্যঞ্জনা আরোপ ক'রে কৃষ্ণলীলা কীর্তনের মানোন্নয়ণ করেন ।

এদেশে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন । শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধরবসু পণ্ডিতের মুখে কথকতা বা আবৃত্তি শুনেছিলেন । তা'হলে পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে ভাগবতগ্রন্থের প্রচার এদেশে বেশ ভালো ভাবেই হয়েছিল । ষোড়শ শতকে ভাগবত গ্রন্থের কথকতা শ্রবণ কেবলমাত্র পুণ্যার্জন নয়, আনন্দলাভের বিষয় হয়েছিল ।[২] কৃষ্ণলীলার পাশাপাশি চৈতন্যমঙ্গল গান সেযুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থখানি এই উদ্দেশ্যে এই ধারায় রচিত কাব্য । সচিত্র চৈতন্যমঙ্গল গীতের প্রচলন হয় আরও পরবর্তিকালে । বিশ্বভারতী সংগ্রহের একটি পুথির[৩] পুষ্পিকায় লিপিকরের স্বীকারোক্তি—'চৈতন্যমঙ্গলের ছবিতে গান করি' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ।

॥ **যৌথপরিবার ভিত্তিক জীবনযাত্রা** ॥ ক্ষেত্রবিশেষে শাশুড়ী, ননদী সত্য-বিহীন স্বামী-স্ত্রীর একক পরিবারের উল্লেখ থাকলেও সাধারণভাবে কবিকঙ্কণের কাব্যে 'নয় পুত্র ছয় নাতি আঠার ভাগিনা' পরিবৃত বৃহৎ যৌথ পরিবারের চিত্র প্রোজ্জ্বল । 'দুই মাগু, চারিশালা, চারিপুত্র, বহিনী, শাশুড়ী, ছয় জামাই-বেটীর'[৪] সমাগমে ভাঁড়ুদত্তের গৃহাঙ্গণ বারোমাস পরিপূর্ণ । সম্পন্ন গৃহস্থেরা চাকর-বাকর' রাখতো ।[৫] স্বজনপোষণ না করা সেযুগে ছিল

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : জন্মখণ্ড - পৃ - ১
২ কহেত কৃষ্ণের কথা মেলি ভাগবত পোথা সবে শুনে পবানন্দ সঙ্গে। গৌ. বি - পৃ - ৩৮
৩ বি ভা পুঁ - ৫৮৩৩
৪ ক ক. চ - পৃ - ৮৫
৫ 'চাকর বাকর' শব্দ উচ্চ করি বোলে । চৈ. ভা - পৃ - ১২৬ ; মতান্তরে, এই ছত্রের শুদ্ধ পাঠ - 'চ'-কার 'ব'-কার শব্দ উচ্চ করি বোলে। 'চ' কার 'ব' কার অশ্লীল শব্দ ।

ঘৃণার বিষয়।[১] তবু অবাঞ্ছিত আত্মীয়-স্বজনভারে পীড়িত গৃহস্বামীর কণ্ঠে কখনও কখনও খেদোক্তি উচ্চারিত হ'তো—'জামাতা ভাগিনা জন আপনার নয়।'[২] অন্যদিকে চৌকস-গৃহিণী অবস্থা বে-গতিক বুঝে ভাণ্ডারে কুলুপ এঁটে রাখতেন।[৩] কন্দর্প, উজাল, সাঁপুড়া, ডাবর, ঝারী, থাল, দুগ্ধ-ঘৃত-বাটী, স্নানের বিপুল লোটা, চন্দন-আধটী[৪] প্রভৃতি গৃহস্থালির তৈজস-পত্রাদিতে পরিপূর্ণ থাকতো ভাণ্ডারগৃহ। সুবর্ণ থালী[৫] সুবর্ণ গাড়ুয়া ছিল তাদের অতি আদরের বস্তু।

আম্মের ডরে পালাইঞা তেতলি তলে বাসে, 'নালা কুড়ি ঘর মাঝে কে আনিব পানি', 'করের কঙ্কণে নেহালি দর্পণে বিমল কুলের কালি',—এই সব প্রবাদ-প্রবচন দর্জাল গৃহিণীদের মুখে মুখে ফিরত।[৬] অন্যদিকে 'সতীজনের পতি নারায়ণ সমতুল। পরের পুরুষ যেন শিমূলের ফুল'[৭] প্রভৃতি আপ্তবাক্য সেযুগের সমাজে রক্ষামন্ত্রের কাজ করেছিল। সম্ভবতঃ উপরোক্ত আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী মুরারী-গৃহিণী পতি-দেবতার সমূহ অমঙ্গল নিবারণার্থে নির্ভেজাল অলীক কাহিনীর অবতারণা করতে পেরেছিলেন অবলীলাক্রমে।

তাদের অবসর-সময় কাটতো প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দুঃখ-সুখের খোশ-গল্পে। স্বামী-সোহাগ অর্জনের বিবিধ তুক্-তাকের গোপন খবর পরস্পর জেনে নেবার এই তো উপযুক্ত সময়।

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতো। ঝিল্লিঝংকৃত গোধূলি-প্রকৃতির আলো-অন্ধকারে পল্লী-বাঙ্‌লার শান্ত গৃহাঙ্গণ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো ঘৃত প্রদীপের মৃদু আলোয়।[৮] ধনী-গৃহিণী শয়ন করতো 'পাটের সরেস মশারী'-

১ কর্জনার হরি লা নাহি পোষে বাপ মা প্রভাতে না করি তার নাম। ক. ক. চ - পৃ - ১১

২ ক. ক. চ - পৃ - ২৮৮ ; ৩ গৌ. বি - পৃ - ১০৭

৪ গৌ. বি - পৃ - ৬৬ ; ৫ চৈ. ভা - পৃ - ২০৭

৬ চৈ. চ - পৃ - ১৩০

৭ 'অপ্রকাশিত পদসংগ্রহে' সংকলিত লোচনদাসের ভণিতায় শতাধিক পদের অধিকাংশ পদে সেকালের মেয়েলি কথ্য ভাষার (Women-dialect) যথার্থ পরিচয় বিধৃত আছে।

৮ ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর। চৈ. ভা - পৃ - ২১৯

পরিবৃত সুদৃশ্য পালঙ্কে ।[১] তাদের ঘুম পাড়ানি গানের[২] সুরের নেশায় দুরন্ত শিশুদেরও চোখের পাতা ভারী হয়ে আসতো। আর 'অভাগী ফুল্লরার' দল মশার উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য ধূলিধূসরিত জীর্ণ খোসলায় আপাদমস্তক আবৃত ক'রে নিজেদের চরম দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করতো বার বার। বাইরে খোল-করতালের মৃদু গুঞ্জনে একতারার সুরলহরীর ঐকতানে ক্ষণেকের জন্য মুখরিত হয়ে উঠতো গ্রাম-বৈরাগীর আখরার আঙ্গিণা। এমনি করে একটি দিন অতিবাহিত হতো বাঙলার গ্রামগুলিতে। নগরে তখনো চলতো ধনাঢ্যের আয়োজিত উৎসবানন্দের উদ্দাম সমারোহ, সূর্যালোকের চেয়ে উজ্জ্বলতর 'রসদীপকের' আলোর রোশনাই।[৩]

॥ ব্যাধি ও প্রতিকার ॥

সেকালে সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের সাধারণ মানসিক গঠন অনুযায়ী ব্যাধি ও উৎপাতকে—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

আধিভৌতিক উৎপাতে সর্বকালের সর্বদেশের সমাজের মানুষ সমানভাবে বিব্রত। 'বায়ু বিকার',[৪] 'কফ উৰ্দ্ধশ্বাসে রক্তস্রাব',[৫] 'পিত্ত ও জ্বর পিত্তরোগে তিক্ত আস্বাদ[৬], অজীর্ণ[৭], ঘা[৮], কুষ্ঠ[৯], কোয়া জ্বর, ভাদ্রমাসের পাকই, গোদ, বধিরতা[১০] ইত্যাদি তো ছিলই, তাছাড়া মূর্চ্ছা[১১], দানব অধিষ্ঠান[১২], ডাকিনীর কাম[১৩], উন্মাদ[১৪]—ইত্যাদি মানসিক ব্যাধির সংবাদ-ও পাওয়া যায় প্রচুর।

১ গো. বি - ৬৬, ক. ক. চ - পৃ - ২৮৬ ; ২ ক. ক. চ - ২১১-১২, চৈ. ম - পৃ - ১৯

৩ রসদীপক জ্বলিল দিবস হৈতে আলা। —রূপরামের ধর্মমঙ্গল - পৃ - ১০৬

৪ চৈ. ভা - পৃ - ৫৬ ; ৫ চৈ. ভা. পৃ - ২৫৫

৬ মনসাবিজয় পৃ - ২৭, গোপালবিজয় - পৃ - ৩২১ ; ৭ চৈ. ভা - পৃ - ৪৮ ;

৮ মনসাবিজয় - পৃ - ১০৮-১০ ; ৯ চৈ. ভা - পৃ - ২০৩

১০ ক. ক চ - পৃ - ২১৯ ১১ চৈ. ভা - পৃ - ৩

১২ চৈ ভা - পৃ - ৫৬ ; ১৩ চৈ. ভা - ৫৬ ; ১৪ চৈ. ভা - ১০৭

এই সকল ব্যাধি প্রতিকারের নানাবিধ উপায় প্রচলিত ছিল। ক্ষত বা ঘায়ে 'সাপি-বিসাপি সহ সমুদ্রের ফেনা'[১] প্রলেপ দিয়ে ফল পাওয়া যেতো। ডাব-নারিকেলের জলপান, শিবাঘৃত প্রয়োগ, শিরে পাক তৈল দিয়া উত্তমরূপে স্নান বায়ুরোগের মহৌষধ রূপে বর্ণিত হয়েছে।[২] 'হরিদ্রা দেখায় চাঁদো করিয়া মন্ত্রণা। ইহাতে খণ্ডয়ে জত ব্যাধির বেদনা'[৩]—এইরকম বিশ্বাসও সমাজে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসের পরম্পরারূপে সারা বৎসর নীরোগ থাকার আশায় দুর্গাপূজার নবপত্রিকা বিসর্জনের প্রাক্কালে নব-পত্রিকার অন্যতম গাছ-হলুদ ভক্ষণ করার প্রথা আছে এদেশে।

সেযুগে ভেষজ-গুণযুক্ত গাছ-গাছড়া প্রয়োগেই রোগী ব্যাধিমুক্ত হ'তো। স্বয়ং মহাপ্রভু 'লতা পাতা দিয়ে রোগী দড় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বৈদ্যনন্দন মুরারি গুপ্তকে।[৪] আবার, মহৌষধিতরু-জাত মহা ঔষধের বড়ি' অঙ্গে পড়ে দিয়ে রোগমুক্ত করা হতো সময়বিশেষে। বিপ্রপাদোদক ছিল সেযুগে জ্বর রোগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক।[৫] শুধু তাই নয় 'সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক পানে'[৬]—এইরকম বিশ্বাসও সাধারণে প্রচলিত ছিল।

বৈষ্ণবনিন্দার ফলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হওয়া এবং বৈষ্ণবের চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে বৈষ্ণব প্রসাদে ব্যাধিমুক্তির চমকপ্রদ সংবাদ মেলে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে।[৭] বাঙ্গালাদেশের সুদূর গ্রামাঞ্চলে অদ্যাবধি ব্যাধিমুক্তির এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

অপদেবতার অশুভ অধিষ্ঠান থেকে মুক্তিলাভের জন্য ওঝা গুণিনদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ভূত, প্রেত, ডাকিনী বিতাড়নে তাঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত।[৮] ভূত-বিতাড়ণ-পদ্ধতির বর্ণনাও পাওয়া যায়— 'আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে। মন্ত্র পড়ি হস্ত দিল তাহার মাথাতে॥ তিন চাপড় মারি বলে ভূত পালাইল।'[৯] তবে সব অপদেবতা বোধহয় এত

১ মনসাবিজয় - পৃ - ১০৮

২ চৈ. ভা - পৃ - ১০৭ ; ৩ মনসাবিজয় - পৃ - ১৪৩

৪ চৈ. ভা - ৪৮

৫ চৈ. ভা - পৃ - ৮৮ ; ৬ চৈ. ভা - পৃ - ৮৮

৭ চৈ ভা - পৃ - ২৯৩

৮ চৈ. চ—পৃ - ৩২৪ ; ৯ চৈ. চ - পৃ - ৩২৫

সহজে বিদায় নিতেন না ; মন্ত্রতন্ত্রাদির প্রাচীন পুথি-পত্রে বর্ণিত এতদ্‌বিষয়ক বিভিন্ন জটিল কৃত্যাদির বর্ণনা থেকে অন্ততঃ সেইরকম ধারণা জন্মে ।

গাছ-গাছড়া-জাত ঔষধ-পত্রাদি ছাড়াও মন্ত্রতন্ত্র, তুক্‌-তাক, জলপড়া প্রভৃতির প্রভাবও কম ছিল না । পেট-বেদনা, অম্বল, শূল-বেদনা, সর্প-বৃশ্চিকাদি দংশন সাধারণতঃ মন্ত্রেই আরোগ্য হতো । সুপ্রসবের ব্যাপারে মন্ত্রপূত জল ছিল সবিশেষ ফলপ্রদ ।[১] অবস্থাবিশেষে দেবস্থানে ধর্ণা দিয়েও অনেক সময় ব্যাধিমুক্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় । রূপরামের কাব্যের দিগ্‌বন্দনা থেকে জানা যায়, সেকালের বন্ধ্যা-নারীরা সন্তান কামনায় কামারহাটী গ্রামের পঞ্চানন্দ ঠাকুরের [দেওয়া] ঔষধ খেতে যেতেন । প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতে, মানব-দেহস্থিত বায়ু পিত্ত কফ—এই ত্রিবিধ উপাদানের বিকারে যাবতীয় ব্যাধির সৃষ্টি । কফজাত ব্যাধির মহৌষধ ছিল পিপ্পলিখণ্ড ; তবে সময়বিশেষে হিতে বিপরীত হতো ।[২] এই রকম চিকিৎসা-সংকটের একটি দৃষ্টান্ত পাই কবিকঙ্কণের কাব্যে—

কার দেখি সাধ্য রোগ ঔষধ করয়ে যোগ, বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায় ।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ নানা ছলে করয়ে বিদায় ॥
কর্পূর পাঁচন করি তবে জীয়াইতে পারি কর্পূরের করহ সন্ধান ।
রোগী সবিনয় বলে কর্পূর আনিতে চলে সেই পথে বৈদ্যের পয়ান ॥[৩]

শল্য চিকিৎসার বর্ণনাও পাওয়া যায়— ছোলঙ্গে পিলীহা কাটে ··ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা ।[৪] তবে এসব চিকিৎসার ফল অধিকাংশক্ষেত্রে খারাপ হ'তো : তাই সুযোগ বুঝে অগ্রদানী ব্রাহ্মণরা বৈদ্যদের পাশে পাশে ঘুরতো ।[৫]

আধিদৈবিক উৎপাত-ও সেযুগে ছিল প্রকৃতিভেদে বিবিধ প্রকার । অনাবৃষ্টিতে ধান উৎপন্ন না হওয়া, ডাকা চুরি, গোবধ, ব্রহ্মবধ, গুরুপত্নীহরণ, গৃহদাহ, বুকে বাঁশ দিয়া পরস্ব-অপহরণ, ব্রাহ্মণ হইয়া চণ্ডাল আচার, গর্ভবতীর গর্ভনষ্ট, শিলাপটে আছাড়িয়া শিশুহত্যা, গলে ফাঁস দিয়া হত্যা, দেবস্ব-ব্রহ্মস্ব অপহরণ, জুয়াখেলা এই পর্যায়ে পড়ে ।

১ ক ক. চ - পৃ - ৭৫

২ কবিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে । উলটিয়া আরো কফ বাঢ়িল দেহেতে ॥ —চৈ. ভা - পৃ - ৩৬

৩ ক. ক. চ - ৮৮

৪ ক. ক. চ - পৃ - ১০ ; ৫ ক ক. চ - পৃ - ৮৮

এছাড়া, মুসলমান কর্তৃক জাতিনাশ, 'হিন্দুআনির' প্রতি অসহিষ্ণুতা. বশতঃ কীর্তনবন্ধের আদেশজারি, নাম-সংকীর্তনের দলের উপর অতর্কিত আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা সমাজে রীতিমতো আতঙ্কের সঞ্চার করেছিল।

অনাবৃষ্টি হলে 'দেবে হরিলেক বৃষ্টি বলে নিশ্চিন্ত থাকা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না; অন্যান্য উৎপাতেও জনগণ প্রায়ই নিশ্চেষ্ট থাকতো। কারণ আধিভৌতিক বাহুবল অপেক্ষা আধিদৈবিক মন্ত্রবলের উপর ক্রমবর্ধমান আস্থা জনমানসে জড়তার মোহ বিস্তার করেছিল। তাছাড়া, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল[১]; তাই তাদের প্রাণভরা সান্ত্বনা ছিল— যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে। তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে॥[২]

পূর্বে বলা হয়েছে, হিন্দুদের পক্ষে জাতিনাশ ছিল বড়-রকমের শাস্তি। প্রাণদণ্ডের পরেই ছিল তার স্থান। একসময়ে হরিনাম সংকীর্তন করলেও এই শাস্তি ভোগ করতে হতো।[৩] জাতিনাশ করার পদ্ধতি ছিল

১ চি. প. স - পৃ - ৬২-৬৪; চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত একটি সশস্ত্র ডাকাতি কাহিনীর মিলনাত্মক পরিণতি ঘটানো হয়েছে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নামমন্ত্রের প্রভাবে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই রকম—

নিত্যানন্দ প্রভু, স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীচৈতন্যদেবের অঙ্গে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার দেখে 'দস্যু ব্রাহ্মণের হরিতে হইল মন।' তারা গভীর রাত্রে একত্রিত হ'যে ঢাল, খাঁড়া, ছুরি, ত্রিশূল প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এঁদের ঘরে হানা দিল। পথিমধ্যে দস্যু দলের মতিভ্রম হ'লো। তারা গঙ্গাস্নানপূর্বক কৃষ্ণ ভজনায় রত হলো। কিন্তু চোর সহজে ধর্মের কাহিনী মানে না। তারা পরক্ষণেই বুঝতে পারলো 'বিনি চণ্ডীপূজায়' যাত্রা করার দরুণ এই অঘটন। তাই পরদিন তারা যুক্তি করে স্থির করলো—'চল সভে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া' এবং 'মদ্যমাংস দিয়া সবে করিল পূজন।' তারপর নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে —'বীরছাঁদে নীলবস্ত্র' পরিধান ক'রে মহানিশায় উক্ত দুই প্রভু ও স্বয়ং মহাপ্রভুর গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে দেখলো পাইক-প্রহরী চতুর্দিকে বাড়ী পাহাড়া দিচ্ছে। প্রহরীরা সশস্ত্র কিন্তু 'নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ।' এবং সবার গলায় মালা ও সর্বাঙ্গে চন্দন লিপ্ত। ডাকাতি ছেড়ে দস্যুদল হরিভক্ত প্রহরীদের দলভুক্ত হ'লো।—চৈ ভা - পৃ - ৫১২

২ চৈ. ভা - পৃ - ১২৫

৩ আর যদি কীর্তন করিতে লাগি পাইমু। সর্বস্ব দাণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু চৈ. - ভ - ৩১১

বহুবিধ। বেগম সাহেবার নির্বন্ধাতিশয্যে হুসেন-শা প্রাক্তন-প্রভু সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশ করেছিলেন 'করোয়ার পানি' মুখে ঢেলে দিয়ে।[১] হিন্দুর মুখে নিষ্ঠি নিক্ষেপ ক'রে মুসলমান করার উল্লেখ আছে।[২] অমেধ্যভক্ষ্য মাংস ঘরে রান্না করে ভক্ষণের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।[৩]

এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল হয় 'ভৃগুপাত' নয় গলিত সীসা পান কিংবা তপ্ত ঘৃত পান ক'রে প্রাণত্যাগ।[৪] বিধান দিতেন প্রধানতঃ স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণ। 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' গ্রন্থে 'প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা' বা ভাষপ্রকরণে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে।[৫] সর্বকালের সর্বসমাজে চিরকালই পাপকর্ম সম্পন্ন হতো এবং তার বিচার-ব্যবস্থাও ছিল বিবিধ প্রকার। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। বর্তমান **Indian Penal code**-এ যেমন **Assult, hurt, grievous hurt** ইত্যাদি অপরাধের সূক্ষ্ম ভাগ-বিভাগ দেখা যায়; প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার এবং বঙ্গীয় নিবন্ধকগণও সেইরূপ অপরাধের লঘুগুরু মাত্রানির্দেশ করেছেন।

আলোচ্য শতাব্দীতে যেসকল প্রায়শ্চিত্ত-বিধি সমকালীন সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে সেগুলি তিনটি ধারায় ভাগ করা যায় (১) রাজনৈতিক (২) সামাজিক (৩) আধিদৈবিক।

যবন হয়ে হিন্দুয়ানি' আচারজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতো প্রাণদণ্ডে।[৬] প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'তো শূলে চড়িয়ে। যুদ্ধাদি সংকটকালে দেশের সীমান্ত অঞ্চলে রাজারা ত্রিশূল প্রোথিত করে রাখতেন। বিনা অনুমতিতে সীমান্ত অতিক্রমেচ্ছু পথিকদের শূলে চড়ানো হতো বিনা কৈফিয়তে।[৭] সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে দুষ্কৃতকারীরা নিস্তার পেতো না।[৮]

১ বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য—চৈ. চ মধ্য - ২৫/১৮৬

২ চি প. স - পৃ - ৮৫ ; ৩ চৈ. চ - পৃ - ৭৯

৪ চৈ. চ. মধ্য - ১৮৮ ; ৫ চি. প. স - পৃ - ২৫৮—৯৮

৬ চৈ. ভা - পৃ ৮১

৭ চৈ. ভা - ৮১

৮ আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে। রাজকর দণ্ডী হয়ে ত্রিশূল সে পরে দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বত্থ যে কাটে। ত্রিশূলে চড়াই তাহে নবদ্বীপের হাটে॥ চৈ .ম - পৃ - ১১-১২

লঘুপাপে গুরুদণ্ড-ও দেওয়া হতো। কাজীরা বিচারের নামে অবিচার করতেন। সমাজে তার প্রতিক্রিয়াও যে না হতো এমন নয়। আমুয়া মুলুকের কাজী একবার অভ্যাসবশে চৈতন্যদেবের সংকীর্তন বন্ধের নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিপদে পড়েছিলেন।[১] অবশেষে কাজী নগরে ঘোষণা দিলেন—যেখানে যেভাবে খুশী নির্ভয়ে শাস্ত্র চর্চা করুন, সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন, ইচ্ছা হলে বিরলে থাকুন, কাজী বা কোতোয়াল তার বিরুদ্ধাচারণ করলে গর্দ্দান যাবে।[২]

কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে বিচার ব্যবস্থার যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি আলোচ্য শতাব্দীতে কার্যকরী ছিল কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না তবে অধিকাংশ ব্যবস্থায় রূপকথার আমেজ আছে।

কলিঙ্গ রাজার সভায় কালকেতুর স্পষ্টবাদিতা ঔদ্ধত্যরূপে বিবেচিত হয়েছে এবং তার শাস্তি ঘোষিত হয়েছে—'অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজতলে। এমন বচন যেন কভু নাহি বলে॥' পাত্রমিত্র-অমাত্যদের নির্বন্ধাতিশয্যে মৃত্যুদণ্ড মকুব হলো—সভার বচনে রাজা না বধিল বীরে। বন্দী করি থুতে আজ্ঞা দিল কারাগারে॥' কারাগৃহ অন্ধকার, ভিতরে ভুঁষের ধোঁয়া। কালকেতুর 'হাথে বাঘহাতা দিল গলায় জিঞ্জিরে।' আর 'বুকে তুলি দিল দশ সাঙ্গের পাথর।'[৩]

প্রতারণার অপরাধে ভণ্ড ভাঁড়ুদত্তের শাস্তি দেওয়া হয়েছে অভিনব পদ্ধতিতে—'মুণ্ডায়া ভাড়ুর মুণ্ড অভক্ষে পূরিয়া তুণ্ড দুই গালে দেহ কালি চূণ।' বকেয়া খাজনা অনাদায়ের শাস্তি দেওয়া হয়েছে অনুরূপ পদ্ধতিতে; উপরন্তু ঘোড়ার প্রস্রাবে 'মস্তক' ভিজিয়ে ভোঁতা ক্ষুর দিয়ে মস্তক মুণ্ডণ করা হয়েছে এবং 'নাক মোচে ধরি তার উপাড়য়ে দাড়ি' ফলে 'বসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার' তার উপর 'পুরের কোটাল' ভাড়ুর শিরে ঢালে ঘোল।' পিছনে ঢোল বাজে; আর বাজনার তালে তালে 'হাততালি দেয় যত নাগরা ছাওয়াল।'[৪]

১ চৈ. ভা - পৃ - ২১৬

২ চৈ. ভা - ২৮৪

৩ ক. ক. চ - পৃ - ১০২; ৪ ক. ক.চ - পৃ - ১০৯

'কর্ণ নাসা কেশ ছেদ' ক'রে শাস্তিদানের বর্ণনাও পাওয়া যায়।[১] ধৃতি খাওয়ার শাস্তি ছিল নিগড় বন্ধন।[২]

সামাজিক বিচার-ব্যবস্থা ছিল বিবিধ প্রকার। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত সমবেত বণিক-মণ্ডলীর মধ্যে প্রথম বিবাদ বাধে মালা চন্দন দান প্রসঙ্গে। ক্রমে সে বিবাদ ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষগণের চরিত্র হননের রূপ ধারণ করে। সভাস্থ মাতব্বরেরা প্রস্তাব করে—

রাম সনে রুজু কৈল সাধু ধনপতি। বনে ছেলি লয়ে যার ভ্রমিল যুবতী॥
সেই বনে কানু ভানু শতকে মাতাল। সেই বনে জায়া তোমার ছেলির রাখাল॥
দোষ গুণ তার না করিয়া বিচারণ। খুল্লনা রান্ধিলে দেখি কে করে ভোজন॥
খুল্লনা পরীক্ষা দেক যদি বটে সতী। তবে নিমন্ত্রণে সবে দিব অনুমতি॥[৩]

পরীক্ষা না দিলে দিবে এক লক্ষ তঙ্কা' জরিমানা।[৪] বণিকগৃহিণী খুল্লনা রাজী হলেন পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষাসভায় শতপণ্ডিত একমত হয়ে প্রথমে জল পরীক্ষা গ্রহণ করলেন। কিন্তু জল পরীক্ষায় ফাঁকি চলে। সেইজন্য বিষধর সাপের মুখে খুল্লনাকে স্থাপন করা হলো। কিন্তু সাপকেও বশ মানানো যায় মন্ত্রে। তাই লোহার শাবল উত্তপ্ত করে খুল্লনার হাতে দেওয়া হলো;

১ নাক চুল কাটিয়া করিব অপমান। —মনসাবিজয় - পৃ - ৬৬

কোন দোষে আমার করিল অপমান। দোষ দেখি মোর যদি কাটে নাক কান॥

ক. ক. চ - পৃ - ১৪০

শাস্তিদানের এই রীতি সুপ্রাচীন ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত। প্রসঙ্গতঃ রামায়ণে সূর্পনখার কর্ণ নাসাচ্ছেদের কাহিনী স্মরণীয়।

২ ক. ক. চ - পৃ - ৯২

৩ ক. ক. চ - পৃ - ১৭৮

৪ কুলত্যাগিনী ভ্রষ্টা রমণীর 'সমাজে' অর্থ জরিমানা দিয়ে জাতে ওঠার রীতি এদেশে নীচ জাতির মধ্যে বহুল-প্রচলিত।

খুল্লনা উত্তপ্ত শাবল ধারণ করে সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সগৌরবে।[১] কিন্তু এতেও বণিকসভা সন্তুষ্ট হলো না। পণ্ডিতের নির্দেশমতো উত্তপ্ত ঘৃতে 'অঙ্গুরী আরোপ করি তুলিল সভার বিদ্যমান।' অতঃপর তুলা পরীক্ষা। সবশেষে জ্বলন্ত জতুগৃহ বা জোঘর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'খুল্লনা 'দাণ্ডালা গিয়া জ্ঞাতি বিদ্যমানে।' এবার বণিক সমাজ সন্তুষ্ট হয়ে 'রন্ধন করিতে আজ্ঞা দিল সদাগরে।'[২]

আধিদৈবিক-প্রতিকার বোধহয় সর্বকালেব সমাজে একই প্রকার। গীতায় উক্ত হয়েছে—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮।৪

এই মহামন্ত্রের অনুসরণে জয়ানন্দ বলেছেন যে দুষ্কৃতকারী গোবধ ব্রহ্মবধ, মদ্যপান, গুরুপত্নীহরণ দেবস্ব ব্রহ্মস্ব, স্বর্ণ অপহরণ, গৃহদাহ করে 'তারে আমি প্রহার করিব নিরন্তর।' পক্ষান্তরে, 'সুকৃতিমান সর্বপাপে মুক্ত সেই বৈকুণ্ঠেতে চলে।'[৩] এই বিশ্বাসেব প্রতি অবিচল আস্থার অবশ্যম্ভাবী পবিণতি লক্ষ্য কবা যায়—'যে মতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে। তাহা বই আর কেহো কবিতে না পাবে।' এই প্রাণভরা সান্ত্বনাবাণীতে।

১ ক. ক. চ - পৃ ১৮১-৮২; সমাজে এই সব নিয়ম প্রচলিত ছিল বলে নানারকম তুকতাকের উদ্ভব হযেছিল পববর্তিকালে। রবিবারে পুষ্যা নক্ষত্রে তুলিয়া আকন্দের মূল হস্তে থুইলে শাস্ত্রে না বেন্ধে। বেঙ্গের তৈল মাখিয়া জোখের গুড়ি হাথে মাখিলে অগ্নিতে হাথ পোড়ে না। ইত্যাদি। —চি. প স - পৃ - ২৭৮

২ ক. ক. চ - পৃ - ১৮৭; ৩ চৈ. ম - পৃ - ১৩৫

॥ শিক্ষা-প্রকরণ ॥

আমাদের সমীক্ষিত যুগে চৌষট্টি কলার মতো বিদ্যাও ছিল চৌষট্টি প্রকার।[১] বিপ্রদাসের কাব্যে বর্ণিত 'লখীন্দরের বিদ্যারম্ভ', কবিকঙ্কণ-উল্লিখিত শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ এবং রূপরাম-প্রদত্ত 'আত্মকাহিনী' অংশ থেকে সে যুগে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের একখানি সম্ভাব্য পূর্ণাঙ্গ-তালিকা পাওয়া যায়।

'রামখড়ি' দিয়ে চৌত্রিশ অক্ষর 'কাঠনেতে লেখি' অক্ষর-পরিচয় পর্বের সূচনা হতো।[২] অষ্টশব্দি আঠার-ফলা, চৌত্রিশ অক্ষরের ফলা, আঙ্ক-আঙ্ক[৩] প্রভৃতির অনুশীলন হতো দ্বিতীয় পর্যায়ে।

পরবর্তিস্তরে ব্যাকরণ, অভিধান পাঠের রীতি ছিল। ব্যাকরণের মধ্যে 'কাব্যপ্রকাশ' (মম্মটভট্ট রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র) এবং জুমর (জুমর নন্দীর টীকাসহ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ), অভিধানের মধ্যে অমর (অমর সিংহ-কৃত ত্রিকাণ্ড যুক্ত সংস্কৃত অভিধান) অবশ্যপাঠ্য ছিল। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' পিঙ্গলকৃত 'ছন্দসূত্র', সুবন্ত ব্যাকরণ শাস্ত্রের শাখা-বিশেষ) এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের কাব্যশাস্ত্র বিচার-বিষয়ক অলঙ্কারশাস্ত্র 'সাহিত্যদর্পণ' রপ্ত করে নিতে হতো কাব্যসাহিত্য পাঠের পূর্বেই।

গৌরাঙ্গবিজয়-প্রণেতা চূড়ামণিদাস চৈতন্যদেবের বিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গে বলেছেন—'মাস পাঁচ ছয়ে হএ ব্যাকরণ বোধ।' এবং তিনি অভিধান অধিগত

পড়িল চৌষট্টিবিদ্যা সব একে একে। —মনসাবিজয় - পৃ - ১৫৩
মূর্তিমান হৈঞা রহে চৌষট্টিবিদ্যা প্রভুর সমীপে। —চৈতন্যমঙ্গল - পৃ -২৮-২৯
ক, খ চৌত্রিশ অক্ষর কাঠনেতে লেখি। —চৈতন্যমঙ্গল - পৃ ১৭; বর্তমানে 'ক্ষ', 'ং' বাদে বাংলা বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ৪৬টি আছে। (বা. দে. ই - পৃ - ২৫১-৫৪)। কিন্তু পূর্বে ৩৪ অক্ষরের বর্ণমালা দিয়ে বিদ্যারম্ভ হতো। মঙ্গলকাব্যের চৌত্রিশ স্তবের মধ্যে এই ৩৪ অক্ষরের ধারা লক্ষণীয়। প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যেও চৌত্রিশা স্তব আছে। (ওড়িয়া সাহিত্য পৃ - ৯)
আঙ্ক আঙ্ক অর্থে ব্যঞ্জন বর্ণদ্বয়ের বানান বা যুক্তাক্ষর শিক্ষা। এ সম্পর্কে পরবর্তিকালে রচিত একটি ছড়া পাওয়া যায়—
অক্ষর পরিচয় করিয়া দি। বানান জানিলে কঠিন কি॥
যুক্ত অক্ষর লাগে ধান্দি। পূর্ব অক্ষর উপরে ছান্দি॥
অপর অক্ষর তাহার তলে। ছাওালে গুরু গোবিন্দ বলে॥ —চি. প. স - পৃ - ২৬৯

করেন একমাসের মধ্যে। ব্যাকরণ বোধ সম্পূর্ণ হলে কাব্য পাঠের অধিকার জন্মাতো। গুরু মহাশয় উপযুক্ত সময় বিবেচনা ক'রে রসকাব্য পাঠের বিধান দিতেন।

কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'রাঘব পাণ্ডবী' (রামায়ণ ও মহাভারত) রঘুবংশ, মেঘদূত, ভট্টিকাব্য, ভারবির কিরাতার্জুনীয়, মাঘ-রচিত শিশুপালবধ, নলচরিত্র, অবলম্বনে শ্রীহর্ষকৃত মহাকাব্যভেদ নৈষধ, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ছিল প্রধান। প্রাকৃত কাব্য পাঠের উল্লেখ পাওয়া যায় চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গ-বিজয় কাব্য।

নাটকের মধ্যে শ্রীহর্ষকৃত রত্নাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুবন্ধু কৃত 'নায়িকাবাসবদত্তা'র চরিতাখ্যান মূলক গদ্যগ্রন্থ পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শাস্ত্রাদির মধ্যে 'অষ্টাদশপুরাণ', স্মৃতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র মন্দধীশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি ছিল প্রধান। এ প্রসঙ্গে শ্বেতমুনি-কৃত পুরাণপঞ্চরাত্র, জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শন, বিষ্ণুশর্ম্মাকৃত হিতোপদেশ এবং কামন্দকী (নীতি-শাস্ত্র ভেদ) ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। দীপিকা (শ্রীনিবাস-রচিত জ্যোতিষ-গ্রন্থ), ভাস্বতী (জ্যোতিষগ্রন্থভেদ), রক্ষিতপঞ্জিকা, গণবৃত্তি (ফলিত জ্যোতিষ) ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ থেকে অনুমান করা হয়, সেকালে জ্যোতিষশাস্ত্র ও বৈদ্যকশাস্ত্র পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

তহশিলের কাজের জন্য অঙ্ক শেখা কায়স্থ সন্তানদের পক্ষে আবশ্যিক ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে শুভঙ্করী-গণিতের যে সব ছোট-বড় আর্যা লেখা হয়েছিল তা মুখ্যতঃ কায়স্থ বালককে উদ্দেশ্য করে। ষোড়শ শতাব্দেও 'স্যাখতবিচার' কায়স্থদের অন্যতম আচাররূপে নির্দেশিত হয়েছে চূড়ামণিদাসের কাব্যে।[১]

মখদমের পরিদর্শনায় দলিজে বসে মুসলমান ছাত্ররা পড়াশুনা করতো[২], তবে তাদের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

১ কায়স্থ সদাচার স্যাখত বিচার জানএ পরম উপাযে। -গৌ. বি. পৃ-৩১
২ যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব খান মখদম পড়ায় পঠ না। -ক. ক. চ-পৃ-৮৬

পাঠ্যপুস্তকের উপরোক্ত নামতালিকা থেকে সে যুগে সংস্কৃত শিক্ষার একাধিপত্য স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। ফার্সী শিক্ষা তখনও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তবে পাঠ্যতালিকার বাঁধা সড়কের বাইরে ফার্সী চর্চা চলছিল সঙ্গোপনে। জগাই মাধাই সম্পর্কে জয়ানন্দের উক্তি 'মসনবি আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।' উল্লেখযোগ্য। কাব্যের অন্যত্র ভবিষ্যৎবাণীতে যা লিখেছেন তাতে তখনকার অনেক হিন্দুসন্তানদের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নরসিংহবসু আত্মকাহিনীতে বলেছেন. অল্পবয়সে পিতৃহীন হলে তাঁর পিতামহী তাঁকে 'বাঙলা ফারসী উড়্যা পড়াইল নাগরী।'[২] বাঙ্গালা পাঠ্যক্রমে ইংরেজির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আরও পরে।

ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের চর্চা ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া। ধর্মঠাকুরের পূজারী নীচ জাতি হলেও শাস্ত্রচর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো না।[৩] কবিকঙ্কণের বর্ণনা অনুসারে, শ্রীমন্ত সদাগর বণিক হয়েও ন্যায়শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করেছিল পুংখ্যানুপুংখ্যরূপে।[৪] কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যাকরণ চর্চা প্রচলিত ছিল জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে।[৫]

দুর্বলা দাসীর স্বীকারোক্তি[৬] থেকে ধারণা হয়, সেকালে নারী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন হয় নি। তবে উচ্চশিক্ষা না পেলেও ঘরোয়া হিসাব রাখা চিঠিপত্র লেখার উপযোগী শিক্ষার অপ্রতুলতা সে যুগে ঘটে নি।[৭] দুর্বলা লেখা-পড়া একেবারে না জেনেও 'হৃদয়ে গণনা ক'রে' অর্থাৎ প্রখর স্মৃতি

১ ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পঢ়িবে। মোজা পাএ নড়ি হাথে কামান ধরিবে॥
মসনবি আবৃত্তি করিবে কোন জন। —চৈতন্যমঙ্গল - পৃ - ১৩৯

২ ম. বা. বা - পৃ - ৪৪

৩ ম. বা. বা - পৃ ৪৩

৪ পঢ়িল শ্রীপতি দত্ত জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা ন্যায় কোষ নাটিকা গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।
জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব পঢ়িল অনেক মত বিদ্যা বিনে নাহি অন্যমন॥ -ক. ক. চ - পৃ - ২১৬

৫ ম. বা. বা. - পৃ - ৪৩

৬ লেখা পড়া নাহি জানি কহিব হৃদয়ে গুনি। - ক. ক. চ - পৃ - ১৫৬

৭ কপট প্রবন্ধে পত্র লেখে লীলাবতী - ক. ক. চ - পৃ - ১৩৮

শক্তির সাহায্যে পঞ্চাশ কাহন কড়ির খুচরা বেসাতির হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিতে পেরেছে কড়ায়-গণ্ডায়, তার মাঝে আবার আছে বাজার-চুরির কারসাজি।

নিত্যানন্দ-প্রভুর পুত্রবধূ, বীরচন্দ্র গোস্বামীর পত্নী সুভদ্রা দেবী সংস্কৃতে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। গ্রন্থের নাম 'অনঙ্গকদম্বাবলী'; বিষয়বস্তু —শাশুড়ী জাহ্নবা দেবীর প্রশস্তি। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবী বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। এ থেকে অনুমান হয়, ষোড়শ শতকের শেষ দিকে বৈষ্ণব আচার্য-বাড়ির মেয়েরা অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেতেন।[১]

সংস্কৃত শিক্ষা দান করা হতো টোলে। সাধারণতঃ গ্রামস্থ চণ্ডীমণ্ডপে টোল বসতো।[২] 'চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ' এবং মধ্যে শাস্ত্র ব্যাখানেন শ্রীশচিনন্দন।[৩] পণ্ডিতগণ বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হয়ে শিক্ষা দান করতেন সদর্পে।[৪] এই আসনের নাম—বীরাসন।[৫] অধ্যাপনায় বীররসের প্রাবল্য ঘটতো প্রায়শই; তবে সে যুগে বেত্রাঘাতের পরিবর্তে পুঁথির পাটা দিয়ে ছাত্র প্রহার করা চলতো সহজে।[৬] কবিকঙ্কণ-বর্ণিত দনাই ওঝার চরিত্র থেকে মনে হয়, সে যুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অধিকাংশই উগ্রভাবাপন্ন এবং তমোগুণ সম্পন্ন হতেন'।[৭] এই দনাই ওঝাদের প্রবল প্রতাপে গ্রামীণ শিক্ষার জগতে তখন সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছিল রীতিমতো। 'গোপাল বিজয়' প্রণেতা দৈবকীনন্দন-কবিশেখরের খেদোক্তি এই অনুমানের সমর্থক।[৮] পক্ষান্তরে, সহৃদয় পণ্ডিতের অভাব ছিল না দেশে। রূপরামের গুরু 'রঘুরাম

১ ম. বা. বা - পৃ - ৪৩-৪৪
২ বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে। চতুর্দ্দিকে বিস্তর পঢ়ুয়া তহি পরে॥ চৈ. ভা. পৃ - ৪৮
৩ চৈ. ভা - পৃ - ৫৫
৪ যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন। বাম উরু মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ। চৈ. ভা - পৃ - ৫৫
৫ যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন। বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন। চৈ. ভা - পৃ - ৫৫
৬ ইহা শুনি গুরু মারে পুস্তকের বাড়ি। ঐ মনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়। রূপরাম পৃ - ২৯,
৭ উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবে চপল। তমোগুণে কহ কথা হৈয়া প্রবল। ক. ক. চ - পৃ - ২২৬
৮ কলিতে বিদ্যায় দ্বন্দ্ব বাঢ়ে অহংকার। লোক রঞ্জিবারে করে কপট আচার। গো. বি. - পৃ - ৬

ভট্টাচার্য কবিচন্দ্রের পো' গৃহহীন রূপরামকে অপত্যস্নেহে পালন করে শিক্ষাদান করেন।[১]

॥ **গুরুদক্ষিণা** ॥ বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে সেকালে শিক্ষিত ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। অবস্থাবিশেষে নিরন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খ ধনীর দরজায় ধর্ণা দিতেন অনুগ্রহ লাভের আশায়।[২] শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভের প্রাক্‌কালে গুরুদক্ষিণা স্থির হয়েছিল মাসিক পঞ্চাশ কাহন কড়ি।[৩] আবার, এককালীন নগদ অর্থ গ্রহণ ক'রে ছাত্রকে রীতিমতো 'তৈআর' করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি এবং 'এই করারের ভিতর তৈআর কোরিআ না দীতে' পারলে টাকা ফেরৎ দেওয়ার চুক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত একখানি পুরাতন একরার পত্রে।[৪]

॥ **উপকরণ** ॥ ষোড়শ শতকে হস্তনির্মিত তুলটের প্রচলন হয় নাই। লেখার জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হতো তাল[৫] ও তেরেট[৬] পত্র। কোন গ্রন্থ পাঠ করে ভালো লাগলে সে পুথি সযত্নে নকল করিয়ে নিতে হতো।[৭] গুণানুসারে লিপিকরদের ইতর-বিশেষ ছিল।[৮] দেবতাজ্ঞানে পুথিপূজার উল্লেখ আছে।[৯] আবার, পুথি অপহরণের দৃষ্টান্ত-ও দুর্লভ নয়।[১০] পুথি

১ বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে। -রূপরামের ধর্মমঙ্গল - পৃ - ১৮

২ পঢ়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত। .... ।
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নাবে। সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে ॥ চৈ. ভা. -পৃ - ৫৩

৩ পঞ্চাশ কাহন লই পড়াযা বেতন। —ক. ক. চ - পৃ - ২১৭

৪ চি প. স - পৃ - ২২৮

৫ শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া। আপন বাতার চালে রাখিল গুজিয়া ॥ - চৈ. চ. - পৃ - ৮

৬. তাড়্যাত পাতের বিচিত্র পুথি তাহে রূপার চাকি। পাটের ডোর চন্দনে পরিপাটী। চৈ. ম - পৃ - ২৮-২৯

৭ কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল। আগ্রহ করিয়া পুথি লেখাইয়া নিল ॥
.... । লিখি মাহিতী সেই লিখন অধিকারী। চৈ চ - পৃ - ২৯১

৮ শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি। চৈ. চ - পৃ - ১৩

৯ শালগ্রাম তুলসী বন্দে ভাগবত পুথি। - গৌ. বি. - পৃ - ১৫

১০ কেহো বলে আমার চোরায় গীতা পুথি। - চৈ. ভা. - ২৮ ২৯

লেখায় সেকালে ব্যবহৃত কালি-প্রস্তুতের যে দুটি ফরমূলা মুদ্রিত হয়েছে[১] তাছাড়া আরও দুটি ছড়া সম্প্রতি পাওয়া গেছে। কালো-কালি প্রস্তুতের ফরমূলা—

ছাগ দুগ্ধ শিমূল ছালা। তাতে দিয়ে ত্রিফলা ॥
সেই কালি কোদালে ঘষি। মসি বলে আমি ধুলেও না খসি ॥

লাল-কালি প্রস্তুতের ফরমূলা—

সাজি সোহাগা তোলা তোলা। তার অর্ধেক নোদ ভেলা ॥
তাতে দিয়ে লায়ের জল। লোহার কড়ায়ে কালি কর ॥

একালের সেমিনার পদ্ধতির মতো সেকালেও মৌলিক গবেষণা অগ্রসর হতো প্রশ্নোত্তর বা তর্কের মাধ্যমে। তবে এই প্রশ্নোত্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিছক বাকবিলাস-জাত কলহে পরিণত হতো বলে মনে হয়।[২] বৃন্দাবন দাস এ সম্পর্কে বলেছেন 'কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।' এই তর্কযুদ্ধে যোদ্ধাদের বয়স নির্দিষ্ট থাকতো না। বৃন্দাবন দাস বলেছেন, 'বালকে হো ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।'[৩] চূড়ামণিদাস বলেছেন: 'কক্ষায়ে হারিয়া সব করে অভিমান। বালকের সাথে কিবা করিব বাখান।'[৪]

সেকালে খ্যাতনামা দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ 'দিগ্বিজয়-অভিযানে' গমন করতেন, বিদেশে আপন পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এই দিগ্বিজয়-বিচার সাংস্কৃতিক রণ-বিশেষ।[৫] সর্বজিত ভট্ট নামে দ্রাবিড় দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতের নবদ্বীপে আগমন ঘটে; তর্কযুদ্ধ বাধে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে। এই দিগ্বিজয়-বিচার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে চূড়ামণি দাসের কাব্যে।[৬] বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে, স্বয়ং ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের 'আত্ম-

১ পুথি পরিচয় ১মখ পৃ - ১৯০
২ মায়ে বোলে আজি বাপ। কি পুঁথি পঢ়িলা ?
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা ? —চৈ. ভা - পৃ - ৯৮
৩ চৈ. ভা - আ - ২ ; ৪ গৌ. বি - পৃ - ৫৮ ৫৯
৫ চি. প. স - পৃ - ২৪১
৬ গৌ. বি -- পৃ - ১০৬ ; চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত 'দিগবিজয়ি বিমোচন' আলোচ্য প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

নেপদী পরস্মৈপদী'র জোর তর্ক চলেছিল', তবে সে তর্কের ফল হয়েছিল মিশ্রনাস্তিক।[১]

এই 'দিগ্বিজয় বিচারে' বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত থাকেতন স্বয়ং রাজা কিংবা রাজপ্রতিনিধি। বিদ্যানিবাসের সঙ্গে নারায়ণ ভট্টের বিচার হয়েছিল রাজা টোডরমলের সভাপতিত্বে।[২] বিচারান্তে বিচারক জয়ী ব্যক্তিকে জয়পত্র (স্বীকৃতি পত্র) দান করতেন। স্বকীয়া ও পরকীয়া ধর্মমত সম্পর্কিত এই রকম একটি বিচার হয় ১১৩৭ বঙ্গাব্দে। এতে পরকীয়া মতের পরিপোষক গৌড়মণ্ডলের বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সিদ্ধান্ত মতে জয়ী হয়ে শিরোপা পেয়েছিলেন। জয়নগর থেকে সেওয়ায় জয়সিংহ মহারাজের দরবারে স্বকীয়া ধর্মের পরোয়ানা নিয়ে 'পাতসাহী মনসবদার' সমেত এসে কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য সদলবলে পরাজিত হয়েছিলেন এবং এই মর্মে পরাজিত ভট্টাচার্য মহাশয় জয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন তৎকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অন্যতম মুখপাত্র 'পদামৃতসমুদ্র'কার রাধামোহন ঠাকুরের নিকট।[৩]

॥ **ষোড়শ শতকের বিদ্যাস্থান—নবদ্বীপ** ॥ ষোড়শ শতকের সংস্কৃতি চর্চার শ্রেষ্ঠতম পীঠস্থান নবদ্বীপের বিদ্বৎসমাজের উৎপত্তির ইতিহাস জন-স্মৃতিতে নানা লৌকিক-অলৌকিক জনশ্রুতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।[৪] আদি-যোগী 'অবধূত' কর্তৃক নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের প্রথম স্থাপনার কাহিনীর সঙ্গে রাজা রাঘব রায়ের কাহিনী সংশ্লিষ্ট। এই কাহিনীর কালসীমা চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে পড়ে।[৫] আবার প্রাচীন মৈথিল গ্রন্থে গৌড় মতের উল্লেখ থেকে অনুমান হয়, বঙ্গদেশে ন্যায়চর্চার ঐতিহ্য আরও প্রাচীন।[৬]

সে যাই হোক, সরস্বতীর কৃপা দৃষ্টিপাতে পরিপুষ্ট নবদ্বীপ বিদ্যা-সমাজ ষোড়শ শতকের বঙ্গদেশের বিদ্যাসমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে এবং বহির্বঙ্গে'ও তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়। নবদ্বীপের এই গৌরব রঘুনাথ শিরোমণির সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও তার ভূমিকা প্রস্তুত

---

১ চৈ. ভা - পৃ - ৫৪ ; ২ বা. সা. অ - পৃ - ৬৫

৩ চি. প. স - ২ পত্র সংখ্যা—১২৮

৪ বা সা. অ (১ম ভাগ) - পৃ - ৩১-৩৪

৫ বা. সা. অ - (১ম ভাগ) - পৃ - ৩৪

৬ বা. সা. অ (১ম ভাগ) - পৃ - ৩৫

হয়েছিল অনেক পূর্বে এবং বহু মনীষীর অক্লান্ত সাধনায় পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে। আমাদের সমীক্ষিত কালসীমার অন্তর্ভুক্ত পণ্ডিতবর্গের কালানুক্রমিক নাম-তালিকা প্রদত্ত হ'লো।

॥ **নব্য-ন্যায়** ॥ প্রগল্‌ভাচার্য (জন্ম আঃ ১৪১৫ খ্রীঃ), বাসুদেব-সার্বভৌম (জন্ম আঃ ১৪৪০-৩৫ খ্রীঃ), সার্বভৌমের সহোদরদ্বয়—বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি ও কৃষ্ণদাস বিদ্যাবিরিঞ্চি, বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতির জামাতা পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য (সার্বভৌমের পুত্র), স্বপ্নেশ্বরাচার্য (জলেশ্বরের পুত্র), পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর (জন্ম আঃ ১৪৪০ খ্রীঃ মতান্তরে ১৪৬০ খ্রীঃ), কণাদ তর্কবাগীশ (জন্ম আঃ ১৪৬০-৭০ খ্রীঃ), নরহরি বিশারদ (জন্ম আঃ ১৪০০ খ্রীঃ) শ্রীনাথ ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী (বিশারদের বয়ঃকনিষ্ঠ), বলভদ্র (১৫০০-৫০ খ্রীঃ), ঈশান ন্যায়াচার্য (শিরোমণির পূর্ববর্তী), রঘুনাথ শিরোমণি (১৪৯০—১৫০০ খ্রীঃ), পদ্মনাভ মিশ্র (বলভদ্রের পুত্র আঃ ১৫১০-২০ খ্রীঃ), ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ (জন্ম আঃ ১৫১৫ খ্রীঃ), সিদ্ধান্ত বাগীশের ছাত্রদ্বয়—(১) গুপ্তিপাড়ার রাঘবেন্দ্র শতাবধান ভট্টাচার্য (২) পাটলির দেবীদাস বিদ্যাভূষণ, সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্রদ্বয় (১) শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ (১৫৮৫—১৬১০ খ্রীঃ) (২) রাম তর্কালঙ্কার, রুদ্র তর্কবাগীশ (সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র), দেবনাথ তর্কপঞ্চানন (১৫২০-৮৭ খ্রীঃ) কৃষ্ণদাস সার্বভৌম (১৫২০-২৯ খ্রীঃ), রামভদ্র সার্বভৌম (১৫২৫-৭৫ খ্রীঃ), রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ (১৫৩০-৫০ খ্রীঃ), জগৎগুরু, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার (জন্ম ১৫৪০—১৫৬০ খ্রীঃ), মথুরানাথ তর্কবাগীশ (অভ্যুদয় ১৫৫০ খ্রীঃ) হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার (১৫৫০-৭৫ খ্রীঃ), গুণানন্দ আগমবাগীশ (১৫৫০-৭৫ খ্রীঃ), কাশীনাথ বিদ্যানিবাস (১৫৫৬ খ্রীঃ), কবিমণি ভট্টাচার্য (বিদ্যা-নিবাসের সমসাময়িক), মধুসূদন বাচস্পতি (১৫৬০ খ্রীঃ), গোবিন্দ ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী (গ্রন্থ রচনাকাল ১৫৯০—১৬১০ খ্রীঃ), রূপনারায়ণ (গদাধরের পূর্ববর্তী), গদাধর ভট্টাচার্য (জন্ম ১৬০৪ খ্রীঃ), নারায়ণ সার্বভৌম (গদাধরের সমসাময়িক), মহাদেব বিদ্যাবাগীশ (গ্রন্থ রচনাকাল ১৬০৫ খ্রীঃ), রাম-গোপাল সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১৬২৫-৫০ খ্রীঃ), মহেশ্বর ভট্টাচার্য (সপ্তদশ-শতকের প্রথম দিক)

॥ **স্মৃতি** ॥ এই সময়ে নবদ্বীপে স্মৃতিশাস্ত্র চর্চার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। ষোড়শ শতকে মহা-মনীষী রঘুনন্দন স্মৃত-বিস্মৃত অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ

সংগ্রহ ও সংকলন করেন। আর্য-আর্যেতর ধর্ম ও লৌকিক নানা ধর্মের ঐতিহ্য আচার অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা সংস্থাপক কালোপযোগী সংস্করণে রূপ গ্রহণ করেছিল তাঁর অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে। স্মৃতির দিগন্তে যুগন্ধর পুরুষ রঘুনন্দন-কৃত স্মৃতির অনুশাসন সমাজকে অদ্যাবধি পরিচালিত ক'রে চলেছে অব্যাহত ধারায়। শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি, গোবিন্দানন্দ-প্রমুখ বাঙ্গালী শাস্ত্রকারগণের তখন ভারতব্যাপী খ্যাতি। দাক্ষিণাত্যের বেঙ্কটভট্টের পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতুষ্পুত্র) গোপালভট্টের ভগবদ্‌ভক্তি বা হরিভক্তিবিলাস রঘুনন্দনকে অনুপ্রাণিত করে। গোপালভট্টের এই গ্রন্থে, মহাপ্রাজ্ঞ সনাতন-গোস্বামী ও রূপ-গোস্বামীর গ্রন্থাদিতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের বিধিব্যবস্থা নিরূপিত হয়েছে। ষোড়শ শতকে দেবীবরের নেতৃত্বে মেলবন্ধন সংঘটিত হয়েছিল শেষবারের মতো। সেযুগের প্রখ্যাত স্মার্ত-পণ্ডিতগণের নামতালিকা প্রদত্ত হলো—

শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি (রঘুনন্দনের গুরু ১৫শ শতকের শেষ বা ১৬শ শতকের প্রথম ভাগ), হরিহর ভট্টাচার্য (রঘুনন্দনের পিতা), রঘুনন্দন (১৬শ শতক), কাশীরাম বাচস্পতি (রঘুনন্দনের টীকাকার), প্রতাপরুদ্র (১৬শ শতক), গোবিন্দানন্দ (১৫১০-১৫৪৫ খ্রীঃ), নারায়ণ ভট্ট (জন্ম আঃ ১৫১৬ খ্রীঃ, সাহিত্যসৃষ্টির কাল ১৫৪০-১৫৭০ খ্রীঃ), অনন্তদেব (জীবৎকাল ১৫২৮-১৬০০ খ্রীঃ), হরিহরাচার্য (১৪৮১ শক=১৫৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'সময়প্রদীপ' রচিত), তোডরানন্দ (১৫৬৫-৮৯ খ্রীঃ), নীলকান্তভট্ট (১৫৭০-৮৯ খ্রীঃ), নৃসিংহপ্রসাদ (১৫৭৩ খ্রীঃ), নন্দপণ্ডিত (১৫৯৫-১৬৩০ খ্রীঃ)।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নৃসিংহপ্রসাদ নামে একজন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত ধর্মশাস্ত্রের ব্যাপক অনুশীলন করেন। এঁর অধিকাংশ 'সারে'র পুষ্পিকায় 'সূর্যপণ্ডিতের ছাত্র দলপতি' লিখিত আছে। এই সূর্যপণ্ডিত মারাঠা সাধক একনাথের পিতা বলে পণ্ডিতগণের ধারণা। ইনি ১৪৯৫ শকে ১৫৭৩--৭৪ খ্রীঃ কাশীতে ভাগবত রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

॥ তন্ত্র ॥ ষোড়শ শতকে এদেশে তন্ত্রের দিগন্তেও নবজাগরণ সূচিত হয়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, পূর্ণানন্দ গিরি (পরমহংস), পূর্ণানন্দের গুরু, ব্রহ্মানন্দ গিরি, তন্ত্রসাধক চন্দ্রশেখর (১৫৯০ খ্রী) - প্রমুখ সাধকগণের দ্বারা অনেক তন্ত্র গ্রন্থ রচিত ও অনুশীলিত হয়।

॥ বহির্বঙ্গে বাঙ্গালী পণ্ডিত ॥ পূর্বোক্ত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মাধব-সরস্বতী, নারায়ণ-আশ্রম, রামতীর্থ, নারায়ণ, বিদ্যানিবাস, কৃষ্ণপণ্ডিত, কাশীনাথ ভট্টাচার্য-প্রমুখ পণ্ডিতগণ কাশীতে অধ্যাপনা করতেন। বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র সুদীর্ঘকাল কাশীতে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের নেতৃত্ব দান করেছিলেন। এছাড়া, প্রগল্ভাচার্য, বলভদ্রমিশ্র, পদ্মনাভমিশ্র, রঘুনাথ শিরোমণির শিষ্য জগদ্গুরু রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-চক্রবর্তী, রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার, রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি-প্রমুখ বহু খ্যাতিমান নৈয়ায়িক-পণ্ডিত কাশীতে বসবাস করে ন্যায়চর্চা করেন। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে, প্রকাশানন্দ নামে একজন বাঙ্গালী-পণ্ডিত কাশীতে অধ্যাপকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।[১]

এ ছাড়া, 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লিখিত সম্রাট আকবরের সভায় উপস্থিত ভারতবর্ষের ১৪০ জন খ্যাতনামা পণ্ডিতদের যে নাম-তালিকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অন্ততঃ ৩২ জন হিন্দু বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। উক্ত হিন্দু পণ্ডিতবর্গের বিস্তারিত পরিচয় 'বাঙালীর-সারস্বত অবদান' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[২]

শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবগোস্বামী প্রমুখ পণ্ডিতগণ বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তৎকালে বৃন্দাবন সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তিকালে এই পরম্পরার সার্থক উত্তরসূরী শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আজীবন বৃন্দাবনে বসবাস করে চিরন্তন দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সুমহান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। বাঙ্গালী পণ্ডিত বাসুদেব-সার্বভৌম সুদীর্ঘকাল ওড়িষ্যা-রাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিতের পদ অলংকৃত করেন।[৩]

কিন্তু নবদ্বীপের বাইরে কাশীধাম ছাড়া আর কোনো সমাজে ন্যায়-গ্রন্থ রচিত হয় নাই। কাশীধাম-ও নব্যন্যায়ের নবদ্বীপের শাখা বলে গণ্য। কেন্দ্রীভূত এই মহাসমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকে বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক বিদ্যাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সর্বত্রই নব্যন্যায়ের চর্চা অল্পবিস্তর

১ কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
- চৈ. ভা. পৃ - ১১৫

২ বা. সা. অ - পৃ ৬৪-৬৫

৩ বা. সা. অ - পৃ - ৪২

প্রসার লাভ করেছিল।[১] তারমধ্যে অম্বিকা-কালনা, আন্দুল, উত্তরপাড়া, উলা বা বীরনগর, কলিকাতা, কাউগাছি, কামালপুর, কুমারহট্ট, কুশদ্বীপ, কোটালিপাড়া, কোঁড়বল্লী, কোন্নগর, গুপ্তিপাড়া, নৈহাটী, পুঁড়া, বর্ধমান, বাকলা, বাঁশবেড়িয়া, বিক্রমপুর, বেলপুখুরিয়া, ভট্টপল্লী, মুর্শিদাবাদ, মূলা-জোড়, মৈমনসিংহ, যশোহর, খুলনা, শান্তিপুর, মহেশ্বরাদি-পরগনাভুক্ত চাক্‌দা, সোনার গাঁ ও মেঘনার পূর্বকূলে অবস্থিত ন্যায়ের চতুষ্পাঠীগুলি প্রধান।[২] এই নাম-তালিকা সঙ্গে 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' গ্রন্থে ধৃত তালিকা[৩] যুক্ত করলে তালিকা সম্পূর্ণ হবে। উক্ত গ্রন্থোধৃত তালিকায় মোট ৬৮টি গ্রামের নাম আছে। তন্মধ্যে নদীয়া জেলার ৩টি, চব্বিশ পরগনার ১টি, হাওড়ার ২টি, বর্ধমানের ১৭টি এবং হুগলীর ৪৫টি। এই ৬৮টি গ্রামের ভট্টাচার্য-পণ্ডিতের নাম পাওয়া গেছে সাকুল্যে ১৩৪ জনের। তাঁরা অধিকাংশই ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের পণ্ডিত।[৪]

ধর্মমঙ্গলকার রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যের 'আত্মকাহিনী' অংশে এ সম্পর্কে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়। কবির বর্ণনা অনুসারে, সেকালে জউগ্রামের কলানিধি ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ছিল শান্তিপুরের বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের খ্যাতি অপেক্ষা অনেক বেশী।[৫] বর্ধমান জেলার কাইতি-শ্রীরামপুর গ্রামে স্বয়ং কবিপিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর একটি বৃহৎ টোল ছিল। এই টোলের ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় একশত কুড়ি জন। শ্রীরামপুরের সন্নিকট পাষণ্ডা গ্রামে টোল চৌপাড়ি ছিল; সেখানকার ছাত্রসংখ্যা একশত কুড়ি বা ততোধিক। রূপরাম চক্রবর্তী এখানে শিক্ষালাভ করেন। কবির গুরু রঘুরাম ভট্টাচার্যের কাছে নবদ্বীপের খ্যাতনামা পণ্ডিত কণাদ পরাজয় স্বীকার করেন।[৬]

১ বা সা. অ - পৃ - ৩১

২ বা সা. অ - পৃ - ২৮৪ ৩:৯

৩ চি. প স - পৃ - ২৫-২৬

৪ চি. প. স - ২; পত্র সংখ্যা - ১৮৮

৫ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য শান্তিপুরে আছে। ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে।
নহে জউগ্রাম চল কলানিধির ঠাঞি। তাঁর সম ভট্টাচার্য শান্তিপুরে নাঞি॥
—রূপরামের ধর্মমঙ্গল - পৃ - ১২

৬ ভট্টাচার্য কণাদ মানিল পরাজয়।

বর্ধমান জেলার রামবাটী গ্রামের টোলে ধর্মমঙ্গলকার ঘনরাম চক্রবর্তী শিক্ষা লাভ করেন।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত পাঠ্যক্রম তালিকা থেকে অনুমান হয়, আমাদের সমীক্ষিত যুগে বৈদ্যক, জ্যোতিষ, স্যাখত ছাড়া অন্য কোনো ব্যবহারিক বিদ্যার বিশেষ প্রচলন হয় নি। তবে কর্মকার, তন্তুবায়, তক্ষণকার, চিত্রকর, লিপিকর গোষ্ঠী সহজাত শিল্পনৈপুণ্য এবং ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতো সম্ভবতঃ একই রীতিতে—বংশ পরম্পরায়।

একালের মতো সেকালেও কাব্য-ব্যাকরণাদি পাঠ ক'রে তথাকথিত পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রে কর্মহীন যুবক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল। 'পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাঞী ভাত।'[১] —বাস্তববাদী কবি বৃন্দাবন দাসের খেদোক্তি এই অনুমানের সমর্থক। বৃত্তিমূলক ব্যবহারিক বিদ্যার প্রতি মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে স্বয়ং মহাপ্রভুর জবানীতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন—

প্রভু বোলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পঢ়।
লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র ই বিষমের অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥[২]

সম্ভবতঃ ব্যবহারিক বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য মুকুন্দরাম বণিক-নন্দন শ্রীমন্ত-সদাগরকে কাব্য-ব্যাকরণাদি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে অবশেষে পৈতৃক বৃত্তির অনুসরণে বাণিজ্য দ্রব্যে তরণী বোঝাই করে প্রেরণ করেছেন সিংহল পাটনে এবং পরিণামে যথোচিত পুরস্কার দান করে কবি তার উদ্যম ও পুরুষকারকে জয়যুক্ত করেছেন আর দৈবশক্তিও তাকে আনুকূল্য দান করেছে প্রতি পদে।

১ চৈতন্যভাগবত - পৃ - ৬০, ২ চৈতন্যভাগবত - পৃ - ৪৮

সাহিত্য ঃ বিশ্লেষণ ও বিচার

পুথির তথ্যে আলোচনা

বর্তমান পরিচ্ছেদে ষোড়শ-শতাব্দের প্রায় শতাধিক কবিকুলের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বিশ্বভারতী-পুঁথিসংগ্রহে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত রচনাবলী অবলম্বন করে। তার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন কয়েকজন কবির নাম পাওয়া গেছে এবং পরিজ্ঞাত কবিদের অপরিজ্ঞাত রচনার সংখ্যাও কম নয়।

'দ্বিজমোহন দাস' ও তাঁর 'ভক্তমালা' গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার। এ ছাড়া 'দ্বিজহরিদাস' ভণিতায় প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, জগদানন্দের উজ্জ্বল-প্রকাশিতা (উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ) বলরাম দাসের উদ্ধবসন্দেশের অনুবাদ, রামচন্দ্র কবিরাজের রসচন্দ্রিকা, দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব অভিধান—ইত্যাদি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অপরিজ্ঞাত।

যদুনন্দনের 'সংগ্রহতোষণী', যশশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলাস—ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখমাত্র আছে সাহিত্যের ইতিহাসে ; প্রস্তুতগ্রন্থে গ্রন্থগুলি বিশদভাবে আলোচিত হ'ল।

'বৃন্দাবন দাস' ভণিতায় প্রাপ্ত অপ্রকাশিত রচনাগুলির আভ্যন্তরীন তথ্যাদি থেকে অনুমান হয়, চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস ছাড়াও ষোড়শ-শতাব্দে এই নামে একাধিক কবি সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। লোচনদাস ভণিতাযুক্ত সব রচনাই একজন লোচনদাসের লেখনীজাত এরূপ অনুমান যেমন অভ্রান্ত নয়, 'নরোত্তম দাস' ভণিতায় প্রাপ্ত রচনাগুলির প্রত্যেকটি প্রসিদ্ধ নরোত্তম দাসের রচনা এ ধারণাও অসঙ্গত।

'কবিশেখর' ভণিতায় প্রাপ্ত 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যের 'পারিজাত হরণ' পালার রচয়িতার আসল নাম 'দ্বিজ-যাদব'। বলরামদাসের গুরুগোসাঞির মাহাত্ম্য, নামসংকীর্তন, 'লোকনাথদাস'-ভণিতাযুক্ত গুরুবস্তুতত্ত্ব, জগন্নাথদাসের শিবরহস্যআগম ইত্যাদি গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা ও রচনাকাল নিরূপণের সূত্র গ্রন্থের আভ্যন্তরীন তথ্যে পাওয়া যায় না ; এগুলির যাথার্থ্য বিচার ব্যাপকতর গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

'সার্বভৌম ভট্টাচার্য' ভণিতাযুক্ত শ্রীরাধিকাষ্টক, শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক—ইত্যাদি রচনা বাসুদেব-সার্বভৌমের লেখনীজাত কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না ; তবে 'রূপগোস্বামী'—নামাঙ্কিত শ্রীরাধিকাষ্টক, কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-ভণিতাযুক্ত

'শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর অষ্টক' নামক অপরিজ্ঞাত সংস্কৃত শ্লোকগুলি উক্ত কবিগণের লেখনীজাত, রচনাশৈলীগত সাদৃশ্য থেকে এরূপ অনুমান অসঙ্গত হবে না।

স্বরূপদামোদরের মূল সংস্কৃত কড়চা গ্রন্থখানি পরবর্তিকালে সহজিয়াদের হস্তাবলেপে কি রূপ ধারণ করেছিল তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে বিশ্বভারতী-সংগ্রহে রক্ষিত 'আশ্রয়কল্পতরু বা গোস্বামী-প্রবর স্বরূপ-দামোদরের কড়চা' নামক গ্রন্থখানিতে।

পরমেশ্বরদাসের সূচকটি যে মুকুন্দের অপ্রকট উপলক্ষে রচিত তিনি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতা কিনা বলা যায় না। রঘুপণ্ডিতের 'শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়' নামক গ্রন্থখানি মুদ্রিত হলেও বিশ্বভারতী-সংগ্রহের পুঁথিতে মূল সংস্কৃত শ্লোক আছে, যা মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

'গদাধর' ভণিতায় প্রাপ্ত অপ্রকাশিত-পদগুলির রচয়িতা কোন গদাধর সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না ; তবে পদগুলিতে চৈতন্যদেব সম্পর্কে বর্ণনার আন্তরিকতা থেকে মনে হয় কবি চৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্তী। 'ভাগবত-দশমভাষার' রচয়িতা মল্লভূম-নিবাসী গদাধর দাস-ও বাংলা সাহিত্যে অপরিজ্ঞাত। কবির পৃষ্ঠপোষক শ্রীদুর্জনসিংহ ও রঘুনাথ।

'কানুরামদাসের' ভণিতায় প্রাপ্ত অপ্রকাশিত রচনাটির কাঠামোয় প্রাচীনত্ব আছে তবে ইনি পুরুষোত্তম দাসের পুত্র কিনা বলা যায় না। 'চন্দ্রশেখর' ভণিতায় প্রাপ্ত অপ্রকাশিত ব্রজবুলি পদ গুলির রচয়িতা শশিশেখরের ভ্রাতা চন্দ্রশেখর হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

'শ্রীসিদ্ধান্তকড়চাগ্রন্থ' খানির পুষ্পিকাংশে বলা হয়েছে,............
"দামুদর পণ্ডিতং মুখাদমৃতং পিবন্তি নবদ্বীপাদী ভক্তশ্রবণং কথিতং স্যাৎ।"

দ্বিজমাধব মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি সমস্যা বিশেষ। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে এঁর সম্পর্কে যথাসাধ্য আলোচনা করা হ'ল। চণ্ডীদাস সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থে নূতন সমীক্ষা আর যাই হোক কল্পনাবিলাস নয়।

কবিদের নাম বিন্যস্ত করা হয়েছে মূলত কালানুক্রমিক ভিত্তিতে। তবে শিষ্যপরম্পরায় স্থাপনের জন্য হরিচরণদাস, অনন্তদাস, অনন্ত আচার্য—প্রমুখ কবিদের প্রথমদিকে স্থান দেওয়া হয়েছে আবার পুরুষ পরম্পরায় স্থাপন করা হয়েছে নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের নাম। কেবলমাত্র নামসাদৃশ্যে জগদানন্দ, গদাধর দাস, চন্দ্রশেখর, বৃন্দাবনদাস প্রমুখ অনেক পরবর্তিকালের

কবিগণকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনার পরিধি বিস্তার করা হয়েছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, যদুনন্দন, মোহনদাস, যশশ্চন্দ্র, অকিঞ্চনদাস, মানসিংহ রায়—সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে সাহিত্যসৃষ্টি করেছিলেন ; সপ্তদশ শতাব্দেও এঁরা বর্তমান ছিলেন সেইজন্য ষোড়শ-শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ—এই সন্ধিযুগে এঁদের স্থাপন করা হ'ল।

॥ রায়-রামানন্দ ॥ রায়-রামানন্দ বা রামানন্দ রায় ছিলেন ওড়িষ্যা-রাজ প্রতাপরুদ্রের রাজ্যভুক্ত রাজমাহেন্দ্রীর (বিদ্যানগর) প্রদেশপাল.। এঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ছিল সুদূর-প্রসারী। কবিরূপেও ইনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় সার্বভৌমের অনুরোধে সুরসিক রায়-রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গোদাবরী নদীর তীরে মহাপ্রভুর সঙ্গে রায়-রামানন্দের মিলন ও সাধ্যসাধনতত্ত্ব আলোচনার বিবরণ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা করেছেন বিশদভাবে।[১]

'দিনমনিচন্দ্রোদয়' নামক একখানি পুঁথির রচয়িতা মনোহর দাস নিজেকে রায় রামানন্দের বংশধর বলে পরিচয় দিয়েছেন। রামানন্দ রায়কে ইনি বলেছেন প্রপিতামহ।[২]

রামানন্দ রায়ের সর্বাপেক্ষা প্রচলিত ও জনপ্রিয় গ্রন্থ 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক। গ্রন্থখানি সংস্কৃতে রচিত। 'রামানন্দ সঙ্গীতা' নামেও গ্রন্থখানি সুপরিচিত। নাটকটি একুশটি গীতে সম্পূর্ণ। তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, সঙ্গীত গুলিতে গীত-গোবিন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট। দাক্ষিণাত্যের কবি বিল্বমঙ্গলের প্রভাব-ও দুর্লক্ষ্য নয়। জগন্নাথবল্লভ নাটকে চৈতন্যবন্দনা না থাকায় মনে হয় গ্রন্থটি চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে অর্থাৎ ১৪৩২ শকের পূর্বে কোনো সময়ে রচিত। কবি লোচনদাস নাটকটি পদ্যে অনুবাদ করেন।

নাটক ছাড়াও ইনি কিছু পদ রচনা করেছিলেন।[৩] এঁর বিখ্যাত পদ 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল'[৪] ওড়িষ্যায় লেখা অন্যতম প্রাচীন ব্রজবুলি পদ। পদকল্পতরু গ্রন্থে 'রায়-রামানন্দ' ভণিতায় আটটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে।[৫] উক্ত গ্রন্থে 'রাম রায়' ভণিতায় একটি পদ আছে।[৬] সম্পাদক মহাশয়ের মতে ওই পদের রচয়িতা সম্ভবতঃ রামানন্দ রায় নহেন,—অন্য কেহ হইবেন।[৭] কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দ রায়কে 'রাম-রায়' রূপে একাধিকবার অভিহিত

১ চৈ. চ - ম. ৮/১৭৯-২৫৭ ২ গৌ. বৈ. সা - পৃ - ৭৪-৭৫
৩ H. B. L. P. 25-28
৪ প. ক. ত - পদসংখ্যা - ৫৭৬
৫ প. ক. ত - ৫ম খণ্ড - পৃ - ৫৫
৬ প. ক. ত - পদসংখ্যা - ২৮৪৪
৭ প. ক. ত - ৫ম খণ্ড - পৃ - ২০২

করা হয়েছে।[১] সুতরাং 'রাম রায়' ভণিতাযুক্ত পদটি রায় রামানন্দের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'পদমেরু' নামক পদসংকলন গ্রন্থে রায়, রাজ, রাই ভণিতায় ৪৪টি পদ আছে; অধিকাংশ পদ পূর্বে কোনো মুদ্রিত সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। পদকর্তা রায়-রামানন্দ কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না; তবে ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলির সঙ্গে জগন্নাথবল্লভের রচনা শৈলীর সাদৃশ্য আছে।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে (পুথি সংখ্যা—২০৫৪) ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে (পুথিসংখ্যা-স ১৭৮) 'রায়রামানন্দ' ভণিতায় শ্রীচৈতন্যমর্ম-নিরূপণ বা শ্রীচৈতন্য প্রেমতত্ত্ব-মর্ম্ম-নিরূপণ গ্রন্থের পুথি আছে। আঃ অষ্টাদশ শতাব্দে উড়িষ্যা প্রান্তবাসী কোনো কবি 'রায়-রামানন্দ' ভণিতায় কৃষ্ণলীলা পদাবলী রচনা করেছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতের অনুসরণে।[২] 'শ্রীচৈতন্য-প্রেমতত্ত্ব-মর্ম্ম-নিরূপণ' গ্রন্থ এই রামানন্দ রায়ের রচনা নয় কারণ ভণিতায় উল্লেখ আছে কবি চৈতন্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত হয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন।[৩] তবে ইনি প্রসিদ্ধ রায়-রামানন্দ নন কারণ 'শ্রীরামানন্দ-রায় কর্তৃক প্রদ্যুম্ন মিশ্রীকে শিক্ষা প্রদান' গ্রন্থের উপজীব্য।

॥ অদ্বৈত আচার্য ॥

অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্যদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত। জন্ম আঃ ১৪৩৪খ্রীঃ। মতান্তরে, ১৪৬০ খ্রীঃ। অদ্বৈতপ্রকাশের মতে, গৌরাঙ্গের জন্মকালে ইনি দ্বি-পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে পদরচনা ও কীর্তন গানের ইনি প্রথম প্রবর্তক। আচার্য-রচিত দুই ছত্রের একটি পদের

১ চৈ. চ - অ ১৬/১৩৯, অ ১৯/৫৪

২ বা. সা. ই - পৃ - ১০০৮

৩ শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রেমতত্ত্ব নিরূপণ। শ্রীচৈতন্য কৃপায় ইহা করিল বর্ণন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। মর্ম্মনিরূপন কহে রায় রামানন্দ॥ ইতি
শ্রীশ্রীচৈতন্য.........নিরূপণ। বিরচিতং তীনজয়া কথা সংপূর্ণমস্তু॥ ইতি
সকাব্দা - ১৭০৩॥ সন ১০৮৭ মল্ল সাল॥ —পুষ্পিকাপত্র। বি. ভা - পু - ২০৫৪

উল্লেখ করেছেন বৃন্দাবন দাস। পদটি এইরূপ—

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর। দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর।[১]

এঁর আর কোনো সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায় নি। অদ্বৈত আচার্য এবং পত্নী সীতাদেবী স্বয়ং সাহিত্য-সৃষ্টির উপকরণ হয়েছেন। এঁদের জীবনকাহিনী অবলম্বন করে পরবর্তিকালে যুগপৎ প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তারমধ্যে শ্যামদাস আচার্য-রচিত 'অদ্বৈত মঙ্গল' এবং হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈত মঙ্গল' প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত। ঈশাননাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় পণ্ডিতমণ্ডলী সন্দিহান। নরহরি দাসের 'অদ্বৈতবিলাস' পরবর্তিকালের রচনা। শ্রীহট্ট-লাউড়াধিপতি দিব্যসিংহ (নামান্তর কৃষ্ণদাস) কৃত 'বাল্যলীলাসূত্রং' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যলীলা বর্ণিত হয়েছে। ১৪০৯ শকাব্দে বৈশাখ মাসে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। তবে ঐতিহাসিক বিচারে এ গ্রন্থও আধুনিক।[২] আচার্য-পত্নী সীতাদেবীর দুটি সংক্ষিপ্ত জীবনীকাব্য পাওয়া গেছে—বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণকদম্ব' ও লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র। দুখানি গ্রন্থেরই প্রাচীনত্ব কৃত্রিম।[৩]

॥ শ্যামদাস-আচার্য ॥

কথিত আছে, অদ্বৈত আচার্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য শ্যামদাস-আচার্য 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামে অদ্বৈত-প্রভুর জীবনী সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; কিন্তু গ্রন্থের কোনো পুথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।[৪] পদকল্পতরু গ্রন্থে ধৃত 'শ্যামদাস'-ভণিতাযুক্ত অদ্বৈতবন্দনা-বিষয়ক পদ দু'টি (পদসংখ্যা—২৩৫০, ২৩৫২) এঁর রচনা হওয়া সম্ভব।

'শ্যামদাস'-ভণিতায় পদকল্পতরুতে মোট ৬টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। গৌরপদতরঙ্গিনী, পদকল্পলতিকা, সংকীর্তনামৃত প্রভৃতি প্রচলিত পদসংকলন গ্রন্থগুলিতে 'শ্যামদাস' ভণিতার পদ আছে। ষোড়শ শতকে এবং পরবর্তিকালে

১ চৈ. ভা - পৃ - ৩-৯; অদ্বৈত আচার্যের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ শ্রদ্ধেয় ডঃ নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী (গোঁসাইজী) মহাশয়ের বিবৃতি অনুসারে, এটি মূলে ছিল একটি সংস্কৃত শ্লোক; পরবর্তিকালে বঙ্গানুবাদ করা হয়। শ্রীরামদয়াল ঘোষ (ভাটপাড়া) কর্তৃক মূল শ্লোকটি প্রকাশিত হয়েছে।

২ গৌ. বৈ. সা - পৃ - ৯। ৭৪-৭৫; ৩ বা. সা. ই - পৃ - ২৭৭

৪ গৌ. প. ত - ভূ. পৃ - ২৫৩-৫৪, H. B. L. - P - 179

'শ্যামদাস'-নামে একাধিক কবি পদ রচনা করেন।[৪] কোন্ পদটি কার রচনা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'শ্যামদাস'-ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলিতে রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক দু'টি অপ্রকাশিত পদ পাওয়া যায়। একটি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো ; অন্য পদটির প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' প্রদত্ত হলো—

রাগ বিভাস॥ তু গতি মন্থর নয়নে নিহারই দোলনি গীম তরঙ্গ।
বচন অমিঞা বিন্দু অধরে মিলাওই সুনইতে কুলকে কলঙ্ক॥
সজনি তনু নহে পিরিতি পসার।
জো কি চহে (?) বিচারক মন শুখ সন্ততি দরসনে পরস বিচার॥ ধ্রু॥
দেখিয়া শ্যামের রূপ কহিতে সপন হেন শুনইতে সিনাক সাতার।
না কহিয়া হারে জবে (?) মরি হেন বাসি তবে শ্যামদাস মরম বিচার॥
—পৃ - ৩৭ক, ১৭৩৩

পদটির শেষ দু'ছত্রে বাঙ্গালার মিশ্রণ লিপিকর প্রমাদজাত হওয়া অসম্ভব নয়। সম্ভবতঃ অনুরূপ কারণে পদটির মাঝের কিছু অংশ বাদ গেছে বলে মনে হয়। তবে সামগ্রিক বিচারে পদটির মূল কাঠামোয় প্রাচীনত্ব বজায় আছে। পদটি কোন শ্যামদাসের লেখনীজাত সঠিক নির্ণীত না হলেও অর্বাচীন কালের রচনা নয় বলেই মনে হয়।

॥ হরিচরণদাস ॥

অদ্বৈত-প্রভুর অন্যতম শিষ্য হরিচরণদাস অদ্বৈতপ্রভুর জীবনী-সম্পর্কিত কাব্য 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচনা করেন।[১] কাব্যখানি 'পাঁচ অবস্থা' ও তেইশ সংখ্যায় সম্পূর্ণ। পাঁচ অবস্থায় যথাক্রমে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য লীলা বর্ণিত হয়েছে।

হরিচরণ দাসের কাব্যে বর্ণিত শেষলীলায় একটি অভিনব কাহিনী আছে। তিন প্রভু মিলে শান্তিপুরে একবার দান-লীলার অভিনয় করেন। কৃষ্ণের ভূমিকায় অদ্বৈত প্রভু, বড়াই এর ভূমিকায় নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীরাধার ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব।[১] এই কাহিনীর উল্লেখ আর কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং এই গ্রন্থের বর্ণনা শ্রীমুরারি, কবিকর্ণপুর ও

১ বা. সা. ই - পৃ - ২৭৫

বৃন্দাবন দাসের বিরুদ্ধ বলে গ্রন্থের প্রামাণিকতায় অনেক পণ্ডিত সন্দিহান[৫]। কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক ; কারণ 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ' এবং পূর্ব-সংস্কার (Convention) বর্জন করার অধিকার সকল কবিরই সমান। একই কারণে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে আজও অবহেলিত।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় পুথি-সংগ্রহে 'হরিচরণ দাস' ভণিতায় একটি রাগাত্মিক পদ পেয়েছি। পদটি উদ্ধৃত হলো—

রসিক নাগরিক রসের মরা। রসিক ভ্রমরী প্রেম পেআরা ॥
অবলা মুরতি রসের বান। রসে ডুবু ডুবু করয়ে প্রাণ ॥
রসবতি সদা হৃদয়ে জাগে। দরস বাড়াঞা পরস মাগে ॥
দরসে পরসে রস প্রকাস। আসা করে হরিচরণ দাস ॥

—৫খ ; ক ২৮৮

পদকল্পতরু গ্রন্থে পদটি 'চণ্ডীদাস'—ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।[১] পদটি আমাদের আলোচ্য কবি হরিচরণ দাসের লেখনীজাত না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক কারণ চণ্ডীদাসের রচনাশৈলীর সঙ্গে পদটির শৈলীর সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়।

॥ **অনন্তদাস** ॥

কবি অনন্তদাস অদ্বৈত আচার্যের অন্যতম শিষ্য।[২] ইনি কাটোয়ার মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।[৩] ইনি 'অনন্ত', 'অনন্তদাস'-ভণিতায় বাঙ্গালা ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন।[৪] 'দুখিয়া অনন্তদাস' সম্ভবতঃ এঁর ভণিতা। বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে অনন্ত ও অনন্তদাস ভণিতায় ৫টি অপ্রকাশিত পদ উদ্ধার করা হলো। একটি পদ নিয়ে উদ্ধৃত হলো ; অন্যান্য পদের প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' অংশে সন্নিবিষ্ট হলো।

কুলকলঙ্কিণী হইলু প্রাণের নাথ তোমার পিরিতি লাগি।
পিরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইবে হইবে বধের ভাগি ॥
ঘরে গুরুজন বোলে কুবচন তাহা নাকি তোমারে কই।
মনের দুখ যত ....তোমার কারণে এত সই ॥
মুঞি অভাগিনি কুলের রমণি শিরজিল কোন বিধি।

১ প. ক. ত - পদসংখ্যা - ২৩৯৩ ; ভণিতা - চণ্ডীদাস কহে রসবিলাস।
২ চৈ. চ—১/১২ ; ৩ ভক্তিরত্নাকর - ৯ম তরঙ্গ ; ৪ H. B. L - P - 73-73

এ দুটি নয়ান ভরি দেখিতে না পাই তোমা হেন গুণনিধি।
এক নিবেদন করি তুয়া পায় তুমি মোরে নিঠুর নয়া।
দাস অনন্ত কয় দিনে একবার দেখি হেন ঠাঞি রয়া॥

—৬৫ক ; বি ভা পুঁ—১৭৩৩

॥ অনন্ত আচার্য ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈত শাখায় একজন অনন্ত-আচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] এই গ্রন্থে আর একজন অনন্ত-আচার্যের উল্লেখ আছে। তিনি গদাধর-পণ্ডিত শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[২] এই দুই অনন্ত আচার্য অভিন্ন ব্যক্তি এবং পদকল্পতরু গ্রন্থে ধৃত ২২৮৫ সংখ্যক পদটি এঁর রচিত।[৩] পদটির ধ্রুবপদ অংশের পাঠে গোলমাল আছে। গৌরপদতরঙ্গিণীর পাঠ—শচীর নন্দন জগজীবন সার। জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার॥ ধ্রু॥[৪]
পদকল্পতরুর পাঠ 'জয় শচীনন্দন জগজীবন সার।' অথবা 'শচীর নন্দন জগ জীবন সার। জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার॥'
পদরসসারের পাঠ—'জয় শচীনন্দন গোরা' ইত্যাদি।

এঁর রচিত অন্যান্য পদগুলি পূর্বোক্ত 'অনন্ত' বা অনন্তদাস ভণিতায় মিশে গেছে।

॥ রায়-অনন্ত ॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে (পদসংখ্যা—২৩৩৭) 'রায়-অনন্ত' ভণিতায় একটি, ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে দু'টি (১১/২, ২৮/২) এবং গৌরপদতরঙ্গিণী গ্রন্থে তিনটি (পৃ-২৮, ১৭৪, ২৮৪) পদ উদ্ধৃত হয়েছে।[৫]

১ চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য॥ —চৈ. চ - আ - ১২/৫৮
২ পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য॥ —চৈ. চ - আ - ৮/৫৯
৩ প. ক. ত - ৫ ভূ - পৃ - ২০ ; গৌ. প. ত - ভূ - পৃ - ৭৩
৪ গৌ. প. ত - পৃ - ১৩
৫ ক্ষণদায় মুদ্রিত ১১/২ সংখ্যক পদের ভণিতা—"মাতিল জগত ভরি নিতাই চৈতন্য ধরি রায় অনন্ত মাগে বিন্দু।" পদটি পদকল্পতরুতে (পদসংখ্যা-২৫২৮) "অনন্ত"-ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

ইনি রসিকানন্দের শিষ্য নীলাচলবাসী ভক্ত-কবি। 'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থে এর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।[১] এঁর প্রায় সব পদই শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ-বন্দনা-বিষয়ক এবং ভক্তপ্রাণের আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ।

। বাসুদেব সার্বভৌম ।

বাসুদেব-সার্বভৌম ষোড়শ-শতকের বঙ্গীয় সংস্কৃতির দ্বিমুখী ধারার সঙ্গমস্থল। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই উভয় সাহিত্যের ধারা তাঁর মধ্যে সংযুক্ত হয়েছিল। এঁর পিতা বিশারদ-ভট্টাচার্য নবদ্বীপের প্রখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর মিথিলায় ছড়িয়ে পড়েছিল।[২] তাঁর প্রকৃত নাম—নরহরি বিশারদ।[৩]

বাসুদেব-সার্বভৌম এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি উভয়েই ছিলেন পিতার উপযুক্ত পুত্র। এঁদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূরবিস্তারী ছিল। সনাতন গোস্বামী এঁদের নিকট শিক্ষালাভ করেন।[৪]

বাঙ্গালাদেশে নব্য-ন্যায়ের ইতিহাসে 'বাসুদেব-সার্বভৌম' বা 'সার্বভৌম--ভট্টাচার্য' একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' গ্রন্থে সার্বভৌম-বিরচিত ন্যায় গ্রন্থের পূর্ণ বিবরণ প্রদান করেছেন। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের দু'টি শ্লোক এঁর রচনা বলে কথিত। শ্লোক দু'টি উদ্ধৃত হ'লো—

৪৪। বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ, শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ, পুরাণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

৪৫। কালাপ্রনষ্টকং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা।
আবির্ভূত স্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ॥
ইতি বাচয়িতা ভিত্তৌ বিলিখ্য দেবহস্তে দদাতি। (ভগবান আলোক্য বিদরিয়তি) ষষ্ঠো হঙ্ক পৃ - ৭৯

১ ক্ষণদাগীতচিন্তামণি - ভূ. পৃ - ১৯ ; ২ চৈ. প পৃ - ২৩৮
৩ বা. সা অ - পৃ - ৪০ ;
৪ চৈ প - পৃ - ২৩৯

এ ছাড়া, বিশ্বভারতী পুথিসংগ্রহে 'সার্বভৌম ভট্টাচার্য'-ভণিতাযুক্ত কয়েকটি স্তব পাওয়া যায়। রচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হ'লো—

পুথি সংখ্যা—১১৬ ॥ ৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

॥ **শ্রীরাধিকাষ্টক** ॥

স্মরণইন্দু নিন্দি মুখমণ্ডল কুন্তলে বিচিত্র বেণী পদ্মপুষ্প সোভনি ॥

নিল পট সোভে...... ...বন্দিঞা শ্রীপদযুগ বৃখভানুনন্দিনি ॥

... ...

খঞ্জন গঞ্জনিঞা আঁখি রঙ্গিম মৃহনি।

অঞ্জন রঞ্জিত তায় কামরস সমুনি ॥

তিল পুষ্প জিনি নাসা নিম্বফল দোলনি।

বন্দিঞা শ্রীপদযুগ বৃখভানুনন্দিনি ॥ ইত্যাদি।

॥ **শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক** ॥

উজ্জ্বল বরণ গউর বর[ণ] দেহ। নিরবধি বিলসতি ভারবি দেহ ॥

ত্রিভুবন পাবন কৃপা আনে সবে ত্বং প্রনমামিচ শ্রীসচিতনয় ॥

অরুনাম্বর ধর চারু কপোল। ইন্দু বিনিন্দিত নখচয় রুচির।

জপীঞা নিজগুণ নাম বিশদং।

এইরূপ আটটি চতুষ্পদী শ্লোকে রচনাটি সম্পূর্ণ। ভণিতাংশ—ইতি শ্রীসার্ব্বভৌম বিরচিতং শ্রীচৈতন্য গোস্বামীর অষ্টক সংপুর্ন্ন ॥

পদগুলি সংস্কৃত পদ্ঝটিকা ছন্দে রচিত এবং শব্দ-সঙ্গীত সৃষ্টিতে জয়দেবী শৈলীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

পুথি সংখ্যা—১৬৯৩ ॥ **মহাপ্রভুর অষ্টোত্তর শতনাম** ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। নমঃ কৃষ্ণ প্রিবক্ষামি দেবদেবং জগদগুরুং ॥

নামাষ্টোত্তর শতং পুন্যং মহপাতক নাসনং ॥

.. ..লক্ষ্মীকান্ত সুচীপুত্র প্রেমদা ভক্তবৎসল ॥ দ্বিজবর ভৈরবঃ ॥

প্রাণ নায়ক দ্বিজানি পুজক সান্ত শ্রীনিবাস ত্রিরেশ্বর ॥ তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গ সিংহগ্রীব মহাভুজ ॥ পিতবাসা বস্ত্র পট ॥ ....ইত্যাদি।

ভণিতা, —ইতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিরাখি[ত]ং শ্রীচৈতন্য নামাষ্টোত্তর শতং সম্পুর্ন্নং ॥ ১ ॥

পুথি সংখ্যা—৩৮৮৩ ॥ **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নামাষ্টত্তরশতং** ॥

বন্দনাংশ,

বন্দো অদ্বৈত চান্দ মনের সানন্দে। বন্দো নিতাই চৈতন্যের চরণারবিন্দে ॥

বন্দো অগ্রবোন নাম জাহার আগরা। জারে ব্রজবাসি বলেন রাজার দুরায়া ॥ প্রণমহো খিদ্রবোন আর সেজাবট। বন্দো সে কোকিলা বন তাহার নিকট ॥ লোহ বোন ভাণ্ডির বোন বন্দো-মাঠ গ্রাম। জাহাতে সদাই কৃষ্ণের ধেনুর বিশ্রাম ॥ ইত্যাদি।

ভণিতাংশ, —শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য বিরচিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামাষ্টত্তরশতং সম্পূর্ণ ॥ শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রায় নম ॥ প্রণমা শ্রীজগদ্বন্ধু নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ॥

এই জাতীয় রচনা শ্রীরাধানাথ কাপাসী সম্পাদিত 'বৃহৎ ভক্তিতত্ত্বসারে' মুদ্রিত হয়েছে। এই রকম অপরিণত রচনা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কি-না সে বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ বিদ্যমান। তবে এগুলি সার্বভৌমের প্রথম দিকের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চৌত্রিশা-স্তবের মতো আট, একশত আট ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে স্তব রচনা করা সেকালে বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্যতম রীতিতে পরিণত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীরূপ-গোস্বামীর রাধিকাষ্টক[২], কবিরাজ-গোস্বামীর বৈষ্ণবাষ্টক[৩], দ্বিজহরিদাসের শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম[৪] ইত্যাদি রচনা প্রণিধানযোগ্য।

বাসুদেব সার্বভৌম-শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের সময়ে বা অব্যবহিত পরবর্তি কালে পুরীধামে গমন করেন। উৎকলাধিপতি পুরুষোত্তমদেব (১৪৬৫ খ্রীঃ) ও প্রতাপরুদ্রদেবের (১৪১৬-১৫৩৯ খ্রীঃ) সভা সুদীর্ঘকাল অলংকৃত করার পর মহাপ্রভুর তিরোভাবের পূর্বে ১৫৩২ খ্রীঃ সার্বভৌম পুরী ত্যাগ করে বারাণসী গমন করেন। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও শতাধিক বর্ষ বয়সে ইনি জীবিত ছিলেন।[৫]

১ শ্রদ্ধেয় ডাঃ নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের বিবৃতি অনুসারে।
২ বি. ভা. পু - ২২৬১
৩ ঐ ৮৩৫ (পুথি পরিচয় - ২ পৃ - ৪৩১)
৪ ঐ ৭৪ (পুথি পরিচয় - ১ পৃ - ২৩১, ১১২১)
৫ বা. সা. অ - পৃ - ৪২

॥ নিত্যানন্দ-প্রভু ॥

গৌরভক্তগণের নিকট অদ্যাপি নিত্যানন্দ-প্রভুর নাম শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে এক পঙক্তিতে উচ্চারিত হয়। ইনি চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। এঁর পিতার নাম হাড়াই-পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝা। মাতার নাম পদ্মাবতী।[১] এঁর জন্মস্থান সম্পর্কে চৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে—'রাঢ় মধ্যে একচাকা নামে আছে গ্রাম। যহিঁ জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান।[২]

রাঢ়দেশে একচাকা নামে গ্রাম আছে দু'টি। একটি বর্তমান বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া রেলস্টেশনের অদূরবর্তী মৌড়েশ্বর থানার একচাকা; অধুনা (বাঁকারায়) বীরচন্দ্রপুর। অন্যটি বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত একচাকা।[৩] উভয় গ্রামই নিত্যানন্দ-প্রভুর পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত। উক্ত অঞ্চলদ্বয় একদা রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নিরূপণ সম্পর্কে একটি নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়।

কিন্তু, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত যদুনন্দন দাসের 'সংগ্রহতোষণী' গ্রন্থে নিত্যানন্দ-প্রভুর যে পরিচয় বর্ণিত হয়েছে তারমধ্যে এই সমস্যা সমাধানের সূত্র পাওয়া যায়। সংগ্রহতোষণীর বর্ণনা—

রাঢ়দেশ মধ্যে হয় পরগণে মৌড়েশ্বর। একচাকা খলোকপুর গ্রাম সর্ব্বপর ॥
দ্বিজের নন্দন হই ছয় সহোদর। পীতা হয় হাড় ওঝা পণ্ডিত সুসর ॥
পদ্মাবতি মাতা মোর পতিব্রতা সতি। স [প্র] গর্ভে জন্ম মোর কহিল প্রতিতি ॥
সুন্দরামল্ল বন্দীঘাটি পদবি নির্ণয়। পূর্ব্বাপর পরিচয় শুন মহাশয় ॥ - পৃ - ১০২-৩

সুতরাং 'পরগণে মৌড়েশ্বর' বা বর্তমানে ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত একচাকা গ্রামের দাবীই সুপ্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা,—মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কথোদূরে। যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে ॥[৪] এই মতের সমর্থক। যদুনন্দনের বর্ণনা অনুসারে, এঁরা ছয় সহোদর। এবং তিনি সপ্তম

১ চৈতন্যভাগবত - মধ্য - পৃ - ১১৬
২ চৈতন্যভাগবত - মধ্য - পৃ - ১১৬
৩ Census Report Burdwan - 1951
৪ বিশ্বভারতী পুঁথি - ৫৬৮০
৫ চৈতন্যভাগবত - মধ্য - পৃ - ১১৬

গর্ভের সন্তান। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের মতে, সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ঐতিহাসিক স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকর নিত্যানন্দকে চৈতন্যের সহোদর বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর মন্তব্য এই রকম—
" .. The eldest son's name was Bisvarupa, who is called Nityananda in the history of Chaitanya There were the only two sons of Jagannath and there were eight daughters who died young . .. . The father lived originally in Sylhet in Eastern Bengal, but had emigrated Nadia (Nabadipe) before the birth of Bisvarupa who is called Chaitanya."[১]

নিত্যানন্দ সম্পর্কে ভাণ্ডারকর মহাশয় পরিবেশিত এই সব তথ্যের উৎস কি তা জানা যায় না। আমাদের মনে হয় নিম্নোক্ত তথ্যের উপর নির্ভর করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

(১) ধর ধর ধর ধররে নিতাই আমার গৌরাঙ্গ ধর।
আষাড় সময়ে অনুজ বলিয়া বারেক করুণা কর ॥[২]
বাংলা দেশে প্রচলিত এই রকম অনেক পদে নিত্যানন্দকে চৈতন্যদেবের অগ্রজরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) শচীদেবী একবার চৈতন্যদেবের পাশে নিত্যানন্দ-প্রভুকে দেখে "দুইজন মোর পুত্র" রূপে কল্পনা করেছিলেন।[৩]

কিন্তু ১নং তথ্যটি নিছক কবিকল্পনা, ২নং তথ্যটি মাতৃহৃদয়ের অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে, নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীচৈতন্যের 'আত্মার আত্মীয়' বা 'আত্মিক অনুজ'। গৌড়ভূমে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে নিত্যানন্দের দান অতুলনীয়।

১ Vaisnavism, Saivism and minor Religious System - P - 83
২ পদকল্পতরু পদসংখ্যা - ২২৩২
৩ চৈতন্যভাগবত - পৃ - ১২৬

॥ শ্রীচৈতন্যদেব ॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'হরিনাম কবজ' নামক পুথিতে[১] চৈতন্যের জীবৎকালের পরিসংখ্যান বর্ণিত হয়েছে এইভাবে—

॥ শ্রীমহাপ্রভু ॥

আবির্ভাব	তিরোভাব
শক ১৪০৭	১৪৫৫

প্রকটলীলা ৪৮ বিতং ॥

গৃহে—২৪

বৈরাগ্য ২৪ বিতং

নীলাচলে ১৮

শ্রীবৃন্দাবন আদী তীর্থভ্রমণং ।।৬

শ্রীচৈতন্যদেব-রচিত নিবন্ধাদির তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'লো—

(১) শিক্ষাষ্টক—সংস্কৃতে রচিত আটটি উপদেশমূলক শ্লোক।

(২) প্রেমামৃতরসায়নম্—শ্রীচৈতন্যের মুখনিঃসৃত বলে কথিত এই গ্রন্থটি বিঠ্‌ঠল টীকাসহ মুদ্রিত হয়েছে।

(৩) শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল পরিহার স্তোত্রং

(৪) শ্রীরাধিকাষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রং

(৫) শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকং

এ ছাড়া, শ্রীচৈতন্যের নামে প্রচলিত, বিভিন্ন অনধিক সাতটি রচনার উল্লেখ আছে শ্রীহরিদাস দাস প্রণীত 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য'[৩] গ্রন্থে।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস-কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সবিস্তারে;

১ বিশ্বভারতী পুথি - ২৭৩২

২ বিতং > বিতারিখ—তারিখযুক্ত।

৩ গৌ. বৈ. সা - ৩/৩৬

কিন্তু অন্তর্ধান সম্পর্কে সর্ববাদীসম্মত সংবাদ পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলে বলেছেন, 'তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥'[১]

জয়ানন্দের মতে, আষাঢ় বঞ্চিতা রস বিজয়া নাচিতে। ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে ॥ ·······চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥[২]

নবাবিষ্কৃত দ্বিজমোহনদাসের 'ভক্তমালা'[৩] গ্রন্থের বর্ণনা বর্তমান প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। ইনি লোচনদাসের অলৌকিক কাহিনী এবং জয়ানন্দের বাস্তব বর্ণনার মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন। দ্বিজমোহনদাসের বর্ণনা অনুসারে,

বিচারী গেলা প্রভু টোটা গোপীনাথে। তথাতে জাইয়া প্রবেশিলা মন্দিরেতে ॥
যে কালে প্রভু মন্দির প্রবেশ হইলা। পণ্ডাগণ দেখে প্রভু মন্দিরেতে গেলা ॥
মন্দির বাহিরে পণ্ডাগণ বিচারয়। এতক্ষণ মন্দিরেতে প্রভু কি করয় ॥
এক পণ্ডা ভিতরেতে গেলা দেখিবারে। পণ্ডা কহে প্রভু নাই মন্দির ভিতরে ॥
...
সবে দেখে গোপীনাথ উজ্জ্বল বরণ। কি আশ্চর্য্য হৈল পুণ কহে পণ্ডাগণ।
... .
কেহ কহে এক অঙ্গে দেখি দুই জন। পণ্ডাগণ সেই মতে করে বিচারণ ॥
... ...
প্রভুর ভক্তগণ অনুমানে জানিলা। কহে মহাপ্রভু লিলা সমাপ্ত করিলা ॥

পৃ-১৬৫ক ; ৫৬১৯

বাসু ঘোষ একটি পদে বলেছেন,

কি করিব কোথা যাব বচন না সরে। হারাইনু গোরাচাঁদ গোপীনাথের ঘরে ॥[৪]

'গোপীনাথের ঘর'—অর্থে বাসুদেব অবশ্যই টোটার গোপীনাথের মন্দির বোঝাতে চেয়েছেন।

১ চৈতন্যমঙ্গল - পৃ - ১৮৮
২ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল - পৃ - ১৫০
৩ বিশ্বভারতী পুঁথি - ৩৭১১, ৫৭২৭, ৫৬১১, ৫৬১৯
৪ বাসু ঘোষের পদাবলী - ভূ. পৃ - ২৪

সুতরাং বাসুঘোষ, জয়ানন্দ এবং লোচনদাসের বর্ণনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, টোটার মন্দিরেই মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ ঘটে। আষাঢ় মাসে রথযাত্রায় রথাগ্রে উদ্দাম নৃত্যের ফলে চৈতন্যদেবের বাম পায়ে ইষ্টক খণ্ডে আঘাত লাগে। তারপর তিনি পারিষদগণের সঙ্গে জলক্রীড়া করেন, ফলে ক্ষত বিষাক্ত হয়। আষাঢ় মাসে শুক্লা-দ্বিতীয়াতে সাধারণতঃ রথযাত্রা হয়। তার পাঁচ-ছয় দিন পরে অর্থাৎ ষষ্ঠী-সপ্তমীর দিন লীলাবসান ঘটে। লীলা সংবরণের সময় সম্পর্কে জয়ানন্দ বলেছেন—'দশ দণ্ড রাত্রে'। লোচনদাস বলেছেন, 'তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিন।' এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তথ্য-সাপেক্ষ।

॥ স্বরূপ-দামোদর ॥ (জীবৎকাল আঃ ১৪৬৫-১৫৪০ খ্রীঃ)

শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বন ক'রে প্রথম যুগে যাঁরা কড়চা রচনা করেন শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর তাঁদের অন্যতম।[১] এঁর পূর্বনাম পুরুষোত্তম আচার্য। মুরারি গুপ্তের 'কড়চা', জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায়, স্বরূপ-দামোদর ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। ইনি নীলাচলে পৌঁছিলে মহাপ্রভু ভাবাবেশে বলেছিলেন, তুমি যে আসিবে তাহা স্বপ্নেতে দেখিল। ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥[২] বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা, সন্ন্যাসী পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়। দামোদর স্বরূপ সমান কেহো নয়।[৩]

স্বরূপ-দামোদরের মূল কড়চা সংস্কৃতে রচিত এবং একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ।[৪] মূল গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শ্লোকে সম্পূর্ণ।[৫] তন্মধ্যে দুটি শ্লোক চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত আছে।

১ বা. সা. ই - পৃ - ৩২৭

২ চৈতন্যচরিতামৃত - মধ্য - ১০/১২২

৩ চৈতন্যভাগবত - অন্ত - ১০

৪ গৌ. বৈ. সা - ২/৭৫

৫ মূল শ্লোক অষ্টাদশ কড়চা দেখিয়া।
তার অর্থ করিলাম পয়ার করিয়া ॥ -বিশ্বভারতী পুঁথি - ১৯৪৯

গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় 'আশ্রয়কল্পতরু' নামে।[১] বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'আশ্রয়কল্পতরু'র আর একখানি পুথি আছে।[২] পুথিখানির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হ'লো—

আরম্ভ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতো—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ ভণিতা, স্বরূপ দামুদর করেন এই তত্ত্বসার। প্রভু আজ্ঞায় মূল শ্লোকের করিল পয়ার॥

দামুদর স্বরূপ কহেন এই তত্ত্বসার। রামানন্দ মুখে ধর্ম্ম করিলা প্রচার॥
মূল শ্লোক অষ্টাদশ কড়চা দেখিয়া। আর অর্থ করিলাম পয়ার করিয়া॥
গোপনে রাখিবে গ্রন্থ শুন ভক্তগণ। সহজ রূপের ধর্ম্ম সর্ব্বদা গোপন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদ আশ। স্বরূপ দামুদর কড়চা করিল প্রকাশ॥
শ্রীরামানন্দ রায় মিলনে ভক্ত পূর্ণ রস কথনে রস পঞ্চানুসারে
রসরাজ মহাভাব দর্শন সংক্ষেপে কড়চা পঞ্চরূপ ইতি। ৬ ॥ ৩৮ ॥

স্বরূপ-দামোদর সম্পর্কে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বলেছেন, তিনি "সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।' কিন্তু কড়চা রচয়িতা রূপে কতখানি সার্থক সে সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করেন নি। কড়চার মধ্যে তিনি চৈতন্য দেবের জীবনের ঘটনাবলী এবং অন্যান্য তথ্য পরিবেশনে কতখানি সার্থকতা অর্জন করেছেন সে এক স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অন্তর্জীবনের পরিচয় প্রদানে 'স্বরূপ সূত্রকর্তা।[৩] তিনিই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

১ বিশ্বভারতী পুথি - ১৭০
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। আশ্রয়কল্পতরু বা গোস্বামী প্রবর স্বরূপ-দামোদরের কড়চা। শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত, শ্রীরাধাবল্লভ গোস্বামী কর্তৃক সংশোধিত এবং কার্ত্তিকচন্দ্র ধর এ্যাদারের 'সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী' হইতে শ্রীযুগলকৃষ্ণ চন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত। ১নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচ আনা। মুদ্রণের তারিখ নেই।

২ বিশ্বভারতী পুথি ১৯৮২। অত্যন্ত জীর্ণ ও কীটদষ্ট।

৩ চৈতন্যচরিতামৃত - অন্ত্য ১৪ / ১০

চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥

তাই প্রথম চৈতন্যচরিতকার মুরারি গুপ্ত জানিয়েছেন—

ততঃ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র স্বরূপাদৈঃ সমন্বতঃ।
শ্রীরাধাভাবমাধুর্যোঃ পূর্ণো ন বেদ কঞ্চন ॥[১]

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'স্বরূপ' ভণিতায় মনুজ ভাবানুসার[২] ও পদাবলী[৩] এবং 'দামোদর' ভণিতায় 'শ্রীসিদ্ধান্ত করচা গ্রন্থ' নামক কয়েকটি রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। রচনাগুলি অজ্ঞাতপূর্ব হওয়ায় নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হ'লো—

পুথি সংখ্যা ৩৪৭২। মনুজভাবানুসার। খণ্ডিত

আরম্ভ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তি ॥ শচীগর্ভ্যা শ্রীতৌ............গৎ ভগবান হরিরীশ্বর ॥ যুগধর্ম্মহেতু কার্যাং প্রেমদাস ধাদাস্বয়ং ॥ অন্তে কৃষ্ণ বহি গৌরঃ রাধা প্রেম বিলং সদাঃ রাধাভাব অঙ্গীকারং বন্দেতং বন্দেতং শ্রীগৌর বিগ্রহং ॥ ২ ॥

নন্দিযথা ॥ পরমকারণং কৃষ্ণগোবিন্দস্যপরাৎপরং বৃন্দাবনে স্বরনিত্যাং নিগু'ণসোপীকারণং ॥ ৩ ॥

বন্দনা অংশ ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান। জয় নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণ প্রাণ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য জয় স্বরূপের প্রাণ। সাক্ষাত স্বরূপ দেহে জেহো বর্তমান ॥
বর্ত্তমানে সাধক সাধিব কোন জনে। সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসিল রামানন্দের স্থানে ॥
রায় রামানন্দ হয়ে সখি পূর্ব্বেই বিসখা। মহাপ্রভু তার স্থানে তত্ত্ব কৈলা সিক্ষা ॥

রচনার অংশ-বিশেষ—

বৈকুণ্ঠ গোকুলপার নিত্যস্থান হয়ে। মানুষ শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাহে বিরাজয়ে ॥
জাহা হৈতে ভগবান স্বয়ং প্রকাশিল। কৃষ্ণ হইতে নিতাস্থান উদ্ভব করিল ॥
সেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রমন কালেতে। শক্তিপদ্ম হৈতে প্রকাশিলে আচম্বিতে ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ হএ তীন শক্তিসার। সৎ চিৎ আনন্দরূপ আহ্লাদ তাহার ॥

১ চৈতন্যচরিতামৃত - ৪।২৪।১
২ বিশ্বভারতী পুথি - ৩৪৭২
৩ ঐ ঐ - ২১৭১
ঐ ঐ - ৪০১৪

অতএব তারে বলি কৃষ্ণের স্বরূপ। আহ্লাদাংশে কারণে এক ধরে তীনরূপ ॥
আনন্দাংশেতে তার আহ্লাদ জন্মিল। আহ্লাদিনী বলি নাম তেঞ্রী সে হইল ॥
... ...

ভণিতা,

এই ত কহিল স্বয়ং মানুষ আভাষ। কহেন স্বরূপ তেঁহো চৈতন্যের দাস ॥
ইতি শ্রীমনুজভাবানুসারে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সংবাদে নির্গুণ মানুষ
স্বয়ং তত্ত্ব প্রথমঃ আভাস ॥ ১ ॥

পুথি সংখ্যা-৫০১৪। শ্রীসিদ্ধান্ত কড়চা গ্রন্থ। খণ্ডিত। পুষ্পিকা পত্র।
········ । [ক] রহ কৃষ্ণের পূজা বাক্য কায় মন ॥
আজি কাল করিঞা দিবস গেল বঞা। আশীঞা জমের দূত কহে············ ॥
তাহা নাহি জানে মাতা মায়া মুগ্ধ হঞা। আপন আপন করে কৃষ্ণ পাশরিঞা ॥
·············· । দিবস অন্তেতে কেহ কৃষ্ণ নাহি কয় ॥
দিবসে জে কার্য্য কৈল পুন তাহা কয়। কহিতে কহিতে রাত্রি প্রহরেক হয় ॥
ভোজন করিঞা পুন করয়ে শয়ন। প্রাকৃতি সহিত রাত্রি করে জাগরণ ॥
... ...

পুত্র পুত্র কর মাতা কিশের কারণ। কৃষ্ণ বলি ডাক মাতা সফল জনম ॥
জে বাপের কোলে পুত্র দোলে মহা শুখে। ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে ॥
এবে জারে মান্য করি করি মান্য জ্ঞান। ধাতু গেলে পরসিলে ছুলে করি স্নান ॥
জাবত আছএ কৃষ্ণ দেহে আছে সক্তি। তাবত করহ কৃষ্ণ পদে দৃঢ় ভক্তি ॥
... ...

শুনি শচিমাতা শোক কৈল সম্বরণ। দামুদর স্তব করে শুনে সর্ব্বজন ॥
একদিন অদ্বৈত প্রভু সচির ভবনে। দামুদরে জিজ্ঞাসিল·· · · ··· ॥
অর্জ্জুনেরে কিবা শিক্ষা দিল নারায়ণে। ভাগবতে ব্যাশরূপে কি কৈল বিবরণে ॥
বিস্তারিত কহ পণ্ডিত শুনিতে হয় মন। দামুদর কহে শুনে নদ্যাবাসী ভক্তগণ ॥

নিত্যানন্দং অদ্বৈতম সহ দামুদর পণ্ডিত সংকথনং ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত কড়চা গ্রন্থ সমাপ্তী ॥ শকাব্দ ১৭৩১ সন ১২১৬ তারিখ ২৭ পৌশ শুক্লা চতুর্থী সোমবার। দামুদর পণ্ডিত মুখাদ স্মৃতং। বিদিতং নবদ্বীপ ভক্তাদী শ্রবনং কথিতং স্বাং ॥ ইতি শ্রীপ্রকট শৈচব বিদিতং ॥ প্রকটভাং পরমানন্দ স্বরূপং সনাতনং ভক্তানুগ্রহং। বিদিতং দামুদর পণ্ডিতং মুখাদম্বতং পিবন্তি নবদ্বীপাদি ভক্ত শ্রবনং কথিতং স্যাং ॥ ইতি ॥

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর শোকসন্তপ্তা শচীদেবীকে সান্ত্বনা দান গ্রন্থখানির বিষয়। পুষ্পিকাংশ থেকে মনে হয় রচনাটি চৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পারিষদ দামোদর-পণ্ডিতের হওয়া সম্ভব। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দামোদর-পণ্ডিতকে নবদ্বীপে প্রেরণ করা হয়। এঁর সাহিত্য রচনার কোনো নিদর্শন ইতোপূর্বে পাওয়া যায় নি।

বিশ্বভারতী পুঁথি সংগ্রহে 'স্বরূপ'-ভণিতায় আটটি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদ পাওয়া গেছে। পদগুলি ব্রজবুলিতে রচিত এবং অজ্ঞাতপূর্ব। ভাবের গৌরবে প্রত্যেকটি পদ অসামান্য; ভাষায় প্রাচীনতার চিহ্ন স্পষ্ট। পদগুলি স্বরূপ-দামোদরের রচনা হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে। নির্দশন স্বরূপ একটি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো, অন্যান্য সাতটি পদের প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' তালিকাভুক্ত করা হলো।

পূর্ব্বরাগ ॥ যাকর মধুর অধর পরিপূরিত মুরলী আলাপন গীত।
সুনি তনু বিবস দিবস নিশি মানস ঝুরত নহে স্তীরপিত ॥
সজনি কৈছন সুপুরুখ শ্যাম।
চেতন চীত নিত গুরু গৌরব চোরাওল যাকর নাম ॥
জছু গুন রতন শ্রবন বিভূষণ মুরতি যার সমান।
হেরইতে নারীকুল বারী সে ভারত পরিহরি নিজ অভিমান ॥
কিএ নিরন্তর মামক অন্তর উপজল দারুন বাধা।
সমনে ভুবন ভরি হোয়ব কুয়শ তছু বিনু সংশয় রাধা ॥
বিপুল কুলাচল চপল পরিজন দুরজন ননদীনি মোর।
স্বরূপে কহই সখি কৈছনে ভেঠব নাগর নন্দকিশোর ॥

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে 'দামোদর'-ভণিতায় একটি চৈতন্য-বিষয়ক ও দুটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ আছে।[১] ভাব ও রচনাশৈলীর বিচারে পদগুলি নিতান্ত সাধারণ। পদগুলি 'দামোদর' নামধেয় পরবর্তিকালের কোনো কবির রচনা।

১ বৈষ্ণব পদাবলী - পৃ - ১০৩২

॥ নরহরি সরকার ॥

'নরহরি দাস' নামে দু'জন বিখ্যাত কবি বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একজন 'নরহরি সরকার' বা শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুর। অন্যজন 'নরহরি চক্রবর্তী' বা ঘনশ্যাম। ইনি ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা ও পদকর্তা[১]। আমাদের আলোচ্য নরহরি সরকার।

পঞ্চদশ শতক থেকেই শ্রীখণ্ড বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। শ্রীখণ্ডের সঙ্গে গৌড-দরবারের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। এখানকার বৈদ্য-অধিবাসিগণ অনেকেই গৌড় দরবারে পদস্থ কর্মী ছিলেন। নরহরি সরকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ ছিলেন স্বয়ং হুসেন-শাহের খাস-চিকিৎসক। পঞ্চদশ শতকে গৌড়-দরবারে বাঙ্গালী কবি বিশেষ সমাদর পেতেন এবং বাংলায় কৃষ্ণায়ণ কাব্যের চর্চা হতো সেখানে।[২] গৌড দরবারের সংস্পর্শে এসে ষোডশ শতকে অনেক কবিই পদ রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন।[৩]

ষোড়শ শতকের প্রায় প্রথম থেকেই চৈতন্য নিত্যানন্দের অনুগ্রহ প্রাপ্ত মুকুন্দদাস, নরহরি ও রঘুনন্দন—এই তিন মহাজনের প্রভাবে শ্রীখণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। শ্রীখণ্ডের মোহান্তদের মতবাদে প্রথম থেকেই স্বাতন্ত্র্য ছিল।[৪]

নরহরি-সরকার গৌরাঙ্গ পূজার অন্যতম প্রবর্তক। ইনি শ্রীখণ্ডে ছ'টি শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন; তারমধ্যে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ-প্রভুর মূর্তি অন্যতম।[৫] ইনি গৌর-গদাধর পূজা ও নাগরী ভাবের উপাসনার প্রবর্তক। ইনি সঙ্গীতাকারে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ক্ষুদ্রাঃতন পদরচনা আরম্ভ করেন। এর থেকেই পরবর্তিকালে গৌরচন্দ্রিকা পদের সৃষ্টি হয়। ইনি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে গৌরাঙ্গাষ্টমালিকা নামে গৌরাঙ্গ পূজা বিষয়ক ছোট নিবন্ধ রচনা করেন।

১ H B. L - P - 32 - 34
২ ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা যশোরাজ খান এবং গোবিন্দদাস কবিরাজের মাতামহ শ্রীখণ্ড নিবাসী দামোদর এক ব্যক্তি।
৩ বা. সা. ই - পৃ - ২৩৯
৪ বা. সা. ই - পৃ - ২৯৯
৫ H. B. L. - 32 - 34

'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল' ও ভক্তামৃতাষ্টক নরহরি সরকারের সংস্কৃত রচনা। ব্রজবুলিতে এঁর কয়েকটি পদ আছে।[১]

নরহরিদাস ভণিতায় এ পর্যন্ত অনেক রাগাত্মিক বা সহজ সাধন ঘটিত পদ পাওয়া গেছে।[২] বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'নরহরিদাস' ভণিতায় সহজ ভাবের একটি প্রহেলিকা পদের সন্ধান পেয়েছি। পদটি অপ্রকাশিত; নিম্নে উদ্ধৃত হ'লো—

চৈতন্যের কথা শুনি কহে নিত্যানন্দ।
মাকে ছাড়্যা বাপকে ভজ ঘুচ্যা জাবে ধন্দ ॥
প্রাণের ভিতর জলের মরাই কাছিম সাপে ধরে।
সাপের মাথায় হাঁসের ডিম্ব হরিণ তাতে চরে ॥
ভূতের বাড়িতে ফুলের বাগান পাতে পাতে মায়া।
জলের ঘরে আগুন দিয়া বাতুল দেখে চায়্যা ॥
খেপার কথায় হাসি পড়িল মাকষার জালে।
তা শুন্যা চৈতন্য হাসে নিত্যানন্দ বলে ॥
সাধ কর‍্যা ঘর কর‍্যাছি ঘর কর‍্যাছি নটা ॥
ভূতের ঘরে আগুন জ্বলে গালিম (?) আছে ছট্যা ॥
বোবা কহে কালা শুনে[৩] কানা দেখে রঙ্গ।
নরহরিদাস কহে কর সাধুসঙ্গ ॥

আপাতদৃষ্টিতে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক "এই পদগুলি নরহরি সরকারের লেখা না হওয়াই সম্ভব"।[৪] কারণ, নরহরি সহজিয়া কবি ছিলেন না। কিন্তু একদা শ্রীখণ্ড অঞ্চলে তান্ত্রিকতার প্রাধান্য ছিল। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, কেতুগ্রামের বহুলা, অট্টহাসের ফুল্লরা, উজানি-মঙ্গলকোটের শাকম্বরী ও ভ্রামরী চণ্ডী প্রভৃতি শাক্ত-তান্ত্রিক দেবীগণ শ্রীখণ্ড অঞ্চলকে বেষ্টন করে আছেন। গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত গ্রামদেবী কালী, পশ্চিমে দেবী খণ্ডেশ্বরী ছাড়াও পঞ্চমুণ্ডির আসন বলে কথিত একাধিক তান্ত্রিক সাধন পীঠ রয়েছে শ্রীখণ্ডে।

১ H. B. L. - P - 32 - 33
২ বা. সা. ই - পৃ - ২৯১
৩ তু. গুরু বোব সে সীসা কাল। চর্যা নং—১
৪ বা. সা- ই - পৃ - ২৯১

কাজেই স্থান-মাহাত্ম্যে তাঁর রচনায় সহজিয়া বা তান্ত্রিক প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। নরহরি-শিষ্য লোকানন্দ রচিত 'ভক্তিচন্দ্রিকায়' যে উপাসনা-পদ্ধতির নির্দেশ আছে, তার মধ্যে তান্ত্রিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রাধান্য দেখা যায়। স্বয়ং নরহরি ঠাকুরই নাকি এই উপাসনা-পদ্ধতির কথা নিজে মুখে বলে গিয়েছিলেন![1] এছাড়া, নরহরি সরকারের 'কি না হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি', 'সই কত না সহিব ইহা', 'রসের ভ্রমরা মোর গোরা', বামেতে ডাহিনে সমুখে পিছনে জলের ভিতরে গোরা' প্রভৃতি পদে নাগর ভাবের ভজন পদ্ধতিতে সহজ সাধনার প্রভাব সুস্পষ্ট। সুতরাং নরহরি ভণিতায় সহজ সাধনের পদগুলি নরহরি সরকারের লেখনীজাত হওয়া অসম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, 'নরহরিদাস' নামে স্বতন্ত্র সহজিয়া কবি থাকাও সম্ভব।

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'নরহরি' ভণিতায় এগারোটি অজ্ঞাতপূর্ব পদ পাওয়া গেছে; নিম্নে একটি পদ উদ্ধৃত হ'লো; দশটি পদের প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত-পদ সংগ্রহে' অংশ দেওয়া হ'লো।

প্রেমের ভাই আলি নিতাই রে তুমি মোর দেহ ব্রজবাস রে।
ব্রজ দরশন বিনু না রহে আমার তনু প্রাণ কান্দে করিব সন্যাশ রে।
আমি জাব বৃন্দাবন রাখিতে গোপীকার মন তুমি থাক শ্রীগৌরমণ্ডলে।[2]
দুই ভাই বৈরাগী হলো জীবে কে তরাবে কল্যে কে আর লওয়াবে হরি নাম রে।
তুমি থাক গৌড়দেশে ভাশাইয় প্রেমরশে ঘরে ঘরে দিহ হরিনাম।
প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হল্য অন্ধ কেহো ত না পায় কৃষ্ণনাম॥
এই নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে জারে কৃপা করি দিয় হরিনাম॥
কৃত পাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ড আর কেহু জেন বঞ্চিত না হয়।
সমন করিয়া ভয় যেন জীবে না হয় শুখে জেন কৃষ্ণনাম নয়॥ ১॥
রসে অঙ্গ ঢর ঢর গৌর কীশোর বর নাম তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এ সব নিগুঢ় কথা কহিতে লাগয়ে বেথা ভক্ত বিনু না জানএ অন্য॥
দ্বাপর যুগে শ্যাম কলিযুগে গৌরাঙ্গ গর্গমুনি ভাগবতে লেখি।
মনে করি অনুমান স্যাম হল্যা গৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ তনু তার সাখি॥

১ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি - পৃ - ২৮৮ - ৯৩
২ লিপিকর প্রমাদে কয়েকছত্র বাদ গেছে।

অন্তরেতে শ্যাম তনু বাহিরে গৌরাঙ্গ তনু অপরূপ অদভুত লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কৃষ্ণ রূপ বিলাসীতে অনুরাগে শ্যাম হল্যা গোরা।
কহিবার কথা নয় কহিলে কী জানি হয় না কহিলে মনে পাইয়ে তাপ।
হেন অনুমান করি গৌরাঙ্গ হ্রিদয়ে ধরি নরহরি করয়ে বিলাপ ॥ ১ ॥ ২ ॥
ইতি ॥ শ্রীনিত্যানন্দ ॥ জয়তী ॥

॥ রঘুনন্দন দাস ॥

রঘুনন্দন গৌড়ের পাঠান-নৃপতি হুসেন শাহার চিকিৎসক[১] মুকুন্দের পুত্র ; নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ইনি আশৈশব অকুণ্ঠ চৈতন্যভক্ত ছিলেন।

চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের মতো রঘুনাথের জন্মবৃত্তান্ত লোকশ্রুতিজাত অলৌকিকতার কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন।[২]

রঘুনন্দনের উৎসাহে শ্রীখণ্ডে একটি কীর্তনের দল গড়ে উঠেছিল ; সে সম্প্রদায় 'খণ্ডের সম্প্রদায়' নামে খ্যাত।

॥ কবিরঞ্জন ॥

রামগোপাল দাস তাঁর 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে কবিরঞ্জন নামে একজন কবির পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত বর্ণনা অনুসারে, কবিরঞ্জন জাতিতে বৈদ্য এবং শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। ইনি শ্রীখণ্ডের নরহরির পুত্র রঘুনন্দনের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। ইনি সুকবি। 'প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দঢ়'[৩] অর্থে শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক পদ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু 'কবিরঞ্জন' ভণিতায় এ পর্যন্ত যে সকল পদ পাওয়া গেছে তার মধ্যে চৈতন্যবিষয়ক পদ পাওয়া যায় দু'টি। এঁর অধিকাংশ পদ-ই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। ব্রজবুলি ভাষার সার্থক প্রয়োগ, রচনাশৈলীর সাদৃশ্য অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক 'ছোট বিদ্যাপতি' রূপে এঁর খ্যাতি ছিল। ফলে এঁর অনেক পদ 'বিদ্যাপতি'-ভণিতায় চলে গেছে।[৪] রসকল্পবল্লীর বর্ণনা অনুসারে কবিরঞ্জন 'রাজসেবী' অর্থাৎ রাজ-দরবারে কাজ করতেন।[৫]

১ অন্তরঙ্গ
২ শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব - পৃ - ১৬, ৪৫
৩ শাখানির্ণয় - পৃ - ২১৪
৪ কবিরঞ্জনের 'চরণ নখর মণি রঞ্জন ছান্দ' পদটি পদকল্পতরু (পদসংখ্যা - ৪৫২) গ্রন্থে 'বিদ্যাপতি' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।
৫ রসকল্পবল্লী - পৃ - ১৬৭

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'কবিরঞ্জন'-ভণিতায় অনেক পদ পাওয়া যায়। অপ্রকাশিত বিবেচনায় সমগ্র পদটি উদ্ধৃত হ'লো—

মৃজিল বলয়া মকুর মুখমণ্ডল কাজরে ভাজল আঁখি।
অধর পোঙার দশন মুকুতাফল হাসি কুন্দ ভেল সাখি ॥
সুন্দরী আনন্দে চলু বনমালি।
যদি বর নাগরি সমুখে ডাণ্ডাওলি কি ফল মঙ্গল ডালি ॥ ধ্রু ॥
কুচ দাড়িম ফল কণ্ঠ কম্বু ভেল তনুরুচি হরিণ রেহা।
যৌবন ঝলমল রতন দীপ কি ফল.........করব সন্দেহা ॥
কহ কবিরঞ্জন ত্রিপুরচরণ মন আন কহ উজলু আন।
গুরুয় নিতম্ব পন্থ রোধব হোত্তত কওল পয়ান ॥ -৩০ক ; ১৭৩৩

বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'পদমেরু' নামক প্রাচীন পদসংকলন গ্রন্থে কবিরঞ্জন ভণিতায় আর একটি অপ্রকাশিত পদ আছে। পদের প্রথম ছত্র—কি কহব রাইয়ের গুণের কথা।[১]

কবিরঞ্জন রচিত 'চরণ নখর মণি রঞ্জন ছান্দ' পদটি শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীপ্রফুল্ল পাল-সম্পাদিত 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থে পাঠ আছে—'চরণ নখর মণি রঞ্জন ছান্দ'।[২] কিন্তু শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থের পাঠ 'চরণ নখ রমণি রঞ্জন ছান্দ।[৩] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই পদটি বিশ্বভারতী সংগ্রহের একটি পুথিতে[৪] পাঠ পাওয়া গেছে 'চরণ নখর মুণি রঞ্জন ছান্দ'। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-ধৃত পাঠটি সঙ্গত বলে মনে হয়।

॥ মুরারি গুপ্ত ॥ (জন্ম আঃ ১৪৮০ খ্রীঃ)

শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' সংস্কৃতে রচিত ; রচয়িতা মুরারি গুপ্ত। শ্রীবাসের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহের কাজে। তাঁরই নির্দেশে নদীয়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত মুরারি গুপ্ত সংস্কৃতে চৈতন্যজীবনী রচনা করেন।[৫]

১ শ্রীপদমেরু গ্রন্থ - পৃ - ২৪০
২ রসকল্পবল্লী - পৃ - ২১২
৩ বৈষ্ণব পদাবলী - পৃ - ২২৮ ;
৪ বিশ্বভারতী পুথিসংখ্যা - ৪৩০৪ ;
৫ চৈতন্যচরিতামৃত পৃ - ১০৮ - ১১

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' রচনার তারিখ নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ আছে। মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পুষ্পিকা-শ্লোক অনুযায়ী গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ 'চতুর্দ্দশ শকাব্দান্তে পঞ্চবিংশতি বৎসরে, আষাঢ় সিত সপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতায় গতঃ।' অর্থাৎ ১৪২৫ শক বা ১৫০৩ খ্রীঃ। কিন্তু পুষ্পিকা-শ্লোকের পাঠান্তর—পঞ্চত্রিংশতি বৎসর। তা'হলে তারিখ দাঁড়ায় ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩ খ্রীঃ।[১] কিন্তু গ্রন্থমধ্যে আরও পরবর্তিকালের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। অনেকের ধারণা রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। রচনাকাল যাই হোক, মুরারি গুপ্তের কড়চাই চৈতন্যজীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত প্রথম গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থই ষোড়শ শতকে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রায় সকল চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল।[২]

মুরারি গুপ্তের বাঙ্গালা পদ-ও আছে।[৩] ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, মুরারি গুপ্ত, মুরারি, গুপ্ত ও 'গুপ্তদাস' ভণিতার পদগুলি এই মুরারি গুপ্তের রচনা।[৪] কিন্তু পদকল্পতরু গ্রন্থে 'মুরারি গুপ্ত' ও 'মুরারি' নামে দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির পদ আছে।[৫]

মুরারি গুপ্তের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে; তিনি জাতিতে বৈদ্য। শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করে তাঁরা নবদ্বীপে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এঁরা ছিলেন চৈতন্যদেবের প্রতিবেশী। গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে মুরারি ছিলেন চৈতন্যদেবের উপরের শ্রেণীর ছাত্র। মুরারি গুপ্ত সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি—

শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য তার॥

১ গৌ. প. ত (২য় সংস্করণ) ভূ. পৃ - ২৩০

২ বা. সা. ই - পৃ - ২৩৭

৩ গৌ. প. ত. - পদসংখ্যা - ৩৩, ৫৫, ১১৪, ১৭৯, ২৪৬; ৪৭; পদকল্পতরুতে মুরারি গুপ্ত ভণিতায় - ২২৩১, ২২৩৫, ২৩২৪ সংখ্যক। মুরারি ভণিতায় - ৭৫১, ২১২১ সংখ্যক; ভক্তিরত্নাকর - ১২/৩০৩৮

৪ H B. L - P - 29

৫ পদকল্পতরু - ৫ম খণ্ড - পৃ - ৫৪

প্রতিগ্রহ না করে না লয় কারো ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ॥
চিকিৎসা করেন তারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥[১]

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে মুরারি দাস ভণিতায় একটি বাৎসল্য রসের পদ পাওয়া গেছে। অ-পরিজ্ঞাত হওয়ায় সমগ্র পদটি উদ্ধৃত হ'লো—

দেখ মাই বন হইতে আওয়ে গোপালা। আরতি সাজি চলে ব্রজবালা॥
গোখুর ধুলি অঙ্গে লপটাই। গোচরণকে তিলক বনাই॥
পীত বসন বৈজন্তিকি মালা। শ্যামসুন্দর কর নয়ন বিশালা॥
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর সোহে। নটবর বেসে বসন মন মোহে॥
মন্দ মধুর ধ্বনি বেনু বাজায়ে। গোধন সঙ্গে নিকেতন আওয়ে॥
কঙ্কণ কলস সখি……বৈধায়ে। গোকুলে আনন্দ বাধাই বাজায়ে॥
নন্দ যশোমতি দেখল আয়ে। দাস মুরারি পরম পদ গাওয়ে॥

—পৃ - ১৩১খ, ১৭৩১

বিশ্বভারতী সংগ্রহের পদমেরু গ্রন্থের 'গোপ্ত' ভণিতাযুক্ত অপ্রকাশিত পদগুলি মুরারি গুপ্তের হওয়া সম্ভব।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের ৩৩৪৪ সংখ্যক পুথিতে 'মুরারি'-ভণিতায় 'কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার' পদটি পদকল্পতরু[২] ও বৈষ্ণবপদাবলী[৩] গ্রন্থে বিদ্যাপতি (বাঙ্গালী-বিদ্যাপতি) ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

॥ **সনাতন-গোস্বামী** ॥

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তরাপথে বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহায়ক ছিলেন সনাতন-গোস্বামী ও শ্রীরূপ-গোস্বামী। এই দুই ভাই রামকেলিতে বাস করতেন। এঁরা হোসেন শাহের অতি বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। সনাতন রাজ-দরবারের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রজা সাধারণের কাছে তিনি সাগীর মালেক (ছোট প্রভু বা মালিক) রূপে পরিচিত। এঁদের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন দাক্ষিণাত্যবাসী।

১ চৈতন্যচরিতামৃত - ১। ১০
২ পদসংখ্যা - ১৯৫৮;
৩ বৈষ্ণবপদাবলী - পৃ - ১২৩

বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'হরিনাম কবজ' নামক পুথিতে[১] সনাতন গোস্বামীর জীবৎকাল বর্ণিত হয়েছে—

শ্রীসনাতন গোস্বামী। জন্ম—সকাব্দা : ১৪১০
অপ্রকট—সকাব্দা : ১৪৮০
প্রকটলীলা ৭০ বিতং
গৃহে ২৭ বৃন্দাবনে ৪৩

সনাতন গোস্বামী তাঁর 'দশম-টিপ্পনীতে' লিখেছেন—

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন গুরুন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভূষণম্। ২০৬॥

বিদ্যাবাচস্পতির নিকট শিক্ষালাভের ফলে তাঁরা বিদ্যানুরাগী ও ভক্তিমান হয়েছিলেন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তাঁরা নিয়মিত শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রচর্চা করতেন।

সনাতন গোস্বামীর সাহিত্যকর্মকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায় (১) টীকা-অনুবাদ ইত্যাদি (২) বৈষ্ণবতত্ত্বনিবন্ধ এবং (৩) দোহাবলী সনাতন গোস্বামী-রচিত গ্রন্থাবলী—

(১ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও দিগদর্শনী টীকা
(২) শ্রীবৃহদ্-ভাগবতামৃত ও টীকা
(৩) লীলাস্তব বা দশমচরিত
(৪) শ্রীদশমটিপ্পনী বা তোষণী

এ ছাড়া, লঘুহরিনামামৃত-ব্যাকরণ সনাতন-রচিত বলে প্রকাশ। মতান্তরে, এটি শ্রীরূপ-গোস্বামীর রচনা।

India office catalogue-এ (Vol—VII. P—1422-23) সনাতনের ভণিতায় 'তাৎপর্যদীপিকা' নামক টীকা গ্রন্থের উল্লেখ আছে। Madras Oriental Mss Library Catalogue (Vol IV Part-I Sanskrit A. R. No. 3053, a-47)-এ গোপালপূজা নামক পুঁথিটি সনাতন-নামাঙ্কিত।[২]

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে সনাতন ভণিতায় রসকৌমুদী নামক একটি পুথির সন্ধান পেয়েছি। রচনাটি অজ্ঞাতপূর্ব হওয়ায় কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'লো—

১ পুথিসংখ্যা - ২৭৩২
২ গৌ. বৈ. সা - ৩। ১৮

পুথি-সংখ্যা ১৭০৩। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা-৬। খাতার আকারে বাঁধানো। ভণিতা, শ্রীগুরু পাদপদ্ম হৃদে করি ধ্যান। শ্রীরসকৌমুদী কহে সনাতন ।।
পৃ—২৬২

আরম্ভ,

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা মাত্র ।। অথ রসকৌমুদী গ্রন্থ লিখ্যতে ॥
ভক্তের কারণে আমি করিনু অনুমান। মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর চৈতন্য ভগবান ॥
শ্রীরূপ সনাতনে যেই কথা হইব। সেই সব কথা ভক্তে শুনিতে মন গেল ॥
রসবস্তু কারে বলি কোথা হইতে আসে। সহস্রদল পদ্ম ছাড়ি বস্তু অষ্টদলে আইসে ॥
শুনি কহি শোণিত শুক্রে জীবের জন্ম। বাহ্য ব্যাখ্যান করে নাহি করে মর্ম্ম ॥
... ...
ক্লীং শ্রীং দুই বীজ দেখ প্রেমের সংহতি। মানুষ বিহঙ্গ রূপ রসের মূরতি ॥
সেই বিন্দু দুই হয় প্রকৃতি পুরুষ। দুই বীজ দুই মুরতি সহজ মানুষ ॥
সহজেতে আইসে বস্তু সহজেতে যায়। সহজ করিয়া পূর্ণ সহজেতে রয় ॥
সহজ বস্তু বলিয়া বর্ণিল সর্ব্বজন। কেমন বিলাস তার কেমন গঠন ॥

পুষ্পিকাংশ : ইতি সন হাজার ৭৮ সাল তারিখ ১৭ই সতরঙ আষাঢ় সাকিম শ্রীদক্ষিণখণ্ড। লিখিতং শ্রীপদ্মনাভ ঠাকুর জীউ ॥ ১লা আশ্বিন নকল হইল। ৺নৃসিংহ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দপ্তর হইতে সংগৃহীত। শ্রীপ্রফুল্ল মোহন চট্টরাজ ১৩৩৯ সাল। দক্ষিণখণ্ড। বনওয়ারীবাদ। জেলা—মুর্শিদাবাদ।

এ রচনা সনাতন গোস্বামীর নয়। পরবর্তিকালের 'সনাতন গোঁসাই' নামধারী কোনো সহজিয়া সাধকের রচনা।

সনাতন ভণিতায় অনুরূপ একটি রচনা আছে বিশ্বভারতী সংগ্রহে।[১] রচনাটি নিম্নরূপ—

৺৭ শ্রীরাধাবিনোদ জীউ ।।
বেদ মহোদধি মথন করিল জতনে গোসাই রূপ।
পিরিতি রতন তাহে উপজিল সকল মতের ভূপ ॥
সে মত আচরি পাবে ব্রজপুরি সখির অনুগা হঞে।
রাধিকা মাধবে তবে সে মিলিবে দেখ মনে বিচারিয়ে ॥

১ বিশ্বভারতী পুথিসংখ্যা - ৩২২১

সখি পিরিতি অধিক কানু।
পিরিতি বিহনে পাইব কেমনে ভাবিতে গুনিতে মনু॥
কহে সনাতন রূপের গঠন সহজে পশিল হয়।
সহজে পশিয়ে জে জন রহিয়ে কে বুঝে মরম তায়॥

রচনাটি সনাতন গোস্বামীর না হলেও মূল্যবান।

॥ রূপ-গোস্বামী ॥

রূপ-গোস্বামী সনাতনের সহোদর। ইনি ছিলেন হোসেন শাহার 'দবীর খাস্' বা একান্ত সচিব (Private Secratary) রূপে গৌড়-দরবারে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেন। রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে এই দুই ভ্রাতার জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়।

এঁর জীবৎকাল সম্পর্কে বিশ্বভারতী-পুথি সংগ্রহের হরিনাম কবচ পুথিতে বর্ণিত হয়েছে—

শ্রীরূপ গোস্বামীণ ॥ জন্ম শকং ১৪১৫ অপ্রকট—১৪৯০
প্রকট—৭৫ বিতং
গৃহে ২২ বৃন্দাবনে ৫৩

রূপ-গোস্বামীর সাহিত্যসৃষ্টির পরিধি বিশাল। রচনাগুলি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১) রসসাহিত্য—কাব্য, নাটক, গীত, দোহা।
(২) স্মৃতি, দর্শন ও অলঙ্কার সম্পর্কিত আলোচনা।
(৩) ধর্ম্মতত্ত্ব নিবন্ধাবলী।

শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থাবলী—

(১) দর্শন শাখায়—লঘুভাগবতামৃত
(২) কাব্য শাখায়—উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, পদ্যাবলী ও সামান্যবিরুদলক্ষণ।
(৩) নাটক শাখায়—বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী (ভানিকা) নাটকচন্দ্রিকা।
(৪) রসগ্রন্থাদি শাখায়—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি ;
(৫) ব্যাকরণ—প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা
(৬) স্মৃতি শাখায়—শ্রীকৃষ্ণাভিষেক
(৭) পদাবলী শাখায়—গীতাবলী (গীতসংখ্যা-৪২)

(৮) বিবিধ শাখায়—স্তবমালা, মথুরামাহাত্ম্য, কৃষ্ণগণোদ্দেশ এবং নিকুঞ্জরহস্য-স্তব।[১]

বিশ্বভারতী-পুথিসংগ্রহে রূপ-গোস্বামীর ভণিতাযুক্ত রাধিকাষ্টক নামে একটি অজ্ঞাতপূর্ব রচনার সন্ধান পেয়েছি। রচনাটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো—পুথি সংখ্যা—২৯৬১। পত্র সংখ্যা—১। খণ্ডিত।

তিল ফুল নিন্দী নাষা বুন্দী ফুল দোলনি। ইত্যাদি। ৫ ॥ ৫ ॥
কণক মৃণাল জিনি ভুজজুগ বন্দনি। করিবর দন্তরুচি তাহে অতি সোভনি
মুবলিত য়ঙ্গুলীতে রত্নময় খেচনি। ইত্যাদি ॥ ৬ ॥ ৬ ॥
গজগৌরি জিনি মাঝা কটীতটে সো [ভ] নি :
তা পরে কিরিটী সোভা মোনহর কিঙকিনি ঃ
নিলবস্ত্র উলটা তাহে অতি দোলনি ঃ ইত্যাদি ॥ ৭ ॥ ৭ ॥
সারেষ বাহন গতি মন্থরষে চললি।
কমল চরণযুগে জাবক সে রঞ্জনি ॥
রত্নময় নপুর তাহে মুমধুর বোলনি।
বন্দেহং শ্রীপাদপদ্ম বৃকভানু নন্দী [নি] ৮ ॥ ৮ ॥
ইতি শ্রীমদ্রূপ গোস্যামী বিরোচিত শ্রীরাধিকাষ্টক সংপুর্ন্ন ॥ ৮ ॥ ৮ ॥

পরবর্তিকালে যদুনন্দনদাস নামে জনৈক ব্যক্তি রূপ-গোস্বামীর অধিকাংশ রচনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

চাটুপুষ্পাঞ্জলি[২] ও বিদগ্ধমাধবের[৩] অনুবাদের পুথি আছে বিশ্বভারতী সংগ্রহে। বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'রূপ-গোস্বামীর দোহা' নামে একটি রচনা আছে।[৪] পুথি পরিচয় ১ম খণ্ডে রচনাটি আদ্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে।[৫]

॥ লোকনাথ গোস্বামী ॥

লোকনাথ যশোর জেলার তালখড়িয়া গ্রামবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ চক্রবর্তীর পুত্র। পাটনির্ণয়ে লোকনাথের শ্রীপাট জসর, জসোড় বা জসোড়া

১ গোড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য - ৩। ১০৪
২ বিশ্বভারতী পুথিসংখ্যা - ২৩৮৩
৩ বিশ্বভারতী পুথিসংখ্যা - ৩৮৩৯
৪ বিশ্বভারতী পুথিসংখ্যা - ৪৯৬
৫ পুথি পরিচয় ১ম খণ্ড - পৃ ২০৬ - ৭

বলা হয়েছে। ইনি অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করে শান্তিপুর গমন করেন এবং অদ্বৈত প্রভুর সহায়তায় চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। অধ্যয়ন সমাপ্ত করে শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে তিনি বৃন্দাবন গমন করেন; সঙ্গে ছিলেন ভূগর্ভ গোঁসাই। বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি রূপ-সনাতন, সুবুদ্ধি-রায় প্রমুখের সঙ্গে একযোগে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার সাধনের দুরূহ কর্মে ব্রতী হন। নব বৃন্দাবন নির্মিতির অন্যতম রূপকার শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

ইনি 'ভাগবতের টীকা' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।[১] অনেকে মনে করেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন লোকনাথ গোস্বামীর কাছে।

বিশ্বভারতী-সংগ্রহে 'লোকনাথ গোস্বামী' ভণিতাযুক্ত 'গুরুবস্তুতত্ত্ব' নামে একটি পুথি আছে।[২] রচনাটি অজ্ঞাত; শিষ্য নরোত্তম দাসকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে রচিত। নিম্নে রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'লো—

বৈষ্ণব কড়চা গ্রন্থাবলী॥ খাতার আকারে বাঁধাই। সম্পূর্ণ। ৺রসিকলাল কীর্ত্তনিয়ার দপ্তর হইতে। শ্রীপ্রফুল্লমোহন চট্টরাজ
দক্ষিণখণ্ড। বনওয়ারিবাদ
মুর্শিদাবাদ।

গুরুবস্তুতত্ত্ব—৺লোকনাথ গোস্বামী।
বিষয়ঃ নরোত্তম ঠাকুর প্রতি শিক্ষা, রাগে প্রাপ্তি, মন্ত্রদীক্ষা, বাহ্য দেহে সন্ধান কর্ত্তব্য।

গুরুবস্তুতত্ত্ব। শ্রীহরি শরণং। অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরু পাদপদ্মে নিবেদিল সাবধানে। আমা দিন হেন স্ফূর্ত্তি নাহি হয় মনে।।
তবে আজ্ঞা কৈল মোরে শ্রীগুরু গোঁসাই। ত্রৈলোক্য সাশন শাস্ত্রে গুরু বিনে নাই।।

... ...

কাল সর্প দংশিলে ঝারিএ ভাণ করে। নির্ব্বিষ করএ তারে সামান্য মন্তরে।।
কাল সর্প জীবের ভারা পুন পুন দংশে। তাহাকে নিস্তার করে সাধুজন এসে।।

১ চৈতন্যচরিতের উপাদান - পৃ - ৬১৬
২ বিশ্বভারতী পুথিসংখ্যা - ৬১৭

তাহার প্রমাণ আছে শুন নরোত্তমে। কৃষ্ণ বাক্য আছে কৃষ্ণ কহিলেন আপনে॥
ইত্যাদি।

। রামচন্দ্র খান ॥

রামচন্দ্র-খানের অশ্বমেধ পর্ব জৈমিনীয় সংহিতার মর্মানুবাদ। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, গ্রন্থরচনার তারিখ 'ইন্দু বেদ ইষু যুগ' (অর্থাৎ ১৪৫৪ শক বা ১৫৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) অথবা ইন্দু বেদ মুনি যুগ (অর্থাৎ ১৪৭৪ শক বা ১৫৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)।[১] কাব্যখানির দুটি পুথিতে দু' রকম আত্ম-পরিচয় আছে। একটি পুথির পাঠ অনুসারে কবির জাতি কায়স্থ, নিবাস রাঢ়দেশে দণ্ড-সিমুলিয়া-ডাঙ্গা গ্রামে; পিতার নাম কাশীনাথ। অন্য পুথির মতে, জাতি ব্রাহ্মণ, নিবাস জঙ্গীপুর, পিতার নাম মধুসূদন। উভয় পুথির মতে, কবির গুরুর বাসস্থান মধ্যরাঢ়ে কঙ্কশালি[২] গ্রামে[৩]।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে প্রাপ্ত মহাভারতের পুথির সভাপর্বের একাধিক স্থলে ভণিতা পাওয়া যায় 'দ্বিজ রামচন্দ্র'।[৪] ভণিতা থেকে অনুমান হয়, কবি ছিলেন নারায়ণের উপাসক।[৫]

সন্ন্যাস গ্রহণ করে চৈতন্যদেব যখন নীলাচল গমন করেন তখন তাঁকে নির্বিঘ্নে গৌড়-উৎকল সীমান্ত অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিলেন লস্কর রামচন্দ্র খান। ছত্রভোগে চৈতন্যদেব এঁকে অনুগ্রহ করেন।[৬] ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ইনি আমাদের আলোচ্য কবি হওয়া সম্ভব।[৭] ইনি ব্রাহ্মণ

১ বা সা. ই - পৃ - ২২৯

২ ভাগীরথীর পশ্চিমদিকের ও অজয়নদের উত্তরদিকের ভূমি বিভাগের নাম ছিল কঙ্কগ্রামভুক্তি এবং এই ভুক্তিই বক্ষে ধারণ করিত উত্তর রাঢ়া মণ্ডলকে। —পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি - পৃ - ৭৬৭। নাম সাদৃশ্যে মনে হয় এই কঙ্কশালি অধুনা বর্ধমান জেলার কাঁকসা।

৩ বা. সা. ই - পৃ - ২৩০;

৪ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ৯ (পুথি পরিচয় - ১ম খণ্ড পৃ - ৭)

৫ কহে দ্বিজ রামচন্দ্র ভানু নারায়ণ - পৃ - ৬৪ক, ৬৪খ

৬ চৈতন্যভাগবত ৩।২;

৭ বা. সা. ই - পৃ - ২৩১

ছিলেন : বৃন্দাবন দাসের রচনায় তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে।[১] 'খান' কবির কৌলিক উপাধি নয়; বৃত্তিগত উপাধি। ব্রাহ্মণের 'খান' উপাধি অপ্রচলিত নয়।[২]

'দ্বিজ রামচন্দ্র' ভণিতায় বিশ্বভারতী সংগ্রহে দুটি অপ্রকাশিত পদ আছে। বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা ২৯৬৮। পত্র সংখ্যা ১। লিপি প্রাচীন। পদের প্রথমছত্র—

(ক) হরি হরি বলিআ গোউর নিতাই নাচিছে।

(খ) নিতাই চৈতন্য বলে ডাক নিরবধি।

পদ দুটি আলোচ্য কবির রচনা হওয়া সম্ভব।

॥ বাসুদেব দত্ত ॥

বাসুদেব দত্ত চৈতন্যদেবের অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত।[৩] ইনি দু-একটি পদ রচনা করেছিলেন। পদগুলি বাসুদেব ঘোষের পদের সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হয়।[৪] ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে এঁর নিম্নোক্ত চৈতন্যবন্দনা পদটি উদ্ধৃত হয়েছে—

অপরূপ গোরা নটরাজ

প্রকট প্রেম বিনোদ নব নাগর বিহরে নবদ্বীপ মাঝ।
কুটিল কুন্তল গন্ধ পরিমল চন্দন তিলক ললাট
হেরি কুলবতী লাজ মন্দির দুয়ারে দেওই কপাট।
করিবর কর জিনি বাহুর সুবলনি দোসরি গজমোতি হারা
সুমেরু শিখরে জৈছন ঝাঁপিয়া বহই সুরধুনী ধারা।
রাতুল অতুল চরণ যুগল নখমণি বিধু উজোর
ভকত ভ্রমরা সৌরভে আকুল বাসুদেব দত্ত রহু ভোর।[৫]

১ দৃষ্টি মাত্র তার সর্ব্ববন্ধ ক্ষয় করি। ব্রাহ্মণ আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥ চৈ. ভা - ৩। ২

২ নারাজোলের রাজারা 'খান' উপাধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। তুর্কীশব্দ 'খান' অর্থে ঠাকুর বা মহাশয়।

৩ চৈতন্যভাগবত ১। ২

৪ বা. সা. ই - পৃ - ২৯৩

৫ ক্ষণদা - ১২। ১

কোনো কোনো গ্রন্থে পদটির ভণিতার পাঠান্তর পাওয়া যায় বাসুদেব দত্তের স্থলে 'বাসুদেব মন'।[১]

॥ পুরুষোত্তম দাস ॥

কুমারহট্টবাসী পুরুষোত্তম দাস ছিলেন সদাশিব কবিরাজের পুত্র। পিতাপুত্র উভয়েই নিত্যানন্দ-প্রভুর ভক্ত-অনুচর ছিলেন।[২] এঁর নয়টি ব্রজবুলি এবং তিনটি বাংলা পদ পদকল্পতরুতে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় চৈতন্য-বন্দনার পদ একটিও নেই।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে পুরুষোত্তম দাস ভণিতায় 'মোহমুদ্গর' নামে একটি পুথি আছে।[৩] গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো—

৺শ্রীশ্রীদুর্গা মহামুদ্গর গ্রন্থ লিক্ষতে ॥

আরম্ভ, প্রথমে বন্দিনু গুরু বৈষ্ণব চরণ। যাহার প্রসাদে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

রাধাকৃষ্ণ নাম·· ·· ···। হরি ভক্তিতে মুক্ত হইলা ··· ··· ···॥

ভণিতা, হেন হরির চরণে মোর কোটি নমস্কার।

··· ··· ·· ···

পুরুষ উত্তম দাসে কয় হরির চরণে॥

প্রশ্ন উঠতে পারে, ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত-অনুচর। কিন্তু বন্দনাংশে নিত্যানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই কেন? এর উত্তরে বলা যায়, গুরুবন্দনা করার প্রবণতা হয়তো কবি মানসে ছিল না। এঁর চৈতন্যবন্দনার পদ একটিও পাওয়া যায় নি। রচনায় প্রাচীনত্বের চিহ্ন সুস্পষ্ট—

তে কারণে ক্রন্দন করঅ বাম আঁখি।
একই সরির হইআ হইলাম পাতকি॥

॥ বাসুদেব ঘোষ ॥

গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ এই তিন সহোদর পদকর্তা ও সুগায়ক রূপে সে যুগে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার মধ্যে পদকর্তারূপে বাসুদেব-ই বিখ্যাত। এঁর রচিত বহু পদ অদ্যাপি অজ্ঞাত আছে। বিশ্বভারতী পুথি

১ বা. সা. ই - পৃ - ২৯২
২ চৈ চ - আ - ১১। ৩৮
৩ পুঁথি সংখ্যা - ৫৮১৮

সংগ্রহে প্রাপ্ত এই রকম ৪২টি পদের প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ' অংশে দেওয়া হলো। বাসুদেবের সব পদই প্রায় চৈতন্য-বিষয়ক। ইনি ছিলেন চৈতন্যের আবাল্য সুহৃদ্। সুতরাং এঁর পদ গুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বর্ণনার বাস্তবতা, ভাবের অকৃত্রিমতা পদগুলিকে সহজ সুন্দর মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই উক্তি সার্থক—

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥[১]

পদ ছাড়াও বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'বাসুদেব ঘোষ' ভণিতায় শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস,[২] আর্যা[৩] ও দূতী সংবাদ[৪] এই তিনটি রচনার সন্ধান মিলেছে। রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো—

পুথি সংখ্যা—৫৬৪৩। দূতি সংবাদ। খণ্ডিত।
আরম্ভ, বিন্দার মথুরা গমন। ত্রিপদী :

উদ্ধবের কথা সুনি সে বৃকভানু নন্দিনী : মূর্ছাগতো ...... পড়ে ধরাতলে।
... ... চিত্রা রাইকে তুলে ধরে উচ্চস্বরে কান্দে কৃষ্ণ বলে ॥
চিত্রা কহে ও সজনি কেন হও পাগলীনি সকলেতে ... ...।
কৃষ্ণ আর আসীবে না ভাবেতে গিয়াছে জানা মিলে আর কি হবে কান্দিলে ॥

সুনিয়া চিত্রার কথা রাধা মনে... ... ... চিত্ত পুথলিকা মত রয়।
সজল হল্যাল আঁখি মনে মনে হয়্যা দুখি মোনে রহে কথা নাছি কয় ॥

অতঃপর 'বিন্দার মথুরায় প্রবেশ', 'শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বৃন্দার ব্রজের সংবাদ কথন', শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার ভৎ'সনা, বিন্দার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এ রচনা আমাদের আলোচ্য বাসু ঘোষের লেখনীজাত হতে পারে না। ভাষা আধুনিক, ভাব কৃত্রিম, রচনার কাঠামোয় প্রাচীনত্বের চিহ্নমাত্র নেই। কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত কথকের অর্বাচীন পুথি।

১ চৈ. চ - ১। ১১
২ বি. ভা. পু - ৬০১৯
৩ বি. ভা. পু ৮৪১ (পুঁ. প - ২ পৃ - ১৪)
৪ বি. ভা. পু - ৫৬৪৩

॥ বাসু ঘোষের 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস' ॥

মুন্‌শী আবদুল-করিম সাহিত্য-বিশারদ্‌ নিজ-সংগ্রহের তিনখানি পুথি সমন্বয় ও সম্পাদনা করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ[1] থেকে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বাসুদেব ঘোষ ভণিতাযুক্ত 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস' নামক একটি রচনা প্রকাশ করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় করিম সাহেব মন্তব্য করেছেন —বাসুদেব ঘোষ নামক জনৈক কবি ইহার রচয়িতা; কিন্তু তাঁহার নিবাস কোথায় বা আবির্ভাব কাল কি, তাহা বলিবার কোন উপায় নাই। সকলেই জানেন বঙ্গসাহিত্যে উক্ত নামধেয় একজন অতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা আছেন। ... ...এখন পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ আমার প্রাপ্ত গীতের লেখক বাসুদেব ঘোষ ... . ভিন্ন কি অভিন্ন তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। সে বিষয়ে বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপরেই থাকিল।[2]

রচনাটিতে পদ্য ও গদ্যের মিশ্রণ আছে। ধুয়া, কথা, দিশা ও ঠাট-চিহ্নিত বিশেষ 'স্থল' আছে। কথার ভাষা পদ্য; ধুয়া, দিশা ও ঠাটের ভাষা গদ্য। রচনাটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হলো—

ছাড়িয়া কমল মধু তেজি বিষ্ণুপ্রিয়া বধু
কি সুখে রহিছে নিমাই রস করি ভং।
বাসুদেব ঘোষ বোলে ঐ রাঙ্গা চরণতলে
নিদান কালে রাখ মোরে চরণে শরণ॥
গৌরাঙ্গ-নদীয়া বাসী পূর্ব্বলীলা পরকাশি
শচী গৃহে হইল উপস্থিত।
নদীয়ার-বাসী লোক পাএ তারা নানা সুখ
দেখি সভাই গৌরাঙ্গ চরিত॥

কথা। (এমত কালেতে রাখোআলগণ সঙ্গেতে লইআ গঙ্গার তীরেতে গিআ (নিমাই) গঙ্গার জল নিরীক্ষণ করিতেছেন)

রাখোয়াল সঙ্গে গৌরাং করিল গমন।
গঙ্গার তীরেতে গিআ দিলা দরশন॥

১ সা প. - সং - ৬২

২ আঃ করিম - সম্পাদিত বাসুদেব ঘোষের শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস - ভূ. পৃ - ২ - ৩

গঙ্গার তীরেতে গৌরাং হেরে গঙ্গার নীরে।
দেখে (এক) বিপ্র আসিআছে স্নানের অন্তরে।।
ধীরে ধীরে গেল নিমাই সেই বিপ্র কাছে।
কি কর বলিআ সেই বিপ্রকে জিজ্ঞাসে।।

হেন কালেতে ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র কথটি ভস্ম গাএ দিআ রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ কর্যা গঙ্গার জলে থাক্যা হরগৌরী আরাধন করিতেছেন। তখন গৌরাঙ্গ কহিতেছেন, ওগো ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র তুমি কি কার্জ্য করিতেছ? তখন গো ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র বলছেন—

বাছা তোকে আমি কি বলিব রে
তোকে বল্যে হবে কি রে।
বাছা গৌরাঙ্গ বলে ও বিপ্র
তোমার শ্রম দেখ্যা আক্ষার শরীরে না সয়।

ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র বলিতেছেন,

আমি আরাধিএ হর-গৌরী
তরিবারে ভব বারি।। ধু।।

এ রচনা ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত পদকর্তা বাসু ঘোষের হতে পারে না। লিপিকরদের হাতে পড়ে মূল ভাষা হাজারো সরলীকৃত হলেও বাসু ঘোষের পদাবলীর সঙ্গে যাঁদের বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরা এ রচনাকে বাসু ঘোষের লেখনীনিঃসৃত বলে কখনই স্বীকার করবেন না। লিপিকরদের হাতে পরিবর্তিত হলেও ভাষার মূল কাঠামোটি কখনও বদলায় না; কাব্যের আমূল পরিবর্তন লিপিকরদের দ্বারা সম্ভব নয়। যে তিনখানি পুথির সাহায্যে গ্রন্থখানির সম্পাদন কার্য সম্পন্ন হয়েছে সেগুলির প্রাপ্তিস্থল সম্পর্কে আঃ করিম সাহেব কোন সংবাদ দেন নি। গ্রন্থটির সম্পাদনার মূলে যে পুথি অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলি আধুনিককালের কথকদের কড়চা—সম্ভবত বাসু ঘোষের রচনার ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে আধুনিক কালের অর্বাচীন রচনা। 'কথা' অংশের গদ্য রচনাগুলি পুরোপুরি কথকতার ঢঙে রচিত; পদ্যাংশে বহু অর্বাচীন ছন্দের ব্যবহার আছে।

পক্ষান্তরে, বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'বাসু ঘোষ' ভণিতায় 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস' নামক পুথি আছে।[১] বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে রচনায় কোনো প্রকার অসঙ্গতি নেই, কাহিনীতে অলৌকিকতা নেই। এক কথায় পূর্বোক্ত গ্রন্থের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই এটি একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রচনা। রচনার মধ্যে বাসু ঘোষের অকৃত্রিম পদ আছে; বাক্যবিন্যাস প্রণালীতে বাসু ঘোষের পদাংশ আছে। উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা গেল। পুথির বিবরণ— পুথি সংখ্যা—৬০৯৬; পত্র সংখ্যা—১৬। সম্পূর্ণ।

লিপিকাল সন ১২৪১ সাল তারিখ ১৬ মাঘ।

আরম্ভ, ৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস ॥ নারায়ণং নমস্কির্ত্তং নরোশ্চৈব নরোত্তমং। দেবিং স্বরস্বতিশ্চৈব তথো জয়ে মুদিরয়েত ॥

কুথা জাবি পরাণ নিমাই রে।
অভাগীনি সচিমাএর আর কেহ নাই রে ॥
একদিন সচিমাতা গৌরাঙ্গের কাছে।
কান্দিতে কান্দিতে মাতা গৌরাঙ্গেরে পুছে ॥ - পৃ - ১খ
... ...

সচির মন্দিরে আসি দুআরের পাশে বসি ধিরে ধিরে কান্দে বিষ্ণুপ্রীয়া।
সয়ন মন্দিরে ছিল নিসিভাগে কুথা গেল মোর মুণ্ডে বজ্জর পড়িয়া ॥
কালনিদ্রা আস্যাছিল গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল কেন্দ্যা কেন্দ্যা কহে বিষ্ণুপ্রীয়া।
সপনে না জানি আমি ছেড়্যা জাবে গুণমনি অভাগীনীর গলে পদ দিয়া ॥
কালিকার নিশিভাগে কহিল আমার আগে মোর লাগি না কান্দ বিষ্ণুপ্রীয়া।
অসার সংসার সার সার নন্দের কুমার কান্দ সদা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দু নআনে সুনিয়া উঠিল সচিমাতা।
আউদড় কেশে ধায় বসন নাহি দেই গায় সুনিয়া বধুর মুখের কথা ॥
তুরিতে জালয়ে বাতি খুজে সচি ইতি উতি গৌরাঙ্গের উদ্দিপ না পেয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধ্ সাতে কান্দিতে কান্দিতে পথে ডাকে সচি নিমাই বলিয়া ॥
এই পথে গৌরাঙ্গ গেছে পদচিহ্ন পড়্যা আছে দেখ আস্যা জত নদ্যাবাসী।
হায় কি করিয়া মোরে ছেড়্যা গেল কুথাকারে দিবশে হইল আজি নিশী ॥

১ বিশ্বভারতী পুথিসংখ্যা - ৬০৯৬; শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত।

বিশ্বরূপ ছেড়্যা গেছে সেই সেল মোর বুকে আছে সে আগুনে জলিছে সদাই।
জলন্ত আনল ছিল তাহে ঘৃত ঢেল্যা দিল আর আমি প্রাণে বাঁচিব নাই ॥
তাহা সুনি নদিআর লোক কেন্দ্যা করে উচ্চশোক জারে তারে পুছে শচীমাতা।
একজন পথে জায় সচিমাতা পুছে তায় কহ বাপু গৌরাঙ্গের কথা ॥
সে কহে দেখ্যাছি পথে জনেক সন্যাসী সাতে কাঞ্চননগর মুখে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি আমার শ্রীগৌরহরি পাছে গিয়া মস্তক মুড়ায় ॥

পৃ - ৩খ - ৪ক

উপরোক্ত রচনাংশের সঙ্গে বাসু ঘোষের 'সচির মন্দিরে আসি দুআরের পাশে বসি'[১] পদটির আংশিক সাদৃশ্য আছে।

মুণ্ডন করিয়া চুলে স্নান করি গঙ্গাজলে বলে দেহ অরুণ বসন।
সুনিয়া প্রভুর কথা সভার অন্তরে বেথা সোকানলে করয়ে ক্রন্দন ॥
অরুণ দু গাছি কানি ভারথি দিলেন আনি আর দিল ডোর কপীন।
মস্তক উপরে ধরি পরিলেন গৌরহরি বলে আমি অতি দিনহীন ॥
তোমরা বৈষ্ণববর[২] এই আশীর্ব্বাদ কর দুটী হাত দিয়া মোর মাথে।
করিল্যাম সন্যাস নহে জেন উপহাস ব্রজে জেন পাই ব্রজনাথে ॥
এত বলি গৌররায় প্রেমে উর্দ্ধমুখে ধায় আহা বিন্দাবন বলি কান্দে।
ধায় প্রভু রাড়দেশে নিত্যানন্দ ধায় পাসে বাসু ঘোস স্তির নাহি বান্দে ॥

—পৃ - ৭খ - ৮ক

এই অংশটির সঙ্গে বাসু ঘোষের একটি মুদ্রিত পদের[৩] সাদৃশ্য আছে। এছাড়া, আমাদের প্রাপ্ত পুথিতে বর্ণিত 'কাঞ্চন নগরে এক বিপ্র মনোহর[৪], সন্ন্যাস করিয়া গোরা গেলা শান্তিপুরে[৫], হেদে রে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই[৬]

১ পদকল্পতরু - পদসংখ্যা - ২২১১, গৌরপদতরঙ্গিণী - পৃ - ২৪০
২ মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ - 'তোমরা বান্ধব মোর এই আশীর্ব্বাদ কর' ভ্রান্ত কারণ বন্ধু বান্ধবরা আশীর্বাদের পাত্র নয়; শুদ্ধ পাঠ হবে—তোমরা বৈষ্ণববর এই আশীর্ব্বাদ কর।
৩ পদকল্পতরু - ২২২৫, গৌরপদতরঙ্গিণী - পৃ - ২৩৯
৪ ,, ২২২৩, ,, পৃ - ২৩৮
৫ বাসু ঘোষের পদাবলী-মালবিকা চাকী পৃ - ১১১, ১১৫
৬ এই পদটি কোনো প্রাচীন পুথিতে না পাওয়ার দরুণ 'বাসুঘোষের পদাবলী'তে 'সন্দিগ্ধ পদ' পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিশ্বভারতীর পুথিতে পদটি পাওয়ায় সে সন্দেহ দূরীভূত হল।

প্রভৃতি অংশগুলির সঙ্গে বাসু ঘোষের মুদ্রিত পদাবলীর মিল আছে।

বিশ্বভারতী পুথির পুষ্পিকাংশ :—

বাসুদেব ঘোষ তখন কহিলেন হাসি। জিব লাগী গৌরাঙ্গ হইল সন্ন্যাসী ।। ইতি—সন্ন্যাস সমাপ্তং ।। সন ১২৪১ সাল তারিখ ১৬ মাঘ রোজ সোমবার বেলা এক প্রহরে পুর্ন্ন হইল ।। [লি] খিতং শ্রীস্বরূপ দাস সাকীম উদয়গঞ্জ পরগণে ... ... মান্দারণ। —পৃ - ১৬ খ

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনা অবলম্বন করে তাঁর অন্তরঙ্গ অনুচর বাসুদেব ঘোষ সর্বপ্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস রচনা করেন। বাঙ্গালা দেশে সে রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পরবর্তিকালে বহির্বঙ্গেও এই জাতীয় কাব্য রচিত হতে থাকে।[১] আরও পরবর্তিকালে অক্ষম অনুকরণকারী বা কথক সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে সে রচনা যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে আঃ করিম সম্পাদিত শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রন্থটিতে। বাসুদেব ঘোষের মূল রচনার ক্ষীণতম সূত্রও উক্ত রচনায় নেই।

॥ মাধব ঘোষ ॥

মাধব ঘোষও চৈতন্যদেবের অন্যতম আদ্য অনুচর। কীর্তনীয়ারূপে মাধব ঘোষের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বৃন্দাবন দাসের মতে,

সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্তনে তৎপর।
হেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর ।। —চৈতন্যভাগবত ৩।৫

মাধব ঘোষ সম্পর্কে বৃন্দাবন দাসের এই মন্তব্য অতিশয়োক্তি বলতে চাই না কারণ পৃথিবী সম্পর্কে সেকালের মানুষের ধারণা খুব-ই সীমাবদ্ধ ছিল। বাসুদেব বলেছেন—

গোবিন্দ মাধব ঘোষের গান। শুনি কেবা ধরয়ে পরাণ।। ইনি রাধাকৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যবিষয়ক পদ রচনা করেন। এঁর ব্রজবুলি পদেরও সন্ধান পাওয়া যায়।[২] বিশ্বভারতী সংগ্রহের অনেক পুথিতে 'মাধব' ভণিতায় অনেক অজ্ঞাত পদ আছে। তার মধ্যে কোনগুলি এই মাধব ঘোষের রচনা নির্ণয় করা দুষ্কর।

১ ধূপরাজের শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস - শ্রীহট্ট - ২৪৯, ২৫০ তালিকা পৃষ্ঠা - ১৭

২ পদকল্পতরু - ১৩১৫

।। গোবিন্দ ঘোষ ।।

বাসু ঘোষ ও মাধব ঘোষের সহোদর গোবিন্দ ঘোষও পদ রচনা করেছিলেন এঁর অনেক পদ গোবিন্দদাস-কবিরাজের পদের সঙ্গে মিশে যাওয়া অসম্ভব নয়। এঁর রচিত নিঃসন্দিগ্ধ ৬টি পদ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে।[১]

সে যুগে বিশিষ্ট কীর্তনীয়ারূপে গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ এই তিন ভ্রাতা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[২] গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব তিন ভ্রাতা সম্পর্কে উল্লেখের এই ক্রম থেকে অনুমান হয়, এঁদের মধ্যে গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ, মাধব মধ্যম এবং বাসুদেব সর্বকনিষ্ঠ।

এঁদের পুরো নাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে অনেক বাদানুবাদ আছে। চৈতন্যভাগবতে মাধব ঘোষ 'মাধবানন্দ ঘোষ' রূপে উল্লিখিত হয়েছেন।[৩] বাসুদেবানন্দ ভণিতায় একটি নিমাই-সন্ন্যাস-বিষয়ক পদ আছে।[৩] ফলে অনেকে অনুমান করেন অপর ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষের সম্পূর্ণ নাম 'গোবিন্দানন্দ' ছিল।

পক্ষান্তরে, অনেকে মনে করেন ছন্দের মাত্রা রক্ষার জন্যই নামের এইরূপ সম্প্রসারণ; এঁদের প্রকৃত নাম গোবিন্দ, মাধব এবং বাসুদেব ঘোষ।[৪]

।। বলরাম দাস ।

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে ১৯ জন বলরামের উল্লেখ পাওয়া যায়; তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন কবি ও পদকর্তা।[৫]

(১) বুধরী নিবাসী রামচন্দ্র-কবিরাজের শিষ্য 'কবিপতি বলরাম' নামে একজন কবি ছিলেন।[৬]

(২) নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত দো-গাছিয়া গ্রাম-নিবাসী বলরাম দাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দ্বিজ বলরাম দাস' ভণিতার পদগুলি এঁর রচনা। এঁর বংশধর শ্রীহরিদাস গোস্বামী 'দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের জীবনী ও পদাবলী' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে কবির জীবনী বর্ণিত হয়েছে সবিস্তারে।

১ ,, ,, ৫ম খণ্ড পৃ - ৪৮, গৌরপদতরঙ্গিণী - ভূ. পৃ - ২৪
২ গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়। চৈ. ভা - অন্ত্য ৫ম অধ্যায়
৩ বাসুদেবানন্দে কয় মো সম পামর নাই তবু হিয়া বিদরে আমার। - গৌ প. ত পৃ - ২৫৪
৪ গৌ প. ত. - ভূ. পৃ - পৃ - ১.০
৫ ,, ,, পৃ - ২০২
৬ গৌ. প. ত পৃ - ২০৪; H. B L - P - 74 - 81

এছাড়া, 'দীন বলরাম' ভণিতায় বিশ্বভারতী সংগ্রহে তিনটি পদ পাওয়া গেছে ; তন্মধ্যে ২টি পদ অপ্রকাশিত এবং 'জয়তি জয় বৃকভানুনন্দিনী শ্যাম মোহিনী রাধিকে' পদটি হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত বৈষ্ণব পদাবলী (পৃ—৬৬২) গ্রন্থে 'গোবিন্দদাসীয়া' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

'বলরাম দাস' ভণিতায় বিশ্বভারতী সংগ্রহে ৩৬টি অপ্রকাশিত পদের সন্ধান পেয়েছি ; তার মধ্যে ৫টি পদ ব্রজবুলিতে রচিত। অপ্রকাশিত-পদ-সংগ্রহে পদ-সূচী প্রদত্ত হ'লো। কোন্ পদটি কোন্ বলরাম দাসের রচনা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

পদাবলী ছাড়াও বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'বলরাম দাস' ভণিতায় নৌকাখণ্ড[১] হাট-বন্দনা[২], গুরুতত্ত্বসার[৩], গুরু গোসাঞির মাহাত্ম্য[৪] নামে কতকগুলি রচনা রয়েছে। ভাব ও ভাষা বিশ্লেষণ করে মনে হয় রচনাগুলি পরবর্তিকালের।

'বলরাম' ভণিতাযুক্ত 'নাম সংকীর্তন'[৫] নামক রচনাটিতে ভণিতায় কবির নাম ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। বন্দনাংশে চৈতন্যের আদ্য পরিকরবর্গের উল্লেখ থাকায় মনে হয় রচনাটি অর্বাচীন নয়। বন্দনাংশ এইরূপ—

অবধুত নিত্যানন্দ বক্রেশ্বর হরিদাস। মুরারি মুকুন্দ বাষু······শ্রীবাষ।
শ্রীধর জগদানন্দ পণ্ডিত রাঘব। শ্রীমান সুন্দর গোবিন্দ দত্ত বাসুদেব ।।
পণ্ডিত গোসাঞি বিদ্যানিধি গঙ্গাদাষ। সেন সিবানন্দ প্রিয় গঙ্গাধর দাস ।।
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসুদেব আর। ···সঙ্কর গৌর প্রাণধন জার ।।
শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীবিশ্বি সুলোচন ।।

ভণিতাংশ,

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ রেণু লব আষ। নাম সংক্তিন কহে বলরাম দাস ।।

১ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ১০২ ;
২ ,, ,, ,, ২১৪
৩ ,, ,, ,, ১৩১৫
৪ ,, ,, ,, ১৮৯৮
৫ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ৩৪১৪

বিশ্বভারতী সংগ্রহের বলরাম ভণিতাযুক্ত 'বৈষ্ণব বিধান গ্রন্থ'[১] খানিও বৈষ্ণব মাহাত্ম্য বিষয়ক রচনা। গুরুরূপে কবি 'বৈষ্ণব গোসাঞিং' নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন—বৈষ্ণব গোসাঞিং বিনে জদি জানো আর। মুঞিং পাপী না হও যেন সংসারের পার ।। [পৃ - ৪খ]

অন্যত্র চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করতে না পারার জন্য খেদ প্রকাশ করেছেন—

বৈষ্ণব তোষণে সুখী হয় কৃষ্ণচন্দ্র। হেন প্রভু না ভজিনু মুঞিং অতি মন্দ ।।
- ৪খ

ভণিতা,

বলরাম দাস কহে এতেক বিচার। বিশইর ঘরে জন্ম নহে যেন য়ার ।।
ইতি বৈষ্ণব বিধান গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ - ৪খ

বিশ্বভারতী সংগ্রহে রক্ষিত 'বলরাম দাস' ভণিতাযুক্ত 'উদ্ধবসন্দেশ'[২] নামক রচনাটি রূপগোস্বামীর 'উদ্ধবসন্দেশ' গ্রন্থের অনুবাদ। কবি গ্রন্থ রচনার কারণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে—

উদ্ধব সন্দেশ গ্রন্থ রচিলা গোসাঞিং। জার সম রস আর কোন গ্রন্থে নাই।
এই কথা একত্রে রচিব পদ বন্দে। বৈষ্ণব সকল ইহা সুনিব আনন্দে ॥
হিন হৈয়া কৈল আমি গ্রন্থের আরম্ভ। ইহা জানি কহ না করিবা উপালম্ভ ॥ -২খ

ভণিতাংশ,

দসনে সুজর (?) ধরি পাড়িয়া কার্পণ্ঠ করি সিরেতে জুরিয়া দুই হাথ।
বলরাম দাসে কয় মনে বড় ভয়াভয় করুণা করহ গোপীনাথ ॥ - পৃ - ২খ

ভণিতায় কবির নাম ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না; কাজেই ইনি কোন্ বলরাম দাস নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা অসম্ভব।

।। বলরাম বসু ।।

বলরাম বসু নামে একজন পদকর্তা ছিলেন।[৩] মনে হয়, এঁর রচিত পদ বলরাম দাসের পদের সঙ্গে মিশে গেছে। বলরাম বসু ভণিতায় একটি মাত্র পদ এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে।[৪]

১ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২৩৮৮, পত্রসংখ্যা - ৪, সম্পূর্ণ।
২ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২৩৫০। পত্রসংখ্যা - ৪। খণ্ডিত।
৩ বা. সা. ই - পৃ - ৩০০
৪ স ৫৪০

।। আত্মারাম দাস ।।

'আত্মারাম দাস' ভণিতায় বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি মিশ্রিত ভাষায় রচিত একটি নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ আছে ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে (১৬/২)। এই পদটিই পদকল্পতরু গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে দু'বার (পদসংখ্যা—৬৩৬, ২৩০২)।

এছাড়া, পদকল্পতরুতে আত্মারাম দাসের ভণিতাযুক্ত আরও তিনটি পদ আছে (পদসংখ্যা—৬, ২২২৯৪, ৩০৩৩); তার মধ্যে ২২৯৪ সংখ্যক পদটি ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে (১। ২) দ্বিজ গঙ্গারাম ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

আত্মারাম দাস নামে শ্রীনিবাস আচার্যের দু'জন শিষ্য ছিলেন; তবে তাঁরা পদ রচনা করেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১] আমাদের আলোচ্য আত্মারাম দাস শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। শ্রীখণ্ডে অম্বষ্ট কুলে এঁর জন্ম।[২] ইনি প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস বা বলরাম দাসের পিতা।[৩]

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে[৪] 'আত্মারাম' ভণিতায় তিনটি অপ্রকাশিত পদ পাওয়া গেছে; পদত্রয়ের প্রথম ছত্রের সূচী 'অপ্রকাশিত পদসংগ্রহ' অংশে মুদ্রিত হ'লো। 'আত্মারাম দ্বিজ' ভণিতায় বিশ্বভারতী সংগ্রহে আর একটি চৈতন্যদেবের রূপ বর্ণনা বিষয়ক পদ আছে।[৫]

।। পরমেশ্বর দাস ।।

'পরমেশ্বর' ভণিতায় একটি ব্রজবুলি[৬] ও একটি চৈতন্য বিষয়ক পদ পাওয়া যায়।[৭] ওই পদটিই 'পরমেশ্বরী দাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে।[৮] পদ দুটি প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা বলে মনে হয়। ইনি নিত্যানন্দ

১ H B L - P - 92;
২ ক্ষণদা - ভূ. পৃ - ২
৩ গৌ. প. ত - ভূ. পৃ - ২০২
৪ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ৪২৬৬
৫ ,, ,, ,, ৮৭৩
৬ H. B. L - P - 90 91
৭ পদকল্পতরু - পদসংখ্যা - ২৩
৮ গৌরপদতরঙ্গিণী - পৃ - ১৫৫

প্রভুর শিষ্য, পরবর্তিকালে জাহ্নবা দেবীর কাছে থাকতেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' এঁর জীবনী বর্ণিত হয়েছে।[১] ইনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

আর কি শ্যামের বাঁশি কুলের মরম থোবে।
নাম ধরি ডাকে বাঁশি বেকত হবে কবে ॥
... ...
পরমেশ্বর দাসে কয় শুন রসবতী।
বাঁশির কোন দোষ নাঞি কালিয়ার যুগতি ॥

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, এই পদটিতে তথাকথিত "চণ্ডীদাসিয়া সুর" আছে।[২] বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'পরমেশ্বর দাস' ভণিতায় একটি অজ্ঞাত-পূর্ব রচনা আছে। রচনাটি এইরূপ :—

পরমেশ্বর দাসের সূচক—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ
লাহর নিকট গ্রাম নাম তার মুলতান শ্রীমুকুন্দ যাহাতে প্রকট।
সঙ্গে যার অনুপাম শ্রীমথুরাদাস নাম সদা থাকেন তাহার নিকট ॥
শুনিঞা তাহার গুণ উলসিত হয় মন সভাকার আনন্দ ......।
স্বপ্নাবেশে শ্রীগোবিন্দ কহে অহে শ্রীমুকুন্দ ঝাট করে আইষ বৃন্দাবন।
হবে তোমার বাঞ্ছা সিদ্ধি পাইবে প্রেমরত্ননিধি মনবাঞ্ছা হইবে পূরণ ॥
... ...
এই মতে নিশি দিশী প্রেমানন্দে কহে ভাসী গোসাঞি চরণে করি আশ।
পরমেশ্বর দাস দীন মনে না ভাবিহ ভিন তবে জানি মহিমা তোমার ॥ ইতি সূচক সংপূর্ণ ॥

সূচকটি শ্রীমুকুন্দের অপ্রকট উপলক্ষে রচিত। ইনি সম্ভবতঃ কবির গুরু অথবা গুরু স্থানীয় ছিলেন।

॥ **দ্বিজ গঙ্গারাম** ॥

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে' দ্বিজ গঙ্গারামের ভণিতায় একটি নিত্যানন্দ

১ ভ. র. - পৃ - ৫৪১, ৬৬৪, ১০১৫
২ বা. সা. ই - পৃ - ৩০৪

বন্দনার পদ আছে।[১] ওই পদটিই পদকল্পতরুতে আছে আত্মারাম ভণিতায়।[২]

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি 'আত্মারাম দাস' নামে এক বা একাধিক কবি ছিলেন কিন্তু সেজন্য গঙ্গারামের অস্তিত্ব অ-প্রমাণিত হয় না। চৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণনা অনুসারে,

বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই। পূর্ব্বে যার ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোসাঞী॥
আ. ১১। ৪৩

ক্ষণদাগীতচিন্তামণির সম্পাদক মহাশয়ের মতে, পদকর্তা নন্দন আচার্যের ভ্রাতা গঙ্গাদাস আচার্য। কিন্তু গঙ্গাদাস এবং গঙ্গারাম অভিন্ন হওয়া সম্ভব কিনা বিচার্য। ক্ষণদায় উদ্ধৃত পদটিতে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিত হয়েছে।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথিতে 'দ্বিজ গঙ্গারাম' ভণিতাযুক্ত একটি পদ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে পুথি পরিচয় ১ম খণ্ডে।[৩] পদটির বিষয় সখির খেদোক্তি; ভাষায় হিন্দি ও ব্রজবুলির মিশ্রণ আছে।

॥ রামানন্দ বসু ॥

কুলীন গ্রামের প্রখ্যাত মালাধর বসুর বংশধর রামানন্দ বসু বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। অনেকের মতে, 'সত্যরাজ খান' রামানন্দের উপাধি। আবার সত্যরাজ খান রামানন্দের পিতা এইরূপ মতবাদ-ও প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় দু'জনকে দুই ব্যক্তি বলা হয়েছে।[৪]

রামানন্দ বসু রচিত একটি অতি-প্রচলিত পদ 'তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।[৫] এই পদটির একটি বিস্তৃততর সংস্করণ জ্ঞানদাস ও বলরাম

১ ক্ষণদা - ১।২

২ পদকল্পতরু - পদসংখ্যা - ২২৯৮

ভণিতা দু' রকমের—

ক্ষণদার ভণিতা—কলি অনুকূলে পড়িযা বিপাকে ডাকে দ্বিজ গঙ্গারাম।

পদকল্পতরুর ভণিতা—দীন হীন যত উদ্ধারিলা কত বঞ্চিত দাস আত্মারাম।

৩ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২৬৯ (পুথি পরিচয় - ১ম খণ্ড পৃ - ১৪৫)

৪ কুলীন গ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান। রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্যমান॥

৫ পদকল্পতরু - পদসংখ্যা - ১৪৫

দাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু সমালোচকেরা পদ দুটি তুলনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন 'রামানন্দ' ভণিতায় পাঠই প্রাচীন।[১]

বিশ্বভারতী পুথিসংগ্রহে 'রামানন্দ বসু' ভণিতায় ২টি এবং রামানন্দ ভণিতায় ১টি অপ্রকাশিত পদ পাওয়া গেছে। একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হ'লো; অন্য দুটি পদের প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত-পদ-সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট হলো—

নটবর বেশ নাগরের করে মোহন বেণু।
পরিধান পিতধড়া ভূরু কামধনু॥
পিঠে দোলে সোনার ঝাপা তাহে পাটের থোপা।
কুন্তলের ফুলমালা গন্ধরাজ চাঁপা॥
এ মোনমোহন বেশ কোথাউ না দেখি।
নাচিয়ে নাচিয়ে বুলে খঞ্জনিয়া পাখি॥
বশু রামানন্দে বলে আর কত বল।
বিলম্বে আর কাজ নাই বেশ বনাইয়া চল॥[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'রামানন্দ' ভণিতাযুক্ত সব পদই রামানন্দ বসুর মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। এই নামে পরবর্তিকালে অনেক পদকর্তা ছিলেন। এই রকম একজন সহজ-সাধক রামানন্দের পদ পেয়েছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সংগ্রহে। পদটি রাগাত্মিক—

স্ব-ভাব ভাবেতে রসিকের মন ভাবেতে নিপুণ হয়।
ভাবের উপরে ভাবের উদয় ছটায় কিরণ তায়॥
রাগে রাগাত্মিকা প্রেমের মূনাফা প্রেমের স্বরূপ যে।
প্রেম রতন ধন জে জন পাঞাছে রসিক বলিয়ে সে॥
... ...
কহে রামানন্দ এ রস নিগূড় আর সব যত ধন্দ।
শ্রীমতী করুণা সভাবে হইল মুক্তি অতি সট্ মন্দ॥ ২১ ॥[৩]

১ বা. সা. ই - পৃ - ৯৭
২ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২৬১৯, ২৯৭২
৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ - পুথি সংখ্যা - ২৮৮

। বংশীবদন ।

বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ এবং বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।[১] এঁদের নিবাস ছিল নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুলিয়াপাহাড় গ্রামে। পিতার নাম ছ' কড়ি চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম চন্দ্রকলা। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে ইনি শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের অভিপ্রায়ে নবদ্বীপে বাস করতেন (বোধহয় বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীদেবীর জীবংকাল পর্যন্ত)।[২]

'বংশীবদন' ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা ও ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি এঁর রচনা। 'বংশী' ভণিতা বংশীবদনের সংক্ষেপ হওয়া সম্ভব।[৩] বংশীদাস নামে একাধিক কবি পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সে সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'বংশি' ও বংশীবদন ভণিতায় ১১টি অপ্রকাশিত পদের সন্ধান পেয়েছি। একটি পদ উদ্ধৃত হলো ; অন্য পদ গুলির প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' সন্নিবিষ্ট হলো—

বন্ধু কানাই আজ কেন দেখি আন পারা ॥
বচন বসন ভিন প্রতি অঙ্গে রতি চিহ্ন কার ঘরে হইয়াছিলে হারা ॥
নয়ানের কাজর তোমার বয়ানে লাগীয়াছে আর তাহে দষ নখের ঘা।
ঘুমের আলিশে দুটী নয়ান মিলিতে নার কোথা চল কোথা পড়ে পা ॥
চাঁচর চিকুর চূড়া মালতির মালা বেড়া এলুয়া পড়েছে বুক মাঝে।
উরুতে নখের রেখা কপালে সিন্দুর দেখা রমনি হইলে মরে লাজে ॥
তা হতে অধিক তোমার করেতে মুরুলি নাই। এত অচেতনে কিবা মুখ।
বংশীবদনে কয় জোবন সেই হয় শুভাব ছাড়িতে দুখ ॥[৪]

'বংশীবদন' ভণিতায় বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে একটি রাগাত্মিক পদও পেয়েছি। পদটি অ-প্রকাশিত হওয়ায় অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো—

১ বংশীবদনের জন্ম ১৪৯৪ খ্রীঃ - গৌরপদতরঙ্গিনী - ভূ - পৃ - ১২৩
২ বা. সা. ই - পৃ ২২৫
৩ ঐ - পৃ - ২২৫
৪ পৃ· ২১ ২২ - বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ৫৪০৬

কুলের উপর কুলের জনম তাহার উপরে কুল।
এ বড়ি বিষম বুঝিতে ধন্দ জলের উপরে জল॥
ঢেউর উপরে ঢেউর জনম তাহার উপরে ঢেউ।
আন জন ইহা বুঝিতে না পারে রসিক বুঝিয়ে কেউ॥
ভাবের উপরে ভাবের জনম তাহার উপরে ভাব।
বিদগধ হইয়া ভাবে প্রবেশিয়া কিছু হয় তাতে লাভ॥
... ...
বংশিবদনে বঞ্চিত হইয়া না পাইয়া এ রশ সুখ।
ভাবিতে ভাবিতে সিমা না পাইয়া ঘুচি গেল মন দুঃখ॥[১]

ইনি আমাদের আলোচ্য বংশীবদন না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী; সম্ভবত পরবর্তিকালের কোনো সহজিয়া কবি।

বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় বংশীদাস ভণিতা ব্যবহার করতেন কিনা জানা যায় না, তবে 'বংশীদাস' ভণিতায় 'ব্রজভূমি মনে করি কান্দে পুন গৌরহরি'[২] পদটি এঁর লেখনীজাত হওয়াই সম্ভব। ভাবের আন্তরিকতা থেকে ধারণা হয় পদটি প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা।

পদ ছাড়াও দীপকোজ্জ্বল ও দীপান্বিতা নামে দুখানি গ্রন্থ এঁর রচনা। বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস-ও কিছু পদ রচনা করেন।[৩]

পরবর্তী জীবনে বংশীবদন বাঘনাপাড়ায় বসবাস করেন এবং তৎকালে বাঘনাপাড়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

।। পরমানন্দ গুপ্ত ।।

ষোড়শ শতকে 'পরমানন্দ' নামে একাধিক কবি ছিলেন। শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ সেন (কবিকর্ণপূর) পরমানন্দ দাস ভণিতায় পদ রচনা করেন।[৪] কবিকর্ণপূর তাঁর গ্রন্থে পরমানন্দ গুপ্তের নামোল্লেখ করেছেন।[৫] জয়ানন্দ পরমানন্দ গুপ্তের গৌরাঙ্গবিজয় গীতের উল্লেখ করেছেন—

১ বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহ - ২৭২৪
২ " " " - ১৭৩৪ (পদটি অপ্রকাশিত)
৩ H. B. L - P - 89 - 90
৪ H. B. L - P - 466
৫ গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা - পৃ - ১৯৯

সংক্ষেপে কহিলেন পরমানন্দ গুপ্ত। গৌরাঙ্গ বিজয় কথা শুনিতে অদ্ভুত ॥

পরমানন্দ ভট্টাচার্য নামে রূপ গোস্বামীর একজন শিষ্য ছিলেন। পরমানন্দ ভণিতার কিছু পদ এঁর রচনা হওয়া সম্ভব।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে[১] পরমানন্দ ভণিতাযুক্ত ২টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি। পদ দু'টি চৈতন্য বিষয়ক; কিন্তু কোন্ পরমানন্দের তা বলার উপায় নেই. তবে কবি যে চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বর্ণনার আন্তরিকতা থেকে ধারণা করা অসঙ্গত হবে না। একটি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো; অন্যটির প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদসংগ্রহে' সন্নিবিষ্ট হলো—

॥ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ॥

ভুজ যুগ আরোপিয়া ভকতের কান্দে।
চলিয়া যাইতে নারে গোরা হরি হরি বলিয়া কান্দে ॥
ছলছল নয়ান যুগল কত নদি বহে ধারে।
পুলকে পুরল গোরা কলেবর ধরনি ধরিতে নারে ॥
সঙ্গে পারিষদ ফিরে নিরন্তর হরি হরি বোল বোলে।
সখার কান্দে ভুজযুগ দিয়া হেলিতে দুলিতে চলে ॥
ভুবন ভরিয়া প্রেমে উত্তরল পতিত পাবন নাম।
মনের ভরোষা পরমানন্দের মরমে না লয়ে আন ॥ - বিশ্বভারতী পুথিসংখ্যা - ২৯৭২

॥ জগদানন্দ ॥

পণ্ডিত জগদানন্দ বা পণ্ডিতরায় শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান অন্তরঙ্গ ছিলেন।[২] মহাপ্রভুর সঙ্গে ইনি নীলাচলে থাকতেন এবং মাঝে মাঝে গৌড়ে আসতেন শচীদেবীর কুশল জানতে। ইনি পদ রচনা করেছিলেন।[৩]

জগদানন্দ ঠাকুর নামে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের একজন বংশধর পদ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৪] এঁর জন্ম ১৬২০ থেকে ১৬৩০ শকাব্দের

১ পুথি সংখ্যা - ১৭৩১, ২৯৭২
২ চৈতন্যচরিতামৃত - আদি - ১০
৩ গৌ. প. ত - ভূ. পৃ - ১৮১
৪ এঁর পদাবলী সংকলন করেছিলেন কালিদাস নাথ মহাশয়। উক্ত সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় কবির-জীবনী আছে। শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর - সম্পাদিত জগদানন্দ পদাবলী গ্রন্থে এঁর বিস্তৃত জীবনী প্রদত্ত হয়েছে।

মধ্যে।[১] বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের নিকট জোফলাই গ্রামে কবির নিবাস ছিল।

জগদানন্দ নামে বংশীবদনের একজন শিষ্য 'বংশীলীলামৃত' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।[২]

বীরভূমের মঙ্গলডিহির নয়নানন্দের ভ্রাতা জগদানন্দ কতকগুলি বাংলা পদ রচনা করেছিলেন।[৩]

বিশ্বভারতী সংগ্রহে প্রাপ্ত 'জগদানন্দ' ভণিতায় ১০টি অপ্রকাশিত পদের মধ্যে 'দমিত দামিনী দাম দরপণ' ও 'চাঁচর চারু চিকুর' পদ দুটি জগদানন্দ ঠাকুরের রচনা; অন্য ৮টি পদ কোন জগদানন্দের নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। পদগুলি অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক। একটি পদ প্রহেলিকা জাতীয় সহজিয়াগন্ধী। অপ্রকাশিত ১০টি পদের সূচী 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' দেওয়া হ'ল।

নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য সুন্দরানন্দের শিষ্য জগদানন্দ ঘোষ নামে একজন কবি পদ রচনা করেছিলেন। বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'জগদানন্দ' ভণিতায় প্রাপ্ত একটি পদে 'ঠাকুর সুন্দরের' উল্লেখ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় পদটি এই জগদানন্দের রচনা। অপ্রকাশিত হওয়ায় পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো—

এহ নবদ্বীপচন্দ্র ...... মন্দিরে শুভ আরোতি।
কিবা গৌর আঙ্গে সুগন্ধি চন্দন মাল্য চম্পক মালতি॥
হৃদয়ে উল্লাসিতা ফিরয়ে সচীমাতা দেখিয়া নিজ সুত মাধুরী।
রমনীমোহন দর্শন করে নবদ্বীপ নাগরি।
ভক্ত নব নব প্রিয় সখাগণ গৌর প্রেমরসে মাতই।
মধুর-কীর্ত্তন প্রেম নর্ত্তন তাল মিদঙ্গ কি বাজই॥
ভাব নিজ নিজ ভক্ত বাঞ্ছীত গৌর প্রেমরসে বশই।
এ রসে প্রিয় মোর মোর ঠাকুর সুন্দর জগদানন্দ গায়ই॥[৪]

১ গৌরপদতরঙ্গিণী - ভূ. পৃ - ১৮০

২ বা. সা. ই - পৃ - ৬৪৫

৩ H. B. L - P - 316, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলীতে এঁর ৭টি পদ মুদ্রিত হয়েছে।

৪ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ১৭৭৫

এছাড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহে জগদানন্দ ভণিতায় 'উজ্জ্বল প্রকাশিতা' নামে একখানি গ্রন্থ আছে।[১] এটি শ্রীরূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ভণিতায় কবির নাম ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় না থাকায় ইনি কোন জগদানন্দ নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। রচনাটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হলো—

৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ শ্রীরূপ মাত্রএনো উজ্জলপ্রকাশিতা।
গুরুকৃষ্ণ ভক্ত পদে প্রণাম অনন্ত। জে কৃপায় অজ্ঞ হয় সর্ব্ব জ্ঞানবন্ত
শ্রীউজ্জলনিলমুনি নামে মহাগ্রন্থ। শ্রীরূপ করিল রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তিবন্ত ॥
ভাষারূপ লিখি তার সূত্র অনুবাদ। ...ভক্তগণ না লইবে অপরাধ ॥
উজ্জল রসেতে হয় বিস আলম্বন। ইত্যাদি।

গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্যাপি অনালোচিত।

।। গদাধর পণ্ডিত ।।

সমসাময়িক সাহিত্যে গদাধর পণ্ডিতকে রাধা, লক্ষ্মী, অথবা রুক্মিণীর অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে ইনি চৈতন্যদেবের আবাল্য সহচর। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর গ্রামে অদ্যাপি এঁর বংশধর বর্তমান।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে[২] 'গদাধর' ভণিতায় কয়েকটি অ-প্রকাশিত পদ পেয়েছি। তার মধ্যে একটি পদ চৈতন্য বিষয়ক। পদটিতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। পদটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হলো—

আরে মোর আরে মোর গোরা গুণনিধি।
দিঞা কেনো নাঞি দিল নিদারুণ বিধি ॥
ভাল হল্য আগে গেল বধু লখিমনি।
বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ হেরি বিদরে পরাণি ॥
নাট ...... ভাবিতে রিদে ...... সেল।
শ্রীনিবাস ভবন শমন সম ভেল ॥
... ...
গদাধর দাসে ভাসে শচির করুণে।
পাসান মিলাঞা জায় সয় কার প্রাণে ॥

১ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা ৩৩২
২ " " " ২০২৪

এই গদাধর-দাস গদাধর-পণ্ডিত হওয়াই সম্ভব। শ্রীবাস অঙ্গনে ইনি চৈতন্যের সঙ্গে নাটগীতে বিভোর থাকতেন; চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণে তাই তাঁর কাছে শ্রীনিবাস ভবন (শ্রীবাস অঙ্গন) 'শমন সম' মনে হয়েছে।

গদাধর দাস ভণিতায় কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদও আছে[১]। একটি পদের রচনার ছাঁদে লোচন দাসের ধামালীর শৈলীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পদটি এই রকম—

আর সুন্যাছ আরে সখি স্যাম নাগরের কথা।
কুঞ্জবনে একা আসি পাছি মোনে বেথা॥
... ...
ঝিকিমিকি কাঁচুলী পর নানা রতন তারে।
কটিতে কিঙ্কিনি জেন রুনুঝুনু করে॥
... ...
এ বড় মনের সাধ হউ তুয়া পরিবাদ সে মোর ভূষণ করি তায়।
কহে গদাধর দাসে এই সুখ অভিলাসে অনুক্ষণ মন মোর ধায়॥

ছন্দের দিক থেকে পদটিতে পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই; লিপিকর বা গায়নদের হস্তাবলেপে এই গোলমাল হয়েছে বলে মনে হয়।

ব্রজবুলি ভাষায় বাৎসল্য-পদ রচনাতেও ইনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই রকম একটি পদের অংশ-বিশেষ—

যশোমতি কৈছন তনয় তোঁহার।
ঐছন ঢীঠ মিঠ করি মানই বুঝাইলা পারি ব্যবহার।
... ...
করতালি দেই হাঁসি পুন নাচত আখিমে দেয়রি ধূল।
কাঁচুয়া ফারি হার মেরি তোরত পকরিতে ভাগত দূর॥[২]

'কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ রঙ্গ ম্লাছাড়িয়া' পদটি পদকল্পতরু গ্রন্থে 'অজ্ঞাত' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে; কিন্তু বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথিতে ওই পদটি 'গদাধর' ভণিতায় পাওয়া যাচ্ছে।[৩]

১ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২০২৪
২ ,, ,, ,, ২০২৪
৩ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ৪৫৫৩

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'গদাধর' ভণিতায় আরও ২টি এবং 'দ্বিজ গদাধর' ভণিতায় ১টি অপ্রকাশিত পদ পাওয়া গেছে। পদত্রয়ের প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে দেওয়া হলো।

গদাধর দাস ভণিতায় 'ভাগবত দশম ভাষা'র পুথি রয়েছে বিশ্বভারতী সংগ্রহে। কবির বিশিষ্ট ভণিতা,

মল্ল মহিধর নাথে কৃপা কর গোপীনাথে শ্রীহর্জুন সিংহ রঘুনাথে।
শ্রীগোপাল পদে আস দশম সঙ্গীতে ভাস ভানে গদাধর মনোরথে ॥

— পৃ - ১২৩ ক

ইনি বাঁকুড়া অঞ্চলের কবি।

।। দ্বিজ গোবিন্দ ।।

দ্বিজ গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যের আদ্য অনুচর। এঁর পুরো নাম গোবিন্দ আচার্য।[১] 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে ইনি একখানি রাধাকৃষ্ণ লীলাকাব্য রচনা করেন। চৈতন্য বন্দনার রীতি, গোপাল মন্ত্র গ্রহণ প্রভৃতি থেকে অনুমিত হয়, ইনি ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে কাব্য রচনা করেছিলেন। 'পামরী গোবিন্দ দাস' ও 'গোবিন্দদাসিয়া' ভণিতাযুক্ত পদগুলি সম্ভবতঃ গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা। তবে দু-একটি পদ এঁর রচনা হওয়া সম্ভব। এঁর পদ গোবিন্দদাস-কবিরাজ ও গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদের সঙ্গে নির্বিচারে মিশে গেছে।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'দ্বিজ গোবিন্দ' ভণিতায় একটি বাৎসল্য রসের পদ পেয়েছি।[২] পদটি অপ্রকাশিত; নিম্নে প্রদত্ত হ'লো।

৬/৭ শ্রীশ্রীহরি ॥

দিন অবসানে সন্ধ্যা সমএ গধূলি রচিত শে শ্যাম অঙ্গে
অতি সুশভিত বোনফুল মালা যুভিত হৃদএ পরি।
বোন বিহার করি ঘরে আইল হরি শব যুকর (?) ধায়।
সঙ্গে সিসুগণ শমর লায় (?) সিঙ্গা বেনু রবে ধায়।
ধেনু সবে দিন অবসানে নেহারি ব্রজবাসি সব দেখিতে ধায়।

১ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২০০৮
২ বা. সা. ই - পৃ - ২০৪
৩ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ৪৫০৮

যশোদা রুহিনি ডারে ডারায়
দেখি চান্দমুখ মলিন হঞাছে গহনে গাভীর পিছে ফিরি
জশমতি রাধা সখির সঙ্গে দেখিতে ধায় পরম রঙ্গে।
অনিমিখে চায় সমুখে ডারায় প্রেমে দুটি আঁখি পসারি
এ দ্বিজ গোবিন্দে কই এ বানি এ নিবেদন মুন অহে গুণমনি।
রাধার মন্দিরে এস গুনএ কহিতে দুজনায় নিহারি ॥

পুথিটি পেশাদার লিপিকরের লেখা নয়। সম্ভবত কোনো আনাড়ি গায়নের নকল। সেইজন্য পদের অনেক অংশ বাদ গেছে; লেখাও দুর্বোধ্য।

॥ শিবানন্দ আচার্য ॥

শিবানন্দ ও শিবাই ভণিতায় প্রচলিত বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদগুলির অন্তত একটি কুলীন গ্রাম নিবাসী শিবানন্দ সেনের রচনা। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পারিষদ এবং কবিকর্ণপুরের পিতা।[১]

রামগোপাল দাস তাঁর রসকল্পবল্লী গ্রন্থে শিবানন্দ আচার্য রচিত একটি ব্রজবুলি পদ[২] এবং শিবানন্দ চক্রবর্তী রচিত একটি পদের অংশ-বিশেষ[৩] উদ্ধৃত করেছেন। এঁরা দু'জন এক ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়।[৪] সম্ভবত এই শিবানন্দ আচার্য গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন।[৫] শিবাই ভণিতায় পদগুলি এঁর রচনা বলে মনে করা হয়। কারণ অধিকাংশ পদে গৌরাঙ্গ-গদাধর মিলনকে রাধাকৃষ্ণের মিলনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই রকম মানসিকতা গদাধরের নিকটতম অনুচরদের মধ্যে দেখা যায়। তাছাড়া, শিবাই এবং শিবানন্দ এই উভয় ভণিতায় গদাধর বন্দনা বিষয়ক পদ আছে। এর দ্বারা 'শিবাই' শিবানন্দ আচার্যের সংক্ষেপ বলে মনে হয়।[৬]

১ বা. সা. ই - পৃ - ২৯৭
২ কুঞ্জে মেঁ নিকসঞে বাহু জোরি আগোরি। —রসকল্পবল্লী - পৃ ১৬৫
৩ বিন্দাবনে রাধামাধব কেলিবিলাস। —রসকল্পবল্লী - পৃ - ১৭২
৪ বা. সা. ই - পৃ ৩০৫; H. B. L. - P - 49-51
৫ চৈতন্যচরিতামৃত—১/১২
৬ পদকল্পতরু - ৫ম খণ্ড - ২১৩

চূড়ামণি দাস

চূড়ামণি দাসের চৈতন্যচরিত কাব্যের একখানি মাত্র পুথি এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। পুথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত। ভণিতা বা অন্য কোথাও কাব্যের নাম পাওয়া যায় না। ফলে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় একদা পুথিখানির নামকরণ করেছিলেন—'ভুবনমঙ্গল'।[১] পরে তিনি এই নাম সংশোধন করে 'গৌরাঙ্গ বিজয়' নামে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন।[২]

ভণিতা থেকে জানা যায়, চূড়ামণি দাস নিত্যানন্দ অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন।[৩] এই ধনঞ্জয়-পণ্ডিত দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম রূপে বৈষ্ণব সমাজে খ্যাত। মধ্যযুগের রীতি অনুযায়ী কবি কাব্য রচনার কারণ রূপে নিত্যানন্দ-প্রভুর স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করেছেন একাধিকবার।[৪] গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলা প্রায় সম্পূর্ণ আছে। এর পরেই পুথি খণ্ডিত হয়েছে। তবে অন্যান্য চৈতন্যচরিতগ্রন্থের মতো আলোচ্য গ্রন্থখানিও আদি, মধ্য ও অন্ত—এই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল, গ্রন্থমধ্যে তার উল্লেখ আছে।[৫] শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ সম্পর্কে চূড়ামণি দাস অনেক নূতন তথ্য পরিবেশন করেছেন। এসব তথ্য তিনি ধনঞ্জয় পণ্ডিত এবং গদাধর দাস প্রমুখের নিকট সংগ্রহ করেছিলেন।[৬] শ্রীচৈতন্য কৈশোরে বঙ্গদেশে গমন করেছিলেন একথা সব জীবনীগ্রন্থেই আছে কিন্তু চূড়ামণি দাস বলেছেন, তিনি পিতৃভূমি শ্রীহট্ট পর্যন্ত গমন করেন।[৭] ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, এই বঙ্গভ্রমণের বিবরণ বিস্তৃত এবং ভৌগোলিক তথ্যসিদ্ধ। অবশ্য চূড়ামণি দাসের কাব্যে ইতিহাস ও জনশ্রুতি মিশে গেছে, সুতরাং কাব্যটিকে নির্বিচারে ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।[৮] এই মন্তব্য মধ্যযুগের বাঙ্গালা

---

১ বা. সা. ই - পৃ - ২৬২। ২ গৌরাঙ্গবিজয় (সম্পাদক ডঃ সুকুমার সেন) এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৯৭৭ খ্রীঃ প্রকাশিত।

৩ গৌ. বি. - পৃ - ৫, ১১, ৪০ ইত্যাদি।

৪ ঐ পৃ — ৪৫, ৪৮, ৭২ ইত্যাদি।

৫ ঐ পৃ - ১০৯

৬ ঐ পৃ - ৪০, ৪৫

৭ ঐ পৃ - ১০০

৮ বা. সা. ই - পৃ - ২৬৩

সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। গৌরাঙ্গবিজয় কাব্যে সেকালের সামাজিক রীতি নীতি বিষয়ে অনেক নূতন সংবাদ পাওয়া যায়।

সম্পাদক মহাশয়ের মতে, গ্রন্থখানি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল রচনার পূর্বে রচিত। কারণ, জয়ানন্দের গ্রন্থে যে গৌরাঙ্গবিজয় গীতের উল্লেখ আছে তা চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয় হওয়া সম্ভব।[১]

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'চূড়ামণি দাস' ভণিতায় একটি পদ আছে।[২] পদটি ব্রজবুলিতে রচিত; কিন্তু ভণিতাংশ আধুনিক বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি মিশ্রিত।[৩] সেইজন্য অনেকে মনে করেন, পদটি আসলে অন্য কবির রচনা, চূড়ামণি দাসের নামে চলে গেছে। অবশ্য চূড়ামণি দাস নামে স্বতন্ত্র পদকর্তা থাকাও অসম্ভব নয়। ভণিতায় আধুনিক বাঙ্গালার মিশ্রণ লিপিকরের হস্তাবলেপ-সঞ্জাত হতে পারে।

॥ জয়ানন্দ ॥

ষোড়শ শতকে রচিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল অন্যতম।[৪] গ্রন্থে বর্ণিত আত্ম-পরিচয় অনুসারে, জয়ানন্দের

১ গৌ. বি. ভূ পৃ – ২; মতান্তরে, গৌরাঙ্গবিজয় পরমানন্দ গুপ্ত রচিত।

২ পদকল্পতরু—পদসংখ্যা - ১১৪২

৩ কত কত ভকত যতন কার খ্যাওত সবে চূড়ামণি দাসের এই নিবেদন।

৪ সম্পূর্ণ পুথি - গ ৫৩৯৮। লিপিকাল ১০২৬ সাল (মল্লাব্দ)। বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'চৈতন্য-মঙ্গলের' ৮ খানি পুথি আছে। যথা বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ১৬৮৭ (বৈরাগ্যখণ্ড), ১৯০৩ (ঐ), ২৫৩১ (জগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য), ৩৪৬১ (ধ্রুবচরিত্র; লিপিকাল ১২১১ সাল; তাং ১২ আষাঢ়), ৩৮৬০ (ধ্রুবচরিত্র), ৪২৬১ (বৈরাগ্যখণ্ড ও ধ্রুবচরিত্র), ৪৭৫৫ (জগন্নাথ বন্দনা), ৫৯৫৩ (ধ্রুবচরিত্র), ইত্যাদি।

৺ বিমানবিহারী মজুমদার ও শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম-সম্পাদনায় গ্রন্থখানির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারের উদ্যোগে। এই সংস্করণে বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পাদনার কাজে আমরাও সাহায্য করেছি।

পিতা 'পরম ভাগবত' সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতা রোদনী। গড় মান্দারণের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বায়ড়া-পরগনার অন্তর্গত আমাইপুরা গ্রামে এঁদের নিবাস।[১] জয়ানন্দের ডাক-নাম ছিল 'গুহিয়া'; পরে 'জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে।' বাল্যকালে ইনি চৈতন্যদেবের আশীর্বাদ লাভ করেন।[২]

গদাধর পণ্ডিত (বা দাস), অভিরাম গোসাঞি (নিত্যানন্দ-প্রভুর অন্যতম প্রধান শিষ্য) ও বীরভদ্র গোসাঞি (নিত্যানন্দের পুত্র) প্রমুখের আজ্ঞায় ইনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন।[৩] সুতরাং কাব্য রচনার কাল অন্তত ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশক। জয়ানন্দ একবার নিজেকে 'অভিরাম গোসাঞির দাস' বলে বর্ণনা করেছেন।[৪]

পূর্ববর্তী চৈতন্যচরিত রচয়িতাদের মধ্যে ইনি বৃন্দাবন দাস গৌরী-দাস-পণ্ডিত, পরমানন্দ গুপ্ত ও গোপাল বসুর নামোল্লেখ করেছেন। এছাড়া, গ্রন্থে কৃত্তিবাস, গুণরাজ খান, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ কবিগণের উল্লেখ আছে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধ রীতি অনুসারে রচিত হয় নাই সেইজন্য গ্রন্থখানি চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের মতো গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সমাদর লাভ করে নি।[৫] এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কি না বিচার্য তবে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে, শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যায়। অন্যান্য তথ্যাবলীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কিত ঘটনাটি বাস্তবানুগ বলে মনে হয়। এই গ্রন্থেই

১ বর্তমানে আমাইপুরা নামে কোনো গ্রামের সন্ধান এতদঞ্চলে পাওয়া যায় না। বর্তমান হুগলী জেলার গোঘাট ইউনিয়নের প্রাচীন গৌড় পুরী বা বাদশাহী সড়কের উপর অবস্থিত আমোদপুরা গ্রাম প্রাচীন আমাইপুরা নামের তৎসম রূপ হতে পারে। —আরামবাগের ইতিকথা - পৃ - ৫৪

২ চৈতন্যমঙ্গল - পৃ ৩

৩ চৈতন্যমঙ্গল - পৃ - ৩

৪ চৈতন্যমঙ্গল - পৃ - ৮৯

৫ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য - ১/৮১

চৈতন্যদেবের আদ্য অনুচর গোবিন্দ-কর্মকারের উল্লেখ আছে।[১] পক্ষান্তরে, গ্রন্থখানিতে কল্পনাশ্রিত অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেজন্য জয়ানন্দের গ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে দোষারোপ করা অনুচিত। এটি মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কবিকর্ণপূর (পরমানন্দ সেন)

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ কুলীনগ্রামবাসী শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপূর।[২] প্রেমানন্দ, পরমানন্দ, পুরীদাস প্রভৃতি নামেও ইনি পরিচিত ; তবে 'কবিকর্ণপূর' রূপেই বৈষ্ণব সমাজে এঁর খ্যাতি ছিল অধিক। পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপূরের জন্ম, শৈশবে চৈতন্যদেবের আশীর্বাদপ্রাপ্তি সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।[৩]

ইনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষার কবি। চৈতন্যচন্দ্রোদয়, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা নাটক দু'খানি চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। এঁর রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, আনন্দবৃন্দাবন-চম্পু প্রভৃতি গ্রন্থরাজি সংস্কৃত সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি। রসসাহিত্য ছাড়াও ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর ইনি সমূহ আলোকপাত করেন। অলঙ্কার কৌস্তুভ, আর্যাশতক (আর্যাছন্দে রচিত সংস্কৃত কবিতার একশ বছর) এঁর রচনা।[৪]

এঁর রচিত অধিকাংশ পদ চৈতন্যবিষয়ক। পদকল্পতরু গ্রন্থে 'পরমানন্দ' ভণিতায় ১২টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে।[৫] তার মধ্যে বাঙ্গালা, ব্রজবুলি ও খাঁটি ব্রজমণ্ডলের ভাষায় (ব্রজভাষা) রচিত পদ আছে। পদগুলির রচনারীতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

১ চৈতন্যমঙ্গল - পৃ - ৮৩

২ চৈতন্যচরিতামৃত - আদি - ১০/৬২

৩ পদকল্পতরু - ৫ম খণ্ড পৃ - ৫২

৪ উক্ত গ্রন্থগুলির রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কোনো সর্ববাদিসম্মত মত পাওয়া যায় না ; তবে অধিকাংশ সমালোচকের মতে, ষোড়শ শতকের চতুর্থ থেকে সপ্তম দশকের মধ্যে গ্রন্থগুলি রচিত।

৫ পদকল্পতরু - ৫ম খণ্ড - পৃ - ৫২

॥ জ্ঞানদাস ॥

ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর একটি পদে জ্ঞানদাসের বন্দনা পাওয়া যায় এইরূপ—

শ্রীবীরভূমেতে ধাম কাঁদরা মাদরা গ্রাম তথায় জন্মিলা জ্ঞানদাস।
আকুমার বৈরাগ্যেতে রত বাল্যকাল হৈতে দীক্ষা লইলা জাহ্নবার পাশ ॥
... ...
খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে বাবা আউল ছিল সহচর।[১]

বর্তমানে কাঁদরা গ্রাম বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত আমোদপুর-কাটোয়া রেলপথের রামজীবনপুর রেলস্টেশনের নিকটবর্তী। বর্তমানে গ্রামটি 'জ্ঞানদাস-কাঁদরা' রূপে খ্যাত। একদা উক্ত অঞ্চল বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কবির স্মরণে আজও কাঁদরায় বৈষ্ণব সম্মেলন ও মেলা হয়। আশ্বিনের কৃষ্ণা নবমী থেকে প্রতিপদ পর্যন্ত চলে সাঁজি উৎসব। পৌষ সংক্রান্তিতে 'বৈষ্ণব মহোৎসব' তিনদিন চলে। কাঁদরা গ্রামের শ্রীপাট মন্দির বিগ্রহাদির সঙ্গে কবি জ্ঞানদাসের স্মৃতি বিজড়িত। এই অঞ্চলের জনশ্রুতি অনুসারে, জ্ঞানদাস ছিলেন একাধারে কবি ও সাধক। এঁর সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

জ্ঞানদাসের অন্যতম সুহৃদ বাবা আউল সম্ভবত মনোহর দাস। কথিত আছে 'পদসমুদ্র' নামে ইনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন। ইনি নিজেও একজন কবি ছিলেন। বদনগঞ্জে এঁর সমাধি আছে। মনোহর দাসের ভ্রাতা কিশোর দাস জ্ঞানদাসের পাটের প্রথম মোহান্ত। অদ্যাপি কাঁদরায় কিশোর দাসের বংশধর বর্তমান। জ্ঞানদাস, বাবা আউল প্রমুখের সমাবেশে তৎকালে কাঁদরা বৈষ্ণব সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

জ্ঞানদাস ছিলেন নিত্যানন্দ-প্রভুর শাখাভুক্ত। নিত্যানন্দের অন্যতমা পত্নী জাহ্নবা দেবীর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।[২]

১ গৌরপদতরঙ্গিণী - ৪৭০ ; ভক্তিরত্নাকর - ১৪শ তরঙ্গ।
২ চৈতন্যচরিতামৃত - ১/১১

ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম। ইনি যুগপৎ বাঙ্গলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। তবে বাঙ্গালা পদগুলি ব্রজবুলি পদের তুলনায় উৎকৃষ্ট। সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল, রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল, ইত্যাদি পদ পদাবলী-প্রিয় বাঙ্গালীর কাছে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'জ্ঞানদাস' ভণিতার ৬০টি অপ্রকাশিত পদ পাওয়া গেছে ; তন্মধ্যে তিনটি পদ গৌরাঙ্গবিষয়ক। পদগুলির প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে উদ্ধৃত হ'লো।

'জ্ঞানদাস' ভণিতায় একটি বৈষ্ণব আগম নিবন্ধ পাওয়া গেছে 'ভাগবত-তত্ত্বলীলা' বা ভাগবতোত্তর নামে। ভণিতা এইরূপ—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ যুগ করি আশ। ভাগবতোত্তর কিছু কহে জ্ঞানদাস।[১]

গ্রন্থটি আলোচ্য জ্ঞানদাসের রচিত কিনা সন্দেহ আছে।

॥ লোচনদাস ॥

লোচন (ত্রিলোচন[২], সুলোচন বা লোচনানন্দ[৩]) দাসের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ আছে।[৪] সুতরাং কাব্যটি বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ রচনার পরবর্তিকালে রচিত। কিন্তু কত পরের রচনা তা সঠিক না জানা গেলেও অনুমান করা হয় অন্তত কুড়ি-পঁচিশ বছর পর। কারণ পুথি অনুলেখনের যুগে কোনো গ্রন্থ সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সময়সাপেক্ষ ছিল।

সেকালের রীতি অনুযায়ী লোচনদাস কাব্যমধ্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।[৫] কবির জন্মস্থান কোগ্রাম বর্তমান বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গ্রামটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-মণ্ডিত। কোগ্রামে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে, লোচনদাস বিবাহের পর দাম্পত্যজীবন অবহেলা করে স্বগ্রাম পরিত্যাগ করেন। সেইজন্য তাঁর স্ত্রী

১ বা. সা. ই - পৃ - ৩০৩

২ রস উপার্জন গ্রন্থ কহে ত্রিলোচন দাস। - পৃ ২৬৭ বি. ভা. পু - ৬২৩০, ৬২৬২

৩ এই রস লোচনানন্দ করিল বর্ণন। - পৃ - ৪০৭ ঐ ৫৮৩৩

৪ শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিত্তে। জগতে মোহিত যার ভাগবত গীতে। —চৈতন্যমঙ্গল (বঙ্গবাসী - ১৩২৫) পৃ - ২

৫ চৈতন্যমঙ্গল - পৃ - ১৯০

গ্রামের নাম দিয়েছিলেন কুগ্রাম। সেই থেকে কুগ্রাম লোকমুখে কোগ্রাম বা কোগাঁ নামে প্রচলিত হয়েছে।[১]

কিন্তু এ জনশ্রুতি ভিত্তিহীন। কোগ্রাম নাম অনেক পূর্বের। তা না হলে কবি লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলে কোগ্রামের উল্লেখ করতেন না।

লোচনদাস নিকটবর্তী শ্রীখণ্ডে গিয়ে নরহরি সরকারের কাছে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামগোপাল দাসের বর্ণনা অনুসারে, ঘটনাচক্রে গুরু নরহরি সরকারের প্রাণরক্ষার জন্য লোচন দাসকে ফিরিঙ্গি (পোর্তুগীজ) বণিকদের কাছে জামিন থাকতে হয়েছিল।[২]

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' ও 'দুর্লভসার' গ্রন্থের রচয়িতা রূপে সুপরিচিত। এছাড়াও বিশ্বভারতী সংগ্রহে লোচনদাস ভণিতাযুক্ত অনেক রচনার সন্ধান পেয়েছি। 'রসভক্তিকল্পলতিকা' তারমধ্যে অন্যতম।[৩] গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দ সংবাদে নিত্যতত্ত্ব

১ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি - পৃ - ২৬৭ ; চৈতন্যচরিতামৃতে কুগ্রাম শব্দটি ক্ষুদ্র গ্রাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। —কুগ্রাম কুগ্রাম দিয়া করিল পয়ান। - চৈ. চ. অন্ত্য - ৬/১৮৭

২ শাখানির্ণয় - পৃ - ২০৭

৩ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২৩৭০। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা — ৬

আরম্ভ, ৺৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম ॥

বন্দে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান। তোমার পাদারবিন্দে ভক্তি দেহো দান ॥
শ্রীগুরু চরনারবিন্দ ভরসা কেবল। জাহা হৈতে প্রেমভক্তি পাবো সকল ॥
নিত্যতত্ত্ব.........মানুষ বিচার। আশ্রয় জাতি.........প্রেমরস সঞ্চার ॥
রাগভক্তি নিরোবণ মানুস মহিমা। মানুষের তত্ত্ব আর নিধুবন সিমা ॥

... ...

মুঞি সে অজ্ঞা এহা কি লিখিতে পারি। শ্রীরূপ চরণ মাত্র ভরসা আমারি ॥
এইসব তত্ত্ব রসের নবিন নির্জাস। রামানন্দের মুখে এই করিব প্রকাশ ॥
নিভৃতে একদিন শ্রীস্বরূপ গোসাঞি। নিত্যকথা জিজ্ঞাসিলা রামানন্দের ঠাঞি ॥

... ...

শ্রীরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন। এই সব লীলা আর না জানে অন্যজন ॥
এই তত্ত্ব আপনে শ্রীচৈতন্য গোসাঞি। শক্তি সঞ্চারিয়া সুনিল রায় ঠাই ॥
এই সব কথা জেনে জিবে নাহিক সন্ধানে। তবে ত আমার মুখ হয় মনে মন ॥
অপ্রাকৃত তত্ত্ব এই মানুস বিচার। উপাস করিলে এহা বুঝিতে শক্তি কাহার।

লিলাতত্ত্ব, মানুষ বিচার, রাগভক্তি বিবোরণ ইত্যাদি। ভণিতায় কবি গুরু নরহরির পাদপদ্ম স্মরণ করেছেন যথারীতি।[১] রচনাটি আলোচ্য লোচন দাসের লেখনীজাত হওয়া অসম্ভব নয়।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে প্রাপ্ত 'রসউপার্জন' গ্রন্থে ভণিতা আছে—ত্রিলোচন দাস।[২] রচনার [প্রাপ্ত অংশের] নমুনা,

দশচন্দ্র কর জুগ কহিনু বিবরি। .... ॥
মুখচন্দ্র সভা করে কি দিব তুলনা। দুই গণ্ডে দুই চন্দ্র নাহিক উপমা ॥
আর এক গুপ্ত চন্দ্র দিপ্ত করে। ময়ূরের পুশ্চ চন্দ্র সিরার উপরে ॥
এই ত কহিলাম নায়কের সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। এবে কহি নাইকার এই মত ছন্দ ॥ পৃ-১৩ক

বন্দনাংশ,

.... । জাহার কৃপাতে পাই চৈতন্য নিতাই ॥
বৃন্দাবন বাশি জত বৈষ্ণবের গণ। সবে মেলি দোষ ক্ষম হঞ কৃপাবান ॥
নিলাচল বাশি জত মহাপ্রভুর ভক্ত। সবার চরণ বন্দ হয়ে অনুরক্ত ॥
মহাপ্রভুর ভক্ত জত গৌর দেশে স্থিতি। সবার চরণে আমি করি জে প্রনতি ॥
পৃ-২৬খ

গুরুরূপে নরহরির উল্লেখ আছে—
শ্রীনরহরি পদে মোর সদা রহুক আস। রসউপার্জন গ্রন্থ কহে ত্রিলোচন দাস ॥ পৃ-২৬খ

কবি রচনার এক স্থলে উল্লেখ করেছেন 'জয় জয় গুরু গোঁসাই স্মরণ তাঁহার' এবং ইনি কবিকে 'ক্লিং চৈতন্যয়া শাহা' এই অষ্ট অক্ষর মন্ত্র দান করেন[৩] এই গুরু গোসাই যে 'নরহরি সরকার' তারও কোনো নিশ্চিত প্রমাণ

১ শ্রীনোরহরির পাদপদ্ম মনে করি আস। রাগভক্তিকল্পলতিকা কহে লোচনদাস ॥
- পৃ - ৩খ

২ বিশ্বভারতী পুথি—৬২৩২ [৬২৩০]। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা—১৬-২৬
বেলাড়ি (হাওড়া) থেকে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কয়াল মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত।
ভণিতা, তাহাদের চরণে মোর সদা রহুক আস। রস উপার্জন গ্রন্থ কহে ত্রিলোচন দাস ॥

৩ এই মহামন্ত্র পঞ্চনাম স্থান। এই পঞ্চনাম কৃষ্ণ করিয়া সাধন ॥
কৃষ্ণদেহ গোউর হইল বুঝে কোন জন ॥ অথ চৈতান্যের মন্ত্র ॥
ক্লিং চৈতানয়া শাহা।
এই অষ্টঅক্ষর মন্ত্র গুরু গোসাঁই দিল। সং চৈতন্যলিলা তবে হৃদে প্রকাশিল ॥
—পৃ - ২০ক

নেই। তাছাড়া, গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা শিষ্যের পক্ষে একান্তভাবে নিয়মবিরুদ্ধ। রচনার মধ্যে প্রশ্নোত্তর[১] অংশটি প্রমাণ করে ইনি 'লোচনদাস' নামধেয় পরবর্তিকালের কবি।

'লোচনদাস' ভণিতায় 'মহাভাগবতকথা' নামে একটি রচনা পেয়েছি বিশ্বভারতী[২] পুথি সংগ্রহে। রচনার অংশ-বিশেষ—

.... । ....কৃষ্ণের চরণে ॥
আমার মনে প্রেমভক্তি হয় কেন মতে। সাক্ষাতে ভাব উপজে কেমতে ॥
তেকারণে য়ার কিছু কহি বিবরিঞা। সর্বত্রে ভাবিঞা দেখ দেখ বিচারিঞা ॥
ইত্যাদি ॥

ভাষায় প্রাচীনত্বের চিহ্ন সুস্পষ্ট। গুরুরূপে কবি নরহরির উল্লেখ করেছেন—সকল ভরসা নরহরির চরণ। পৃ-৩২খ। রচনাটি কবির পরিণত বয়সের—কহএ লোচন দাস দিন তিন বৃদ্ধে। পৃ-৩৪ক। রচয়িতা চৈতন্যমঙ্গলকার লোচনদাস হওয়া সম্ভবপর।

'গুরুসিদ্ধপ্রণালী' নামে লোচনের ভণিতায় একটি রচনা পেয়েছি বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে।[৩] এই রচনাই 'পঞ্চেন্দ্রিয়তত্ত্ব' নামে পাওয়া যায়।[৪] রচনাটি পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হ'লো।

বিশ্বভারতী পুথি ১৭০৬। গুরুসিদ্ধ প্রণালী ॥ খাতার আকারে বাঁধানো। সম্পূর্ণ ॥
শ্রীগুরুদেবীং অম্বিকামঞ্জুরী সিদ্ধনাম। অনঙ্গমঞ্জুরী......পঞ্চনিভা বস্বরাং
বসন্ত কেতুকী বর্ণ অরুণ কাঞ্চলী খোপাল (খেলায়) বিজলী বয়স ১২
বৎসর রাধার মন্দিরে বাস শিঙ্গবাস সেবা। অম্বুজ কুঞ্জে শ্রীগুরুর পাদ
পদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া এই সকল স্মরণ মনন করিতে হয়। (পৃ-৪৩ক)
প্রথম ইন্দ্রিয় হয় শ্রীরূপমঞ্জরি। মদন মাদন বাণ রূপে যুক্ত করি ॥

চৈতন্য গায়ত্রি ॥ এই দিক্ষা কি দিক্ষা। দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র। পুন গায়ত্রি কি। কাম গাইত্রি ॥ এই বিজ কি বিজ। কাম বিজ ॥ এই রতি কোন রতি। সামন্ত রতি। এই জোবন কোন জোবন। ব্যাক্ত জোবন। এই ধাম কি ধাম লিলা বৃন্দাবন। ....দেশ কি বৃন্দাবন। কাল কি নবদ্বীপ। পাত্র কে। রূপ গোস্বামী। ইত্যাদি। —পৃ - ২২খ

বিশ্বভারতী পুথি - ৩৯৯৬। খণ্ডিত।

বিশ্বভারতী পুথি - ১৭০৬ ; ৪ বিশ্বভারতী পুথি - ৪২৭৭

দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় হয় শ্রীরতিমঞ্জরি। শ্রবন তাহার নাম দেখহ বিচারি ॥
তৃতীয় ইন্দ্রিয় হয় কস্তুরিমঞ্জরি। রসনাতে বৈসে করে রসের লহরী ॥
চতুর্থ ইন্দ্রিয় হয় শ্রীরসমঞ্জরি। রসনাতে বৈসে করে রসের লহরী ॥
স্পর্শ গুণ হয় অঙ্গে বিলাসমঞ্জরী। মদন কন্দর্প সেই আনে স্পর্শ করি ॥
ভণিতা,
রূপাশ্রয় বিনা ধর্ম্ম কেহ নাহি জানে। কহয়ে লোচন গোপী ভাবের লক্ষণে।

পৃ-৪৪খ

পুষ্পিকা—ইতি সন হাজার ৭৮ সাল। তারিখ ১৭ই সতরঙ আষাঢ় সাকিম দক্ষিণ খণ্ড। লিখিতং শ্রীপদ্মনাভ ঠাকুর জীউ ॥
১লা আশ্বিন নকল হইল। ৺ নৃসিংহ প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দপ্তর হইতে সংগৃহীত। শ্রীপ্রফুল্লমোহন চট্টরাজ ১৩৩৯ সাল।

দক্ষিণ খণ্ড—
পোঃ বনওয়ারী বাদ............
জেলা মুর্শিদাবাদ· ....

ভণিতায় কবির নাম ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় নেই। ইনি কোন্ লোচন বলা দুরূহ।

'লোচনদাস' ভণিতায় 'ভক্তিরসকৌমুদী' নামে আর একটি রচনার সন্ধান পেয়েছি বিশ্বভারতী সংগ্রহে।[১] কবি গুরুরূপে আচার্য ঠাকুরের নামোল্লেখ করেছেন। বন্দনাংশে ছয় গোস্বামী, দ্বাদশ গোপাল, চৌষট্টি মাহান্ত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উল্লেখ আছে।[২] কাব্যটি নিশ্চয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল। পুথির পুষ্পিকায় প্রদত্ত তারিখ সন ১০১২ সাল (মল্লাব্দ) লিপির তারিখ না হয়ে কাব্য রচনার সমাপ্তির তারিখ-ও হতে পারে।[৩]

১ „ „ ৫৭১৩। পত্র সংখ্যা -১-৮। সম্পূর্ণ।
২ বন্দিব গুরুর পদ আচার্য ঠাকুরে। দ্বাদশ গোপাল বন্দ ছয় গোসাঞ্রে ॥
চৌসট্টি মাহান্ত বন্দ উপমাহান্ত জাত। শাক পাক সহিতে বন্দ প্রভুর ভকত ॥ -পৃ ১ক
৩ তাহাতে সুনহ মোর এই নিবেদন। কায়মনোবাক্যে ভাই ছাড়হ নিন্দন ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে গুণ করিলে কির্ত্তন। অবশ্য মিলিবে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনে এক হন। ভক্তিরসকৌমদি কহে এ দাস লোচন ॥
সন ১০১২ সাল। তারিখ ১৩ পৌষ। -পৃ-৮খ

পরবর্ত্তিকালে বৈষ্ণবীয় পরম্পরায় 'লোচন দাস' নামধেয় একাধিক কবি সাহিত্য সৃষ্টি করেন। এইরূপ অনেক তত্ত্বনিবদ্ধ জাতীয় রচনা আছে বিশ্বভারতী সংগ্রহে। তন্মধ্যে 'বস্তুতত্ত্বসার'[১] কড়চা[২] অন্যতম। এগুলি লোচন দাসের শিষ্যদের লেখনীজাত হতে পারে। নিজের রচনা গুরুর নামে প্রচার করে হয়ত-বা তাঁরা গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন।

ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাগণের মধ্যে লোচনদাস অন্যতম। পদকল্পতরু গ্রন্থে ২৯টি এবং বৈষ্ণব পদাবলী (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) গ্রন্থে ৫৮টি লোচনদাস ভণিতাযুক্ত পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এছাড়া, বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'লোচনদাস' ভণিতার শতাধিক অপ্রকাশিত পদের সন্ধান পেয়েছি। পদগুলির প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে উদ্ধৃত হলো। প্রত্যেকটি পদই যে চৈতন্যমঙ্গল-খ্যাত লোচনদাসের লেখনীজাত এরকম কোনো সিদ্ধান্ত আমার নেই।

লোচনের অধিকাংশ পদ সাহিত্যের ইতিহাসে 'ধামালি' নামে পরিচিত। ধামালি শব্দটি মূলত অসমীয়া 'ধেমালি' শব্দজাত বলে মনে করা হয়। মতান্তরে, ধর্মঠাকুরের পূজায় অনুষ্ঠিত বাকোবাকো বা প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়ায় ধামালীর আদি রূপ লক্ষ্য করা যায় বলে পণ্ডিতদের ধারণা। ধর্মপূজার এই বাকোবাকোর ভাষায় প্রায়শই শ্লীলতার গণ্ডি অতিক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রাচীন সাহিত্যে 'ধামালী' শব্দটি পরিহাসবাক্য[৩], রতিক্রিয়া[৪] প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। শিশুর দুরন্তপনা অর্থেও শব্দটির প্রয়োগ আছে।[৫] লোচন দাসের ধামালি পদগুলি প্রায়ই লঘুভঙ্গিতে রচিত। ছন্দের দিক থেকেও চটুল ছড়ার ছন্দ বা দলমাত্রিক ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আপনি যেমন পরকে তেমন শতেক ভাতারি।[৬] তোমরা নাকি বল আমি কানুর সঙ্গে আছি,[৭] ভাতার ছাড়্যা ভাতার করে ভালো খাবার তরে,[৮] ইত্যাদি পদে সর্বত্র শ্লীলতা রক্ষিত

---

১ বিশ্বভারতী পুথি - ৩১৫; বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য পুঁথি পরিচয় ১ম খণ্ড পৃ - ১৫৮

২ " " ৫০৩ " " " " ২য় খণ্ড - পৃ - ২১০

৩ মোরে কেহে বোলএ ধামালী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন - পৃ - ৩৫

৪ রাধা কানুর ধামালী - ঐ ম - পৃ - ৬৫-৬৬

৫ আমার ছাওয়াল বড়ই ধামাল - চৈ - ম - পৃ - ৪৮

৬ বিশ্বভারতী পুথি - ৩১৭৫; ৭ ঐ ৪৬৬৪-৮৫; ৮ ঐ - ৪৬৬৪-৮৫

হয়নি। সুতরাং এদিক থেকেও পদগুলিকে ধামালি নামে চিহ্নিত করার অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। বীরভূমে লোকমুখে প্রচলিত হাপুগানের মধ্যে ধামালি-শৈলীর অনুবৃত্তি লক্ষণীয়।

'লোচনদাস' ভণিতায় বিশ্বভারতী সংগ্রহে কিছু রাগাত্মিক পদ পাওয়া যায়। এই জাতীয় একটি পদ (অপ্রকাশিত) উদ্ধৃত হলো—

রাগের ভজন বিসম বড়। মরুখে না পারে করিতে দড় ॥
রাগ বলিয়া মরুখে বলে। না জানে রাগ মিছার ভুলে ॥
জানিতে জানয়ে ভকতি তত্ত্ব। তারে না মরে মিছাএ মর্ত্ত ॥
মদমর্ত্ত বলে আমি সে জানি। না পায় উদ্দেশ ভুবন ভূমি ॥
বিশ্বাস না করে কাহার কথা। না জানে রসিক বসতি যথা ॥
রসিকের গতি রসিক জানে। রসিক জে জনা রসিক চিনে ॥
বৃথা তাহার ভাবনা সার। লোচন ভনএ কি হবে তাহার ॥[১]

রাগাত্মিক পদগুলি চৈতন্যমঙ্গলকার লোচন দাসের হওয়া অসম্ভব নয়।[২] রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের শ্লোকগুলি লোচন বাংলা পদে রূপান্তরিত করেন।[৩]

॥ রঘুনাথ ভট্টাচার্য ঃ রঘুপণ্ডিত ঃ ভাগবতাচার্য ॥

বরাহনগরবাসী রঘুনাথ-আচার্য ভাগবতাচার্য নামে সাধারণে খ্যাত ছিলেন। কবির এই উপাধি শ্রীচৈতন্যপ্রদত্ত।[৪] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শাখা বর্ণন অংশে ভাগবতাচার্যের একাধিক উল্লেখ থেকে মনে হয়, সেকালে ভাগবতাচার্য উপাধি বহুল প্রচলিত ছিল।

রঘুনাথ ভট্টাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' ভাগবতের ধারাবাহিক অনুবাদ। বিশ্বভারতী সংগ্রহে উক্ত কাব্যের একটি পুথিতে[৫] নাম পাওয়া যায় 'প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী'। এটি কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর নামান্তর। কাব্যখানি

১ বিশ্বভারতী পুথি - ১৯৩৯
২ বা. সা ই - পৃ - ২৫০
৩ H B L - P - 64
৪ চৈতন্যভাগবত - অন্ত - ৫ম অধ্যায়
৫ বিশ্বভারতী পুথি - ২১৫০

একত্রিংশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। কবি বহু স্থানে গুরু রূপে গদাধরের নাম উল্লেখ করেছেন।[১]

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচনা সংযত ও মূলানুগ। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে আকুলা ব্রজ রমণীগণ গৃহকর্ম ত্যাগ করে কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হলে কৃষ্ণ তাঁদের কুলবধূর আচরণ সম্পর্কে উপদেশ দান করেছেন—

আমাকে দেখিলে গোপী বড়ই সুন্দর। সিঘ্র জাহ সুন্দরি চলিঞা নিজ ঘর॥
নারিকুলে মোক্ষধর্ম্ম পতির সেবন। পতি বন্ধু……পোসন পালন পরিজন॥
রোগ ক্ষত উদ্ধত দরিদ্র ষড়মতি। তবু পতি না ছাড়িব নারি গুণবতি॥
নিজপতি ছাড়ি জেবা পরে করে মন। কুলে অবজস হঞ নরকে গমন॥[২]

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' কবিকর্ণপূর ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর উল্লেখ করেছেন।[৩] গৌরগণোদ্দেশদীপিকা রচিত হয়েছে ১৪৯৮ শকাব্দায়।[৪] কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী এর পূর্বে রচিত। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজন পুথি অনুলেখনের যুগে গ্রন্থখ্যাতি প্রচার হওয়া সময়সাপেক্ষ ছিল।

রঘুনাথ-ভাগবতাচার্যের অন্য গ্রন্থ শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়।[৫] বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটি সম্পূর্ণ ও প্রাচীন পুথি রয়েছে।[৬] পুথিতে মূল শ্লোক এবং অস্যার্থ আছে। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে কেবল মাত্র অস্যার্থ আছে মূল শ্লোক নাই। মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে পুথির পাঠে স্থানে স্থানে গুরুতর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

১ জ্ঞান গুরু গদাধর ধির সিরোমণি। ভাগবত আচার্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥ - পৃ - ৫ক
বা ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান। ভাগবত আচার্য মধুর রস গান॥ পুষ্পিকা পত্র

২ বিশ্বভারতী পুথি - ১১১ (পুথি পরিচয় - ১ম খণ্ড পৃ - ২৩২)

৩ নিম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লবঃ॥
শ্লোক - ২০৩

৪ শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈবযুক্তে গ্রন্থোঽয়মাবির ভবৎ॥

৫ প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত।

৬ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২২৮৫। পত্র সংখ্যা - ১-৩১। লিপিকাল শকাব্দ ১৭১২
তারিখ ১১ কার্ত্তিক

॥ বৃন্দাবন দাস ॥

বর্তমান বর্ধমান জেলার দেনুড়-নিবাসী বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত রচনা করে সেযুগে 'চৈতন্যলীলার বেদব্যাস' খ্যাতি অর্জন করেন।[১] এঁর জন্মকাল সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য থাকলেও ১৫১৫—২০ খ্রীষ্টাব্দ বৃন্দাবন দাসের জন্মসন হিসাবে গ্রহণযোগ্য।[২]

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হইল। হেন মহা মহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥' অনেকের মতে, কবির এই খেদোক্তি চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করতে না পারার জন্য। পক্ষান্তরে, অনেক সমালোচক ধারণা করেন, চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলা প্রত্যক্ষ করতে না পারার জন্য কবি এইরূপ খেদ করেছেন। যাই হোক কবির কালনির্ণয়ের পক্ষে এটি একান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য বলে মনে করার কারণ নেই। কারণ সেযুগে এই রকম খেদোক্তি করা একটি প্রথায় (Poetical Convention) পরিণত হয়েছিল। কবিকর্ণপূর-ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অনুরূপ খেদ করেছেন।[৩]

কবির জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তা অবান্তর। প্রেমবিলাসের বর্ণনা অনুসারে,

কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস যিঁহো।
তাহার সহিত নারায়ণীর হৈল বিবাহ ॥
তাঁর গর্ভে জনমিলা বৃন্দাবন দাস। ১৩শ বিলাস।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' আদি ও প্রামান্য চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ। কথিত আছে, গ্রন্থখানির প্রথম নাম ছিল চৈতন্যমঙ্গল: পরে কবিমাতা নারায়ণী গ্রন্থের নামকরণ করেন চৈতন্যভাগবত। মতান্তরে, বৃন্দাবনের মহান্তগণ গ্রন্থখানি ভাগবত আখ্যা দান করেন। সে যাই হোক, চৈতন্যভাগবত রূপেই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজ সবিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

---

১ সর্ব্বশাস্ত্র কৈল জেঁহো নাম বেদব্যাস। নারায়ণি সুত সেই বৃন্দাবন দাস ॥
- পৃ - ১৩ক; ৩৩২৯

২ বা. সা. ই - পৃ - ২৪০;

৩ চৈতন্যচন্দ্রোদয় - পৃ - ১৩৭

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'বৃন্দাবন দাস' ভণিতায় 'শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত' নামে একটি রচনা পেয়েছি। কবি বলরামের ভক্ত। বন্দনাংশে বা কাব্যের অন্য কোথাও শ্রীচৈতন্যের নাম পাওয়া যায় না। মনে হয়, কবি চৈতন্য পরবর্তী। ভণিতাদৃষ্টে অনুমান হয় কবি পুরুষোত্তমে বাস করতেন।[২] এই কাব্যের আর একটি প্রতিলিপি আছে বিশ্বভারতী সংগ্রহে।[৩]

বৃন্দাবনদাস ভণিতাযুক্ত 'বৈষ্ণব মাহাত্ম্য' নামক একখানি পুথি আছে বিশ্বভারতী সংগ্রহে।[৪] গ্রন্থের উপস্থাপনা রীতি এবং ভণিতা চৈতন্যভাগবতের অনুরূপ। গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি নিত্যানন্দ পদে প্রণতি জানিয়েছেন এইভাবে—

৶৭ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রায় নমঃ॥ বন্দেহং করুণাসিন্ধুং বৈষ্ণবং কৃষ্ণবিগ্রহেং ভববারি নিমগ্নামং শরং বৈষ্ণব প্রদং॥

প্রথমে বন্দিব শ্রীগুরুর চরণারবিন্দ। নিরবধি ঝরে জার কৃপা মকরন্দ॥
অজ্ঞান তিমির নাশে জার বাক্যামৃতে। বিশম সংসার বন্ধন ঘুচে জাহা হৈতে॥

১ বিশ্বভারতী পুথি - ২২০৫। পত্র সংখ্যা - ১-৫০। সম্পূর্ণ।
আরম্ভ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ।। নারায়ণ নমস্কৃত্যং নরোঞ্চৈব.........দেবি সুরেস্বতিঞ্চৈব ততো জয় মাদিবএৎ ।।
গনোপতি বন্দো আগে করিঞা প্রণাম। বিঘ্ন বিনাস হয় পুরে মনস্কাম ॥
সাবিত্রি সহিত বন্দো দেব প্রজাপতি। বৈকুণ্ঠেস্বরী বন্দো লক্ষ্মী স্বরেসতী ॥
ভূমিতে কবিল স্তির বন্দো নারায়ণ। সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম জার আভরণ।
পার্ব্বতি শঙ্কর বন্দো কৈলাশ ঈশ্বরে। শমন গমন নাহি জার অধিকারে ॥
সিবের চরণ বন্দো অতি সুদ্ধমতি। দস অবতার বন্দো করিঞা ভকতি ॥
মৎস কূর্ম্ম বরাহস্য নৃসিংহ বামন। ভৃগুরাম শ্রীরামের বন্দিঞা চরণ ॥
ভক্ত কবি বন্দো বলরামের চরণে। তোমা বহি গতি নাহি জিবনে মরণে ॥
ইহকালে পরকালে তুমি সে আমার। তু পদ পঙ্কজ বলে করি অহঙ্কার।
কৃষ্ণগুণ কাহ কিছু আশা করি মনে। স্বহায় হইবে সভে হইঞা কৃপাবানে ॥
.........বন্দো সিবে দেব জগন্নাথ। ক্ষেতিতে বৈকুণ্ঠ পুরি বিকাইছে ভাত ॥ - খ
শ্রীবৃন্দাবন ভনে বলরামের চরণে। শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত সুন সর্ব্বজনে ॥ - ২ক

২ ....পুরুষোত্তম স্থিতি। বৃন্দাবন দাস ভনে শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতি ॥ যথা দিষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি শ্লোক। লিক্ষাতে শ্রীগুরু ঘোষ পূর্বনিবাস দোকাচাপরেয়া............ সন ১১৬৪ সাল। তাং ২২ শ্রাবণ ॥ - পৃ - ৫০খ

৩ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২৮০০।

৪ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ২৫২৬। পত্র সংখ্যা - ১-১৭ সম্পূর্ণ

ভণিতা,

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে জার আশ। বৈষ্ণব মাহাত্ম্য কহে শ্রীবৃন্দাবন দাস।

পুষ্পিকা,

সত্য সত্য কহিলেন শাস্ত্র প্রমাণে। শ্রীবৃন্দাবন দাস ইহা করে অবধানে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে জার আস। বৈষ্ণব মাহাত্ম্য কহে শ্রীবৃন্দাবন দাস ॥ ইতি
বৈষ্ণবমাহাত্ম্য গ্রন্থ সংপূর্ণ। সন ১১ ৮ সাল তাং ৭ আশাড় আমত্তি রোজ বুধবার। পৃ-১৭খ

'বৃন্দাবন দাস' ভণিতার অনঙ্গমঞ্জুরী[১] নামক সংক্ষিপ্ত রচনাটি কোন বৃন্দাবন দাসের নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা দুরূহ; তবে মনে হয়, কবি নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত এবং রচনাটিও নিত্যানন্দ সম্পর্কিত; ভণিতা চৈতন্যভাগবতের ভণিতার মতো। এটি চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের লেখনীজাত এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। 'বৃন্দাবন কোরক'[২] নামক রচনাটিও

১ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ৭২৩৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১-৩
আরম্ভ, ৺৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।। চৈতন্যচন্দ্রায় নম ।। নিত্যানন্দমহং বন্দে অদ্বৈত আদি
পুরাৎপুরং জস্য ভক্তগণং প্রিয় সর্ব্বভক্তগণাশ্রয়। সর্ব্ব পাদায় হৃদয়াং তস্য নমঃ নমঃ।।
প্রাণবল্লবিং নিত্যরূপং নিত্যানন্দং সচ্চিদানন্দং বিগ্রহং............ইত্যাদি।।
রত্ন চিন্তামণি দুই এক ঠাঞি কবিঞা। বলরাম আস্বাদিলা নিজ্যাস জাঁ এগা।।
চিন্তামণি সুখন্যাস বলরাম জানে। অনঙ্গমঞ্জরি হন প্রেম আস্বাদনে।।
অনঙ্গমঞ্জরি গুণ কহিতে না পারি। জার প্রেমে সদা ভোগ কিসোর কিসোরি।।
রমনি হইঞা সুখ করে আস্বাদন। কহিএ তাহার কিছু বিভিন্ন বর্ন্নন।। - পৃ - ১খ
রমনির মণি হন বলরাম চন্দ্র। রস আস্বাদিতে করেন প্রকার প্রবন্ধ।।
রসের সম্ভোগ করেন রসিকিনি হঞা। সভারে ভুলাল সেই গুণ প্রেম দিঞা।।
ভণিতা, নিত্যানন্দ চন্দ্রে জার একান্ত বিশ্বাস। তবে এ সকল কথা করিছ প্রকাশ।।
... ...
নিত্যানন্দ চান্দ প্রভু সভাকার প্রাণ। বৃন্দাবন দাস কিছু পদযুগে গান।।

২ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ৩৫৭০। পত্রসংখ্যা - ১ - ১২। সম্পূর্ণ।
পুষ্পিকা, শ্রীবৃন্দাবন দাসেন বিরচিতং। শ্রীবৃন্দাবনকোরক সম্পূর্ন।। ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস বৈরাগ্য সাক্ষর মিদং। সাং—ভাণ্ডিরবণ। সন—১২৪৭ সাল তাং ২৪ কার্ত্তিক ।।
-(পৃ - ১২খ)।

এই বৃন্দাবন দাসের। উভয় রচনার বন্দনাংশ একই প্রকার। উভয় রচনার বিষয়ের সাদৃশ্য-ও লক্ষণীয়।

'রসকল্পসার' নামে নিত্যানন্দ-বন্দনা বিষয়ক একটি রচনা পেয়েছি বিশ্বভারতী সংগ্রহে।[১] এই বৃন্দাবন দাস নিঃসন্দেহে নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত ছিলেন। রচনার নমুনা,

শ্রীহরি॥ ইমং বৃন্দাবনং রসং নিধুকুঞ্জে বন মধ্যেংক্কে। রসলিক্ষ কৃতা নিত্যং শৃঙ্গারাদি বিবর্দ্ধনং॥ বৃন্দাবন কুঞ্জ মধ্যে রসাবেস হৈঞা। পরম হৈতে নিজসক্তি প্রকাশিঞা॥

সেই শক্তি হৈতে হয় আনন্দের ধাম। সেই শক্তি পূর্ণ করে গোবিন্দের কাম॥
যেই প্রভু নিত্যানন্দ সেই বলরাম। অনঙ্গমঞ্জরি যেই জাহ্নবা তার নাম॥
অতি······তবে এই তার নাহি সিমা। জাহা হৈতে জানি সব সাধন···রিমা॥
জাহা হৈতে জানি আদ্য প্রকৃতির ভেদ। জাহা হৈতে জানি নিত্য লীলার বিভেদ॥

··· ··· ··· ···

নিত্যানন্দ দাস মুঞি নিত্যানন্দ পদে আস। জন্মে জন্মে পাঙ যেন সঙ্গ তার দাস॥
অতি দিন মতি হিন বিন্দাবন দাস। রসকল্পসার তবে করিল প্রকাশ॥ ইতি রসকল্পসার গ্রন্থ সংপুর্ন্নং॥ পৃ-২ক

বৃন্দাবন দাসের 'নিত্যানন্দষ্টক' সংস্কৃতে রচিত।[২] ন'টি সংস্কৃত শ্লোকে কবি গুরু নিত্যানন্দ-প্রভুর বন্দনা করেছেন। রচয়িতা চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস হওয়া সম্ভবপর। রচনার দৃষ্টান্ত,—

গৌর প্রেম বহু বহু সর্ব্বদাস কি ভনং পাষণ্ড খণ্ড দণ্ড বারি ভক্তি চক্রাত্বনং সুনিভা গিদ হাস্য ··············· নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিনী কুমারস্কং॥ ১॥
গোষ্ঠ গোপ বেকাধিত্ত ত্ব সৃঙ্গ বেনু গড় কংসুকে কি পুছা গুজা নিত্য চারু ছড় কংস গুরু গোপিনি সবার বাস রঙ্গ কায়কং॥ নমামি ইত্যাদি॥ ২॥
ভণিতা, ইতি বৃন্দাবন দাস বিরচিতং শ্রীনিত্যানন্দ য়ষ্টক সমাপ্ত॥

১ বিশ্বভারতী পুথি ২২৪৯। সম্পূর্ণ - পত্রসংখ্যা - ১-২
২ ,, ,, ২২৪৯। ,, ,, ১-২

বিশ্বভারতী সংগ্রহে রক্ষিত 'তত্ত্বমঞ্জরী'[১] রচয়িতা বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-দেবকে প্রত্যক্ষ করতে না পারার জন্য খেদ করেছেন। ইনি 'প্রভুর প্রিয়পাত্র পণ্ডিত-গদাধরের' নিকট নামমন্ত্র গ্রহণ করেন।[২] কবির বর্ণনা থেকে মনে হয়, ইনি বৃন্দাবনে বাস করতেন।[৩]

কবি চৈতন্যজীবনী রচনা করেছিলেন তত্ত্বমঞ্জরীতে তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে।[৪] নিম্নলিখিত অংশটিতে ভাবের আন্তরিকতা থেকে মনে হয়, কবি চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অথবা কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শ্রবণ করেছিলেন।[৫]

১ বিশ্বভারতী পুথি - ৪৬৯৫। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা - ১-১৫
৺ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ কৃপাময়ৌ সর্ব্বাবতার সারৌ।
কলি তিমির বিনাসী পূর্ণ প্রেম প্রকাসি নিজগুণ সুখদাই নিত্যবৃন্দাবন স্থাই বন্দে
শ্রীকৃষ্ণ নিত্যানন্দৌ ।।
বসন্ত রাগেন গীয়তে ।। চারিযুগ মধ্যে দেখ কলিযুগ সার। পূর্ণ কৃষ্ণ মহাপ্রভু গোরা অবতার ।।
সচির দুলাল গৌরাঙ্গ জগন্নাথ ঘরে। অবতীর্ন হইলা প্রভু নদিয়া নগরে ।।
অবনি ভাসাইলা গৌরাঙ্গ নিজ প্রেম গুণে। সঙ্গে ফিরি ভক্তগণ হরি সংকির্ত্তনে ।।
হেন প্রভু না জানিঞা মিছা প্রাণ ধরি। প্রভুতে বিমুখ হঞা সদা মোহে ফিরি ।।
... ...
দায মাত্র দিএ তার সেবা নাহি জানি। মিছাই ফিরির ধার আইলু অবনি ।। (পৃ - ১খ)

২ অজ্ঞান তিমির অন্ধে ধন্দে ফিরে মন। কর্ণে দিয়া হরিনাম করাইল চেতন ।।
প্রভুর প্রিযপাত্র বড পণ্ডিত গদাধর। তাঁর ঘরে বিক্রীত মোর হরিস অন্তর ।। (পৃ -২খ)

৩ বৃন্দাবনের গলি ফিরি মাগি খাই মাধুকরি রাধাকৃষ্ণ ডাকি নিধুবনে ।। - পৃ ৫খ

৪ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি মোর প্রভু। ইহ জন্মের সাধন নহে সাধ্য ছিল কভু।।
মোর কি সকতি গুণ কহিতে তাহার। বৈষ্ণব করুণা হেতু ভরসা আমার ।। (পৃ - ২ক)

৫ একদিন মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনে নাচে। গোলোকের প্রেমধন সবাকারে জাচে ।।
নাচিতে চৈতন্য প্রভু হইলা অচেতন। ধরনি লোটায় প্রভু সচির নন্দন ।।
কাঁচা সে সোনার অঙ্গ ধুলাএ ধুসর। বিকশিত পদ্ম মুখ মিনি শশধর ।।
নখচন্দ্র ঝলমল করে সনার অঙ্গে। চমকি উঠিলা প্রভু হইযা ত্রিভঙ্গ ।।
গোকুলের গোপীনাথ দেখিতেন রূপ। বৃন্দাবন দাস কহে রভসের কূপ ।। (পৃ - ৭খ)
... ...
এই সব ভক্তিকথা সুন সাবধানে। তত্যমঞ্জরী কহে দাস বৃন্দাবনে ।। ইতি শ্রী
তত্যমঞ্জরী গ্রন্থ সংপুর্ন্ন ।। সন ১১০৭ সাল তাং ২ আষাঢ় ।। - পৃ - ১৫খ

'বৃন্দাবন দাস' ভণিতায় 'ভজনকথা' নামে একটি নিবন্ধ পেয়েছি বিশ্ব-ভারতী সংগ্রহে।[১] বিষয়বস্তু শ্রীরূপগোস্বামীর ভজনপদ্ধতি।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'বৈষ্ণবলীলামৃত' বা বৈষ্ণবামৃত[২] গ্রন্থে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর দোহাই আছে। রচয়িতা কোন বৃন্দাবন দাস সঠিকভাবে নির্ণয় করা শক্ত, তবে ভাব এবং ভাষা দুই-ই অর্বাচীন কালের।

'ভক্তিতত্ত্বসার'[৩] রচয়িতা বৃন্দাবনদাস শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।[৪] কবি চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ দশার যে প্রাণস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন তাতে অনুমান হয়, কবি চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিংবা কোনো

১ বিশ্বভারতী পুথি ৩৬৫১। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা - ১
আরম্ভ,............দোহেত পণ্ডিত। শ্রীরূপ গোস্বামীর আরোপ এই সুনীশ্চীত॥ মুরলির প্রমাণ তিন পোয়া। বংশী চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী। পাদপদ্ম অষ্টাদশ অঙ্গুলী। তিন সপ্ত অবতিয়া কৃষ্ণের চব্বিশ চন্দ্রকর্ত্তাতে অষ্ট পথ নবঘন স্নিগ্ধ বর্ন শ্রীমতির নবিন গোরচনা বর্ন। মহাভাবে কম্পিত কলেবর। কর্ত্তাতে কোন রতি। আনন্দ রতি। নন্দনন্দনে সম্ভোগ রতি। —এই অনুকরণে শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজন হয়।
ভণিতা, বৃন্দাবন দাসের মনে এই অভিলাষ। এ সব ভজন কথা না কর প্রকাশ॥

২ বিশ্বভারতী পুথি - ৪ ৮৯। সম্পূর্ণ পত্রসংখ্যা - ১ ২
আরম্ভ, ৺৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
শ্রীগুরু চরণপদ্ম স্ম রণ করিয়া। বৈষ্ণবত্ত্বা ধর্ম কিছু কহি বিবরিয়া॥
বৈষ্ণবত্ত্বা ধর্ম কথা অমৃতের ধার। যে ধর্ম্ম ধরিয়া লোক সুখে হয় পার॥ ইত্যাদি
... ...
করুণ: কবহ মোরে শ্রীরূপ সনাতন। কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চরণ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করি আস। বৈষ্ণবামৃৎ কহে শ্রীবৃন্দাবন দাস॥

৩ বিশ্বভারতী পুথি - ৩৯৮৫। পত্রসংখ্যা - ২-৩৬। খণ্ডিত

৪ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ ঠাকুর মহাশয়। আপনার গুণে মোরে হইলা সদয়॥
মোর গুণ নাহি তিঁহো দয়ার সাগর। দয়ামাত্রে সার প্রভু মন যে পাসর॥
তবে জে লিখিয়ে ভক্তির তত্ত্ববিলাস। আপনার গুণে প্রভু করেন প্রকাশ॥ (পৃ ৩৫খ - ৩৬ক)

প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শ্রবণ করেছিলেন।[১] ভণিতায় কবি চৈতন্যের উল্লেখ করেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে।[২]

দ্বিজ বৃন্দাবনদাস ভণিতায় রাধিকামঙ্গল নামে একখানি রচনা পেয়েছি বিশ্বভারতী সংগ্রহে।[৩] কাব্যে সর্বত্র রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে। বন্দনাংশ,

জয় জয় রাধা প্রারি জয় কৃষ্ণচন্দ্র। জয় অষ্ট সখি জয় চরণারবিন্দ।
জয় জয় মঞ্জরাদি রাধিকার সখী। সভে মেলি কর দয়্যা মোরে দিন দেখি ॥
যয় যয় ব্রযবাসী যত গোপীগণ। যয় যয় তরুলতা জয় কুঞ্জবন ॥
জয় জয় পূর্ণমাসি জয় বৃন্দাদেবী। রাধা কৃষ্ণ লীলা যানি যার পদ সেবি ॥
জয় জয় সাধুগুরু বৈষ্ণব গোসাঞি। তোমা সভা বিনে মোর আর কেহ নাঞি ॥ পৃ—৩১ক

কবির পুরো নাম—বৃন্দাবন চক্রবর্তী।[৪] বৃন্দাবন চক্রবর্তী নামে হেমলতা দেবীর একজন শিষ্য ছিলেন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে কোথাও হেমলতা দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরমার্থ-সতীর্থরূপে ইনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর উল্লেখ করেছেন।[৫] শ্রীমতি তিলকমণি ঠাকুরাণী ছিলেন কবির গুরুস্থানীয়া।[৬]

কাব্যটি বৃন্দাবনে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।[৭] গ্রন্থখানি কবির শেষ বয়সের রচনা।[৮]

১ জে নাম লইয়া গোরা হুঙ্কার ছাড়ে। জে নাম স্মোরিয়া প্রভু সংকির্ত্তনে পড়ে ॥
জে নাম ধরিয়া রূপ হইলা গৌরাঙ্গ। জে নাম স্মোরিয়া প্রভু হইলা ত্রিভঙ্গ ॥
জে নাম স্মোরিয়া গোরা ছাড়েন নিস্রাস। জে নাম লাগিয়া গোরা ছাড়ে গৃহবাস ॥
অতএব এই কথা বুঝ ভক্ত লোকে। শোনার বরণ গোরা নাম ধরে বুকে ॥ (২৮ক)

২ কহে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য চরণে। গৌরাঙ্গ বিলাস কথায় পূর্ব্বকথনে ॥ -২২খ
কহে বৃন্দাবন দাস পাশানের হিয়া। লেখিতে গৌরাঙ্গ রস না জায় গলিয়া ॥ - পৃ - ৩০খ

৩ বিশ্বভারতী পুথি - ৫৮৩৩। সম্পূর্ণ

৪ রাধিকা মঙ্গল গান নামে রসবতি। জতনে রচিল্যা বৃন্দাবন চক্রবর্তী ॥ পৃ - ১২খ

৫ শ্রীরঘুনাথ দাস পদে আমার প্রণাম। দয়ার বিধান প্রভু সর্ব্বগুণধাম ॥
সতীর্থ পরমার্থ মোর বৈষ্ণব গোসাঞি। তোমা সভা বিনে আর অন্য গতি নাঞি ॥ পৃ - '৫.

৬ বৈষ্ণব ঠাকুর মোরে করিলেন দয়া। পদরেণু দিলা মোরে দুখিত দেখিয়া ॥
শ্রীশ্রীমতি তিলকমণি ঠাকুরাণীর গুণে। সবাই করিল দয়া আমা অজ্ঞানে ॥

৭ শ্রীবৃন্দাবন ভূমি মধ্যে যত লীলাগণ। শ্রীমদন গোপাল লেখান করিয়া জতন ॥
আমি মূর্খ শাস্ত্র মত কিছুই না জানি। জে লেখান গোপীনাথ তাহা সত্য মানি ॥

৮ ক্লেস ভারে কাঁপে অঙ্গ না চলে লিখন। সূত্র মাত্র কহিলু রসের বর্ণন ॥ —পুষ্পিকা পত্র

একজন বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ আছে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে। সম্পাদকের মতে, কবির নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডে। 'রসনির্যাস' নামে একখানি পদসংকলন গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থে বল্লভদাস, বড়ু-চণ্ডীদাস, বংশীবদন, মুরারি, রামানন্দ রায়, কবিরঞ্জন, মানসিংহ, কবিশেখর, নয়নানন্দ, চম্পতি, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রমুখ ষোড়শ শতকের পদকর্তাগণের পদ উদ্ধৃত হওয়ায় অনুমান হয়, গ্রন্থখানি সপ্তদশ শতকে সংকলিত হয়েছিল। রসনির্যাসের পুথি শ্রীখণ্ড থেকে সংগ্রহ করেন আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে এটি বিশ্বভারতীর পুথি।[১]

পরশুরাম রায়ের 'মাধব সঙ্গীতে' একজন বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ আছে।[২] ইনি পরশুরাম রায়ের শিষ্য কিংবা অনুজ কিশোরী দাসের সতীর্থ। কথিত আছে, পরশুরাম রায়ের গুরু মনোহর দাস 'পদসমুদ্র' নামে একখানি বৃহৎ পদসংকলন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গুরুর আদেশ অনুসরণ করে 'রসনির্যাস' সংকলন করা এই বৃন্দাবন দাসের পক্ষে অসম্ভব নয়। ইনি ষোড়শ শতকের শেষ অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথম—এই সন্ধিযুগের কবি হওয়া সম্ভবপর।

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে বৃন্দাবন দাস ভণিতায় 'বৈষ্ণবধর্মগ্রন্থ'[৩], তুলসীমাহাত্ম্য[৪], বৈষ্ণবমাহাত্ম্য[৫], নারদসংবাদ[৬] নামে কয়েকটি ভাগবত-অনুসারী রচনা পাওয়া যায়। রচনায় কবির ব্যক্তি-পরিচয় নেই, কাজেই এ গুলি কোন্ বৃন্দাবনদাসের রচনা বলা যায় না।

গোপরহস্যলীলা[৭] ও গোপীকামোহনলীলা[৮] নামে দু'টি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ জাতীয় রচনা বৃন্দাবন দাস ভণিতায় পাওয়া যায়। ভাব ও ভাষা নিতান্ত

১ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা ১৭৬১
২ মাধব সঙ্গীত - পৃ - ২৪১
৩ বিশ্বভারতী পুথি - ৬৩০২। খণ্ডিত
৪ ,, ,, ২৩৩০। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা - ১-৭
৫ ,, ,, ২৪২৮। ,, ,, ১-১৭
৬ ,, ,, ৪৩৭। ,, ,, ১৩
৭ বিশ্বভারতী পুথি - ২৯৯৬
৮ ,, ,, ৫৩৬১

আধুনিক। বৃন্দাবন দাস নামধেয় পরবর্তীকালের কোনো কবি এ গুলি রচনা করেন। ভণিতায় কবির নাম ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় নেই।

পরবর্তিকালে বৈষ্ণব পরম্পরায় বৃন্দাবন দাস নামে একাধিক কবি সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। বিশ্বভারতী সংগ্রহে প্রাপ্ত 'বৃন্দাবন দাস' ভণিতাযুক্ত এইরূপ আর একটি রচনা ভক্তিচিন্তামণির[১] রচনাকাল— মুনি অমর বান শশী শকে অর্থাৎ ১৫৭৭ শক বা ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে।

বৃন্দাবন দাস ভণিতাযুক্ত—'ভক্তিতত্ত্বচিন্তামণি'[২] গ্রন্থে রাগাত্মিক ভজনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ইনি পরবর্তিকালের কোনো সহজিয়া কবি।

পদকল্পতরু গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস ভণিতায় ৩৪টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। সম্পাদক মহাশয়ের মতে, চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ বৃন্দাবন দাস ই বৃন্দাবন দাস ভণিতার পদগুলির রচয়িতা।[৩]

'বৈষ্ণব পদবলী' গ্রন্থে ৬ জন বৃন্দাবন দাসের ৪১টি পদ স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থে কবিদের কোনো পরিচয় দেওয়া হয়নি।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে বৃন্দাবন দাস ভণিতায় ১৫টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি। পদগুলির প্রথম ছত্রের সূচী 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' দেওয়া হলো।

৫ নয়নানন্দ মিশ্র (পণ্ডিত-গোস্বামী) ॥

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে 'নয়নানন্দ' নামে একাধিক কবি বর্তমান ছিলেন। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর বৈষ্ণবপদাবলী গ্রন্থে তিন জন নয়নানন্দের নামোল্লেখ করেছেন।

(১) ভরতপুর নিবাসী নয়নানন্দ।

(২) মঙ্গলডিহি নিবাসী নয়নানন্দ।

(৩) শ্রীখণ্ড নিবাসী নয়নানন্দ।[৪]

আলোচ্য শতাব্দীতে ভরতপুর নিবাসী নয়নানন্দ পদ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইনি গদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর বাণীনাথ মিশ্রের

১ বিশ্বভারতী পুথি - ২৩১

২ বিশ্বভারতী পুথি - ৪৭৪৭

৩ পদকল্পতরু - ৫ম খণ্ড পৃ - ১৭৬

৪ বৈষ্ণব পদাবলী - ভূ - পৃ - ২০। এই গ্রন্থে ভরতপুর নিবাসী নয়নানন্দের ২৩টি মঙ্গলডিহি নিবাসী নয়নানন্দের ৭টি এবং শ্রীখণ্ডের নয়নানন্দের দু'টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে।

পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র। কবি শ্রীচৈতন্যের বাল্য অনুচর ও অন্যতম প্রধান ভক্ত 'পণ্ডিত গোস্বামী' নামে বিখ্যাত।[১] বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই ইনি পদ রচনা করেন।[২] পদকল্পতরু গ্রন্থে 'নয়নানন্দ' ভণিতায় পাঁচটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'নয়নানন্দ' ভণিতায় একটি পদ পাওয়া গেছে ; পদটির প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' দেওয়া হলো।

রচনানৈপুণ্যের নিদর্শনরূপে একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হলো : পদটি ভক্তিরত্নাকরে মুদ্রিত হয়েছে।

ভাটিয়ারী ॥ নাচেন গৌরাঙ্গ আমার গদাধরের পাশে।
গদাধর নাচেন পুন গৌরাঙ্গ বিলাসে ॥
দোঁহ দোঁহার পিরিতি আরতি নাহি তুটে।
পরস পরসে কিবা কত শুখ উঠে ॥ ২ ॥
পুরুষ প্রকৃতি কিবা জানকী শ্রীরাম।
রাধা কানু·········কিবা রতিদেব কাম ॥ ৩ ॥
ভাব বেভর রসে এ ভাব মুরতি।
কত পরকারে কিয়ে বাস বিভূতি ॥ ৪ ॥
মুখচান্দ কি বর্ণিব নিতি জিঅ মরে।
কর পদ পদ্ম কিবা হিম ভরে ঝরে ॥ ৫ ॥
অনেক অনঙ্গ জিনি দেহের বরনি।
উপমা মহিমা সিমা কিবা দিতে জানি। ৬ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত গোলক শ্রীবৃন্দাবন।
কোথা না আছিল এই প্রেমরতন ॥ ৭ ॥
প্রেম কীর্ত্তন সুখ নদীয়া নগরে।
প্রেমের গৃহীনি শ্রীপণ্ডিত গদাধরে ॥ ৮ ॥
প্রেমগুরু সত্য·············শ্রীশচীনন্দন।
উদ্ধারিলা জগজনে দিআ প্রেমধন ॥ ৯ ॥

১ বা. সা. ই - পৃ - ৩০৫
২ H. B L, P - 45-46

কহয়ে নয়নানন্দ বিচিত্র বিহার।
শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার ॥ ১০ ॥[1]

ভাবের আন্তরিকতা থেকে মনে হয়, কবি চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন; সুতরাং পদটি আলোচ্য নয়নানন্দের লেখনীজাত হওয়া সম্ভবপর।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের ৪০১৯ সংখ্যক পুথির 'জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন' পদটি বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে (পৃ-৪৮৬) মুদ্রিত হয়েছে। বিশ্বভারতী পুথির পাঠ—

জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন নটন মঙ্গল সুঠান।[১]
কির্ত্তন মগন[২] শ্রীবাস রামানন্দ মুকুন্দ বাসু গুণ গান ॥
দ্রাঙ্গ দৃমিকি দিমি মৃদঙ্গ[৩] বাজত মধুর মন্দের[৪] রসাল।
সঙ্খ করতাল ঘণ্টা রবাব[৫] ভাল মিলল[৬] পদতলে তাল ॥
কেহো দেই[৭] গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন কেহো দেই[৮] মালতীর মাল।
পিরিতি ফুলসরে মরমে ভেদল ভাবে সহচরি ভোর।
কেহো[৯] বোলে গোরা জানকিবল্লব রাধার প্রিয় পাঁচবান।
নয়নানন্দের মনে আন নাহিথ জানে আমার গদাধরের প্রাণ ॥

'বৈষ্ণব পদবলী' গ্রন্থের মুদ্রিত পাঠ—
১ রে; ২ আনন্দে; ৩ মাদল, ৪ মঞ্জীর; ৫ রব; ৬ মিলন; ৭ কো দেই; ৮ দেই; ৯ কোই।

তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বভারতী পুথির পাঠ উন্নততর এবং মূলানুগ।

পরবর্তিকালে বৈষ্ণবীয় পরম্পরায় 'নয়নানন্দ' নামে একাধিক কবি সাহিত্য সৃষ্টি করেন।[2]

১ বিশ্বভারতী পুথি - ৪৩০৪
২ বিশ্বভারতী সংগ্রহে শিবের বন্দনা (৪৫০১) ও শঙ্করীর বন্দনা (৪৫০২) নামে দু'টি রচনা আছে। ভণিতা, 'দ্বিজ নয়নানন্দ ভনে চুঞ্চামসিনায় ঘর।' শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গ (৩৭৮৯) নামক গ্রন্থখানিও মনে হয় এঁর রচনা। কারণ কবি বিক্রমপুরের বর্ণনা দিয়েছেন বিস্তৃতভাবে। চুঞ্চামসিনা বিক্রমপুরের অদূরবর্তী।

॥ উদ্ধব দাস ॥

রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য কৃষ্ণকান্ত মজুমদার 'উদ্ধব দাস' ভণিতায় পদ রচনা করেন। ইনি একটি পদে[১] পূর্বতন এক উদ্ধব দাসের উল্লেখ করেছেন। তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য।[২] এবং খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই উদ্ধব দাস 'রসকদম্ব' রচয়িতা কবিবল্লভের গুরু।[৩] 'উদ্ধব দাস' নামে আর একজন কবি কৃষ্ণমঙ্গল ধরণের কাব্য রচনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি কবিকর্ণপূরের শিষ্য।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে উদ্ধব দাস ভণিতার ৩টি অপ্রকাশিত পদ পাওয়া গেছে। একটি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো ; ২টি পদের প্রথমছত্র অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট হলো। পদগুলি কোন্ উদ্ধবদাসের লেখনীজাত নির্ণয় করা শক্ত।

* নহিলে শুনিলাম অপরূপ ধ্বনি কদম্বকানন হইতে।
তারপর দিন ভাটের.........চিতে ॥
আর এক দিন মোর প্রাণসখি কহিলে শ্রীহরিনাম।
গুণিজন.........শ্রবণে তাহার এ গুণ গ্রাম ॥
শহজে অবলা তাহে কুলবালা গুরুজন জ্বালা ঘরে।
সে হেন নাগরে আরতি বাঢ়য়ে কেমনে পরাণ ধরে ॥
পরাণ না ধরে ধক ধক করে রহে দরসন আসে।
জবহু দেখিবে তবহু পাইবে কহয়ে উদ্ধব দাসে ॥

॥ শ্রীজীব গোস্বামী ॥

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীবল্লভের (অনুপম) পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমস্ত দিক থেকেই ছিলেন রূপ গোস্বামীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। এঁর আবির্ভাবকাল আঃ ১৪৩৩—১৪৪০ শকাব্দ ধরা যেতে পারে।[৪] বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'হরিনাম কবজ'[৫] পুথিতে শ্রীজীব গোস্বামীর জীবৎকালের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এইরূপ—

শ্রীজীব গোস্বামীন ॥ জন্ম শকং ১৪৫৫ অপ্রকট ১৫৪০

১ পদকল্পতরু - ৩৩৯২

২ বা. সা. ই - পৃ - ৩৩৫ ; ৩ গৌ. প ত - পৃ - ৪৭১

৪ গৌ. বৈ. সা. ৩। ৪৬ ; ৫ বিশ্বভারতী পুথি - ২৭৩২

প্রকট ৭৫ বৎসর

গৃহে—২০

বৃন্দাবনে—৫৫

শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ-প্রভুর আকর্ষণে ইনি নবদ্বীপে গমন করেন। পরে কাশীধামে বাসুদেব সার্বভৌমের প্রিয় শিষ্য মধুসূদন বাচস্পতির নিকট ন্যায়, বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে পিতৃব্য-দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভায়, সূক্ষ্মবুদ্ধিবলে ও শাস্ত্রবিচারনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে শ্রীরূপ ও সনাতন নিজকৃত গ্রন্থ শ্রীজীবকে দিয়ে শোধন করাতেন।[১] শ্রীজীব নিজেও বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীজীবগোস্বামী রচিত গ্রন্থাবলী :—

দর্শন শাখায় (১) তত্ত্বসন্দর্ভ (২) ভাগবৎসন্দর্ভ (৩) পরমাত্মসন্দর্ভ (৪) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (৫) ভক্তিসন্দর্ভ ও (৬) প্রীতিসন্দর্ভ[২]

ব্যাকরণ শাখায় (৭) হরিনামামৃত (৮) সূত্রমালিকা (৯) ধাতু সংগ্রহ

অলঙ্কার শাখায় (১০) ভক্তিরসামৃত

কাব্য শাখায় (১১) শ্রীমাধবমহোৎসব (১২) গোপালচম্পূ (পূর্ব) (১৩) ঐ উত্তর (১৪) সংকল্প-কল্পবৃক্ষ (১৫) গোপালবিরুদাবলী

টীকা ও ব্যাখ্যা শাখায় (১৬) গোপালতাপনী (১৭) ব্রহ্মসংহিতা (১৮) রসামৃত (১৯) উজ্জ্বল (২০) যোগসারস্তব (২১) গায়ত্রীভাষ্য (২২) সর্বোপরি-ক্রমসন্দর্ভ (শ্রীমদ্ভাগবত টীকা);

প্রকরণ গ্রন্থ (২৩) রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা (২৪) শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নসমাহার (২৫) শ্রীরাধিকাকরপদচিহ্নসমাহৃতি ইত্যাদি।

ভক্তিরত্নাকর বর্ণিত এই গ্রন্থনামতালিকা সম্পূর্ণ নয়; এতে সর্বসম্বাদিনীর নাম নাই। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, এই গ্রন্থখানি প্রথম চার সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যান বা প্রপূর্তি বলে স্বতন্ত্র নামকরণ হয় নাই।

১ গৌ. বৈ. সা. ৩। ৪৬-৪৭

২ এগুলি একত্রে 'ষট্ সন্দর্ভ' নামে পরিচিত।

'সারসংগ্রহ' গ্রন্থখানি শ্রীজীবগোস্বামীর নামে আরোপিত হলেও তা শ্রীরূপ কবিরাজ কৃত।[১]

এছাড়া, চম্পককলিকা (উপাসনাবস্তু বা উপাসনারহস্য বা সরণী টীকা)[২] সাধ্যভাবামৃত[৩] ইত্যাদি রচনা শ্রীজীবগোস্বামীর নামে প্রচলিত আছে। চম্পক-কলিকায়' সনাতন গোস্বামীর সংসারত্যাগের বিবরণ আছে। মনে হয়, এই অংশ জীব গোস্বামীর কোনো সংস্কৃত রচনা অবলম্বনে পরবর্তিকালের লেখা।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'উপাসনা আদ্য'[৪] নামক রচনাটিও শ্রীজীব গোস্বামীর রচনা অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থারম্ভে স্পষ্টতই উল্লেখ আছে—অথ শ্রীজীব গোস্বামী·········অনুসারেন পদরহস্য স্বরনিয়ং লিখ্যয়তে। গ্রন্থশেষে লিপিকরের মন্তব্য—ইতি শ্রীরূপ সনাতনৌ সম্বাদে উপাসনা আদ্য সমাপ্ত॥ শ্রীজীব বিরচিতং॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং····· ······ ॥

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'জীব গোস্বামী' ভণিতায় 'তরজা' নামে একটি রচনা পেয়েছি।[৫] ইনি অবশ্যই পরবর্তিকালের কোনো স্বতন্ত্র জীবগোস্বামী।

'শ্রীজীব গোসাঞি' ভণিতায় চৈতন্যচরিতকাব্যের একটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গেছে। ভণিতা,

শচীর বচনে কেহো বুক নাঞি বান্ধে।
শ্রীজীব গোসাঞি ভনে ভক্তজনে কান্দে।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, রচয়িতা জীবগোস্বামী হতে পারেন না।[৬]

'পদ্যাবলী' গ্রন্থে শ্রীজীবগোস্বামীর যে দু'টি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে তার একটিতে তিনি 'শ্রীজীবদাস বাহিনীপতি' এবং অন্যটিতে 'বাহিনীপতি' বলে উল্লিখিত হয়েছেন।

১ গোড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য - ৩। ৪৭
২ বিশ্বভারতী পুঁথি-সংখ্যা - ২০২৭, ৩৫৫০, ৩১৫০ ইত্যাদি।
৩ বা. সা. ই - পৃ - ৪১১
৪ বিশ্বভারতী পুঁথি - ২৮৭৫। পত্রসংখ্যা ১-১৮। সম্পূর্ণ।
৫ বিশ্বভারতী পুঁথি - ২৪০০
৬ বা. সা. ই - পৃ - ৬৪৭, ১০০৯

ষোড়শ শতকের শেষভাগে শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখের প্রতি লিখিত জীবগোস্বামীর কয়েকটি পত্র ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হয়েছে। বৃন্দাবনে অবস্থান করলেও জীবগোস্বামী গৌড়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বীরহাম্বির রামচন্দ্র কবিরাজ প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পত্র-বিনিময় চলতো।[১] গৌড়দেশে ভক্তিধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন থেকে ইনি বহু গ্রন্থ প্রেরণ করেন।

॥ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ॥

হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী চন্দনপুর গ্রামের প্রখ্যাত জমিদার গোবর্ধন দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস প্রথম বয়সেই মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ করেন। রঘুনাথ দাসের জন্ম আঃ ১৪১৬ শক=১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে। বিশ্বভারতী সংগ্রহে প্রাপ্ত 'হরিনাম কবজ'[২] নামক পুথিতে এঁর জীবৎকালের বিবরণ দেওয়া হয়েছে নিম্নরূপ—

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীন ॥
জন্ম সকং ১৪২৮ অপ্রকট ১৫০৪
প্রকট ৭৬ বিতং
গৃহে ১৯ ক্ষেত্রে ৮ বৃন্দাবনে ৪৯

শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথকে স্বরূপ দামোদরের নিকট প্রেরণ করেন ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। যখন চৈতন্যদেবের বিরহোন্মাদ ভাব ক্রমাগত বেড়ে চলে তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী স্বরূপ ও রঘুনাথ সেই ভাববিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। 'স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।'[৩] পরবর্তিকালে ইনি বৃন্দাবন গমন করেন এবং ছয় গোস্বামীর অন্যতম রূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে খ্যাত হন।

রঘুনাথদাস মুক্তাচরিত (গদ্যকাব্য) দানকেলিচিন্তামণি (ভাণ) এবং স্তবাবলী রচনা করেছিলেন।[৪] এছাড়া, প্রেমকল্পতরু[৫], আত্মনির্ণয়, কড়চা, রাগমার্গলহরী[৬] ইত্যাদি অনেক রচনা রঘুনাথ দাসের নামে প্রচলিত।

১ পত্রগুলি অধিকাংশই প্রহেলিকা জাতীয়। দ্র. চিঠিপত্রে সমাজচিত্র - ২খণ্ড; পত্রসংখ্যা ১১৫, ৩৮০

২ বিশ্বভারতী পুথি - ২৭৩২ ;

৩ চৈতন্যচরিতামৃত - অন্ত্য ১৪ । ১০

৪ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য - ৪ । ১১৮

৫ বা. সা. ই - পৃ - ১০১৪

৬ ঐ - পৃ ৬৪২-৪৩

এছাড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহে রঘুনাথ দাস ভণিতায় আত্মবোধ[১] সিদ্ধটীকা[২], ব্রজপুরকারিকা[৩] নামক তিনটি বৈষ্ণবতত্ত্বনিবন্ধ জাতীয় রচনা আছে। এগুলি

১ বিশ্বভারতী পুথি - ২১১৫। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা - ৪
আরম্ভ,
রাধাকৃষ্ণ ॥ তুমি কে। আমি জিব। কোন জীব তটস্থ জিব। থাকো কোথা ভাণ্ডে। ....
বর্ত্তে কিসে ॥ দেহেতে ॥ তার লক্ষণ কি। কাইকি। বাচকি; মানসি ত্রিদশে ধরশে জেই চৈতন্য নিত্যানন্দ। এ সব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ অতএব বস্তু তাতে নিজক্রিঞা। সদানন্দ জে বাস করে ত্রিদে হৃদ্ধি হৈঞা ॥
ভণিতা, স্বরূপ রূপ রঘুনাথ করি এক সাথ।
আত্মবোধ গ্রন্থ করেন রঘুনাথ দাস ॥ ইতি আত্মবোধ গ্রন্থ সংপুর্ন্ন ॥ —পৃ ৪ক
২ বিশ্বভারতী পুথি - ২০৯৫। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা-২
আরম্ভ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ রসের বিষয় কি : রসের আশ্রয় কি। রসের বিসয় শ্রীকৃষ্ণ : রসের আশ্রয় শ্রীরাধিকা। রস বলি কারে। নাএক নাইকা একত্র হইলে রস বলি। ....কৃষ্ণের পতি রাধিকার রতি। রাধিকার প্রতি কৃষ্ণের কোন রতি। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার প্রেমরতি। রাধিকার প্রতি কৃষ্ণের কামরতি ॥
... ...
চৈতন্য কোন গুণে : লিলা গুণে : গৌরাঙ্গ কোন গুণে : রূপ করুন গুণে ॥
প্রিয় গদাধর কোন গুণে : অবতার গুণে : ভক্তি বাঞ্ছা গুণে ॥ ....
সাধন সোল আনা পুর্ন্ন ॥ ইতি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামির সিদ্ধটীকা সমাপ্তঃ ॥
৩ বিশ্বভারতী পুথি-৩৭৭৭। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা-৪
৺৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণ ভো নোম ॥ রথ ব্রজপুর কারিকা ॥ কৃষ্ণের পঞ্চগুণ ॥ ৫ ॥
শব্দগুণ ॥ ১ ॥ গন্ধ-গুণ ॥ ২ ॥ রূপগুণ ॥ ৩ ॥ রশগুণ ॥ ৪ ॥ স্পর্শগুণ ॥ ৫ ॥
এই পঞ্চগুণ শ্রীমত্তিতে বৈশে ॥ শব্দগুণ কর্ন্নে ॥ গন্ধগুণ নাশাতে ॥
রূপগুণ নেত্রে ॥ রসগুণ অধরে ॥ স্পর্শগুণ অঙ্গে ॥ বংশী স্তুতি শখি ॥ স্বপ্ন চিত্রপট শাক্ষাতে ॥ পূর্ব্বরাগ আগে রাগ পশ্চাৎ তার পশ্চাৎ অনুরাগ ॥
তার পশ্চাৎ উৎকণ্ঠা ॥ তার পশ্চাৎ স্পর্শন ॥
..............শ্রীপঞ্চমিকে তিনদিন থাকিতে বাপের ঘরকে জান ॥ মাঘ ফাল্গুন চৈত্রের ফুলদোল পর্যান্ত বাপের ঘরে থাকিঞা হুলি খেলা করেন। জতদিন হুলিখেলা ততদিন গোচারণ লিলা নাহি ॥ হুলি খেলা ছলে মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণমিলন ॥ ইত্যাদি
ভণিতা—শ্রীরঘুনাথ দাস বিরচিতং ব্রজপুরকারিকা শমাপ্ত ॥ ০ ॥ ইতি
সন ১১৮২ সাল ২৫শে শ্রাবন ॥ মোঃ কুকুটা ॥ —পৃ - ৪খ

সম্ভবতঃ পরবর্তিকালের কোনো কবির রচনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, রঘুনাথ দাস নামে একাধিক বৈষ্ণব কবি সেযুগে বর্তমান ছিলেন।

(১) নৃপ-রঘুনাথ নামে একজন কবি ছিলেন। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে এঁর একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে।

(২) রঘুনাথদাস নামে শ্রীনিবাস আচার্যের একজন শিষ্য ছিলেন। পদকল্পতরুর ২৩৮৭ সংখ্যক পদ ও বৃহৎভক্তিতত্ত্বসার (২য় খণ্ড পৃ-৮৭১) গ্রন্থে সংকলিত পদগুলি এঁর রচনা।

(৩) রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ কর নামে শ্রীনিবাস আচার্যের আরও দু'জন শিষ্য ছিলেন। এঁরা কবি ছিলেন কি না জানা যায় না।

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে[১] 'রঘুনাথ' ভণিতায় একটি শ্রীরূপ বন্দনার পদ পেয়েছি। অপ্রকাশিত হওয়ায় পদটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হলো :—

শ্রীরূপমঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ সেই মোর ভজন পূজন ॥
সেই মোর প্রাণধন সেই রত্ন আভরণ সেই মোর জীবনের জীবন ॥
... ...
অনুকূল হব বিধি সেই পদে হব সিদ্ধি নিরখি রও এ দুই নয়ানে।
সেরূপে মাধুরি বাসি প্রাণ করল অসসি প্রফুল্ল হইব সুভদিন ॥
তুয়া অদরশন এহি গরলে জীবন দেহি চিরদিন তাপিত জিবন।
হা হা রূপ কর দাআ দেহ প্রভু পদ ছাআ রঘুনাথ লইল সরণ ॥

॥ গোপাল ভট্ট ॥

ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী গোপাল ভট্ট ছিলেন দাক্ষিণাত্যের ভেঙ্কটভট্টের পুত্র এবং কাশীর প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভাগিনেয়। ইনি মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গোস্বামী ভাতৃদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃন্দাবনকে সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত করার সুমহান কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।[২]

শ্রীসনাতন গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে ইনি বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থ 'হরিভক্তি বিলাস' রচনা করেন।[৩] এই গ্রন্থ অবলম্বনে সনাতন গোস্বামী পরিবর্তন-

১ বিশ্বভারতী পুঁথি ৬২ ০ (৩২১০)
২ C C - P - 111-115
৩ গৌ. বৈ. সা-৭। ১

পরিবর্ধন সহকারে 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকাসহ হরিভক্তিবিলাস রচনা করেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের প্রত্যেক বিলাসে গোপাল ভট্টের নাম আছে।[১] লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের' টীকা খানিও গোপাল ভট্টের নামে প্রচলিত।[২] কিন্তু ডঃ সুশীলকুমার দে প্রমাণ করেছেন, উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা গোপাল ভট্ট দ্রবিড় দেশীয় শ্রীহরিবংশ ভট্টের পুত্র (মতান্তরে শিষ্য) ও নৃসিংহের পৌত্র।[৩] গোপাল ভট্ট গোস্বামী নামে প্রচলিত 'সংক্রিয়া সার-দীপিকা' নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।[৪] চৈতন্যচরিতামৃত রচনার সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনেক তথ্য গোপাল ভট্টের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।[৫] ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা অনুসারে, চৈতন্যচরিতামৃত রচনার আজ্ঞাদান কালে গোপালভট্ট উক্ত গ্রন্থে নিজনাম উল্লেখ করতে নিষেধ করেন।

পদকল্পতরুতে 'গোপালভট্ট' ভণিতাযুক্ত দু'টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে।[৬] পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত 'গোপাল দাস' ভণিতাযুক্ত ২৯৬৬ সংখ্যক পদটি গোপাল ভট্ট গোস্বামী রচিত বলে অনুমান করা হয়েছে।[৭] পদ্যাবলী গ্রন্থে এঁর একটি শ্লোক আছে।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'গোপালভট্ট দাস' ভণিতায় 'প্রেমরসকথা' (শ্রীরসমঙ্গল) নামক একখানি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি।[৮] ইনি সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষ বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকের কবি এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামী অপেক্ষা স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কারণ বন্দনাংশে চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীরূপ, শ্রীস্বরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীবগোস্বামী, শ্রীগোপাল, শ্রীরঘুনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম আছে।

১ "ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিতে শ্রীহরিভক্তি বিলাসে।" ইত্যাদি
২ অ. ব—১ম খণ্ড পৃ - ৫
৩ H. V. E M - 100-101
৪ গৌ. বৈ. সা - ৭।২
৫ চৈ. চ. উ
৬ পদকল্পতরু-পদসংখ্যা - ১০৮৮, ২৮৩৩
৭ পদকল্পতরু - ৫ম খণ্ড - পৃ ৪৬
৮ বিশ্বভারতী পুথি - ১২৭৩ (পুথি পরিচয় ৩য় খণ্ডে পৃ - ১১৩-৪৮ রচনাটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে)।

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'গোপালভট্ট' ভণিতাযুক্ত একটি পদ পেয়েছি।[১] পদটি শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। বিশ্বভারতী পুথির পাঠান্তর সহ পদটি উদ্ধৃত হলো—

মুদ্রিত পাঠ—

দেখ রি সখি কওল নয়ন কুঞ্জমে বিরাজ হেঁ[১]
বামেতে কিশোরি গোরি
অলস অঙ্গ অতি বিভোরি
হেরি শ্যাম বয়ন চন্দ[২]
মন্দ মন্দ হাস হেঁ।[৩]
অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়
পুছত বাত অতি নিবীড়
প্রেমতরঙ্গে চরকি পডত
কওল মধুপ সঙ্গ হেঁ।[৪]
শারি শুক পিকু[৫] করত গান
[৬]ভ্রমরা ভ্রমরি ধরত তান
ময়ুর ময়ুরী করত নাট
কেকোৎকণ্ঠা লাপ হেঁ।[৩]
শ্রীগোপাল ভট্ট আশ
বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস
শয়ন স্বপন হয় ন হেরি
ভুলল মন আশ হেঁ।

---

১ বিশ্বভারতী পুথি—২২৬২
বিশ্বভারতী পুথির পাঠ :—
১ হে ২ চন্দ্র
৪ হে ; ৫ পিক ;
৬ ভ্রমরা ভ্রমরি ধরত তান।
সুনি ধনি ধনি উঠে বৈঠত
চোর চল জাত হে।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'গোপালদাস' ভণিতার 'রসাম্নয়ভাষা' নামে আর একটি রচনা পেয়েছি।[১] রচনার বিষয় নায়িকার বিরহের প্রকার ভেদ। ভণিতা, '..................গোপাল দাস কহে রসের বিচার। ইতি রসাম্নয় ভাষা সমাপ্ত।' এটি রসকল্পবল্লী রচয়িতা রামগোপাল দাসের হওয়া সম্ভব। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থে এই অংশ মুদ্রিত হয় নি।

॥ চন্দ্রশেখর ॥

ষোড়শ শতকে 'চন্দ্রশেখর' নামে একাধিক খ্যাতিমান ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন।

(১) চন্দ্রশেখর আচার্য বা আচার্যরত্ন।[২] ইনি চৈতন্যদেবের মেসোমশায়। গৌরপদতরঙ্গিনী গ্রন্থে মুদ্রিত 'চন্দ্রশেখর'-ভণিতাযুক্ত গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ৩টি এঁর রচনা বলে মনে করা হয়।[৩]

(২) বৈদ্য-চন্দ্রশেখরের ছিল লেখন বৃত্তি। ইনি বাস করতেন বারাণসীতে।[৪]

(৩) 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে শ্রীখণ্ড-নিবাসী একজন চন্দ্রশেখর বৈদ্যের কাহিনী আছে।[৫] ইনি নরহরি সরকারের একজন ভক্ত-শিষ্য ছিলেন। এঁর কবিত্ব সম্পর্কে শাখানির্ণয়ে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(৪) চন্দ্রশেখর ও শশীশেখর নামে দুই ভ্রাতা পরবর্তিকালে পদ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই চন্দ্রশেখর-শশীশেখর বিখ্যাত পদকর্তা রায়-শেখরের সঙ্গে অভিন্ন কিনা সে সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে।[৬]

বিশ্বভারতী সংগ্রহের বিভিন্ন পুথিতে চন্দ্রশেখর, চন্দ্রসখি, চন্দ্র ভণিতায় মোট ৪৫টি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক অপ্রকাশিত ব্রজবুলি পদ পেয়েছি। সেগুলির রচয়িতা কোন্ চন্দ্রশেখর নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা দুষ্কর; তবে রচনা শৈলী ও ভাষার সাদৃশ্যে অনুমান হয়, এগুলি একজন কবির লেখনীজাত।

১ বিশ্বভারতী পুথি—৭০ •
২ আচার্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর। চৈ. চ - আদি - ১০
৩ গৌরপদতরঙ্গিণী - ভূ. পৃ ১৭২
৪ চৈতন্যচরিতামৃত - আদি - ১০
৫ শা. নি - পৃ - ২০৮
৬ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য - গৌ. প. ত. ভূ. পৃ ১৬৫-৬৮

'চন্দ্র' চন্দ্রশেখর নামের সংক্ষেপ এবং চন্দ্রসখি সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখরের অন্য ভণিতা।

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'চন্দ্রশেখর' ভণিতায় যে ৩টি পদ[১] উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি অনেকের মতে আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের রচনা।[২] বৈষ্ণবপদাবলী গ্রন্থে 'চন্দ্রশেখর' ভণিতায় ৪৫টি পদ মুদ্রিত হয়েছে। উক্ত পদগুলির সঙ্গে বিশ্বভারতী সংগ্রহে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত পদগুলির রচনাশৈলীগত সাদৃশ্য থেকে অনুমান হয় উভয় পদ একই কবির লেখনীজাত হওয়া সম্ভবপর।

রচনারীতির নিদর্শন রূপে একটি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো; অন্য ৪৪টি পদের সূচী 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' দেওয়া হ'লো।

চল চল মাধব মোহে সঙ্গ করি কুবুজা সুন্দরি পাশ।
তাহে মানাই তোহে নাহি জাওব অন্তরে না কর তরাস॥
ছি ছি মঝু মুখে লাগল আগি।
সিংহান হোই সিবাপদ সেবব ঐছন ভেল অভাগা॥
বিন্দা বিপিন মহেশ্বরি জো ধনি তাকর সখি সব হাম।
জগমাহা কুল বরাকিনি কুবজানি তাহে করব পরণাম॥
জো হোই সো হোই হাম ফিরি জাওব না করব ঐছন কাজ।
চন্দ্রশেখর কহে ঐছন করব দোস পাওব সখি মাঝ॥

॥ মাধবীদাস ॥

'মাধবীদাস' ভণিতায় কিছু বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ পাওয়া গেছে।[৩] এঁকে অনেকে চৈতন্যদেবের ওড়িয়াভক্ত শিখি মাহিতির ভগিনী মাধবী বলে মনে করেন। কিন্তু তিনি দাসী না হয়ে মাধবী দাস হন কি করে।[৪] পক্ষান্তরে, ভক্ত বৈষ্ণব কবিরা অনেকে মঞ্জরীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের

১ পদকল্পতরু পদসংখ্যা - ১৮৫৪, ২১৪৮, ৩০৩০
২ গৌ. প. ত - ভূ. পৃ -১৬৭
৩ পদকল্পতরু-পদসংখ্যা - ৭৭৫, ১৮৫৩, ২২৪০
৪ বা. সা. ই - পৃ - ৩০৪

নারীরূপে কল্পনা করে নাম পরিবর্তন করেছেন ; এমন দৃষ্টান্তও আছে।[১] অবশ্য সেযুগে পুরুষদেরও এই ধরণের নাম ছিল। বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'মাধুরীদাস'-ভণিতাযুক্ত 'প্রেমচন্দ্রিকা' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[২] বলা বাহুল্য এই এই মাধুরী দাস মহিলা কবি নন।

একটি পদের ভণিতা থেকে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান সঙ্গী জগদানন্দ (যিনি পণ্ডিত রায় বা পণ্ডিত ঠাকুর রূপে খ্যাত ছিলেন) মাধবী দাসের গুরু।[৩] ইনি চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরবর্তি বলে মনে হয়। কারণ চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ না পাওয়ায় কবি খেদ করেছেন।

যে দেখে গোরা মুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈলা নিজকর্ম্ম দোষে॥

(পদকল্পতরু-পদসংখ্যা-২২৪১)

এই পদাংশের অনুসরণে অনেকে ধারণা করেন, মাধবী অন্তঃপুর চারিনী স্ত্রীলোক ছিলেন ফলে চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে পারেন নি সেইজন্য এইরকম খেদোক্তি করেছেন। কিন্তু ষোড়শ শতকে হিন্দু মহিলারা পর্দানশীন ছিলেন বা পরপুরুষদর্শন নিষিদ্ধ ছিল এমন কোনো সাক্ষ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বরং চৈতন্যচরিত গ্রন্থের বহুস্থলে বর্ণিত হয়েছে যে, চৈতন্যের নগর ভ্রমণ বা নগরকীর্তনের সময় স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে সকলেই তাঁকে দর্শন করতো।[৪] কাজেই এ যুক্তি ভিত্তিহীন।

মাধবীদাস সম্ভবতঃ পুরীতে বাস করতেন। কারণ চৈতন্যজীবনের যে সব ঘটনা অবলম্বন করে তিনি পদ রচনা করেছেন সেগুলি প্রায় সবই নীলাচলের কাহিনী। ইনি ওড়িয়া কবি নন কারণ এঁর বাংলা ও ব্রজবুলি রচনায় ওড়িয়ার বিন্দুমাত্র প্রভাব কোথাও নেই।

১ চন্দ্রশেখর 'চন্দ্রসখি'-ভণিতা ব্যবহার করেছেন বিশ্বভারতী পুথিরা সংগ্রহের ৭৫০, ২৩০৭ ৫৪৫৪ সংখ্যক পুথির তিনটি পদে। নবদ্বীপে ললিতাসখির কুঞ্জ আছে। ললিতাসখি পুরুষের নামান্তর। মাধবী দাসও মনে হয় তদ্রূপ।

২ বিশ্বভারতী পুথি - ২২৪০ ; পদাবলী - ৫০৮৯

৩ পদকল্পতরু-পদসংখ্যা - ১৮৫৩

৪ পদকল্পতরু-পদসংখ্যা - ২২৯২ ; চৈতন্যভাগবত - ১ / ১০

বিশ্বভারতী সংগ্রহের একটি পুথিতে[১] একটি খণ্ডিত পদ আছে ; ভণিতা,—মাণ্ডবি দাস। 'মাণ্ডবি' শব্দটি নিঃসন্দেহে মাধবী নামের অপভ্রংশ। পদটি এইরূপ—

.........জলদ বরণ এক.........জুবতির জাতি কু[ল]
কী হেরিলাম জমুনার ঘাটে। রূপে......মদন......
হিয়া জর জর মনু......তা বিনে......সব লাগে......
যামী দিন......বিদায়।
মাণ্ডবি দাসের প্রীতি জাগে চল রূপ দেখিগা আগে ॥ ইতি ॥

॥ দুঃখী শ্যামদাস ॥

দুঃখী শ্যামদাসের কাব্য 'গোবিন্দমঙ্গল'[২] নামে সুপরিচিত। ভণিতায় কবির পিতামাতার নাম আছে "শ্রীমুখ জনমদাতা সুমতি ভবানী মাতা যার পুণ্যে নিরমিল তনু।" মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মেদিনীপুর শহর থেকে আট ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত 'কেদারকুণ্ড' পরগনার অন্তর্ভুক্ত হরিহরপুর গ্রামে ছিল কবির নিবাস। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ।

গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়ের মতে, শ্যামদাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন।[৩] "প্রায় ২৫০ বৎসরে পূর্বে এই কবি প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় কবিত্ব প্রভাবে বহু লোকের দীক্ষাগুরু হইয়া সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও গৌরব মণ্ডিত হইয়াছিলেন"—এইরূপ মত-ও প্রচলিত।[৪] পক্ষান্তরে, ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, দুঃখী শ্যামদাসের কাব্যের রচনাকাল ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি।[৫]

রচনায় প্রাচীনত্বের বহু নিদর্শন আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের মতো আলোচ্য কাব্যেও কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ গ্রাম্য নায়করূপে চিত্রিত হয়েছেন। রাধিকাকে

১ বিশ্বভারতী পুথি - ৪৬৬৪-৬৭

২ গ্রন্থখানি বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, মুদ্রিত গ্রন্থখানি প্রাচীন পুথি অনুসরণে সম্পাদিত হয় নাই। বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে দুঃখী শ্যামাদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যের পুথির ৪টি অনুলিপি আছে। যথা - ৫৮৭২, ৬৫৯১ (লিপিকাল সন ১১৭৮ সাল), ৬০৭২ (লিপিকাল সন ১২৬৩ সাল) ৬১৬২ (জগদীশপুর থেকে শ্রীঅক্ষয় কুমার কয়াল কর্তৃক সংগৃহীত।)

৩ বঙ্গবাসী (২য় সংস্করণ) ভূ. পৃ - ৪

৪ গো. বৈ. সা - ১১/১১২ ; ৫ বা. সা. ই - পৃ - ২২২

প্রথম দর্শন করে তার প্রবল কামলিপ্সা দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে। পরস্ত্রী এবং কুলবধূ রাধিকার সঙ্গে মিলনের অভিপ্রায় বড়াইকে অকপটে ব্যক্ত করেছে।[১]

রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটনে বড়াইকে প্রধানা দূতী রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বড়াই-এর রূপ বর্ণনাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুসারী।[২] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো এই কাব্যেও রাধা ও চন্দ্রবলী অভিন্না।[৩] উপমাদি প্রয়োগেও সুপ্রাচীন পরম্পরার অনুসরণ লক্ষণীয়।[৪]

সুতরাং দুঃখী শ্যামদাসের কাব্য ষোড়শ শতকে রচিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

॥ দ্বিজ রঘুনাথ ॥

দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ পাঁচালির ১৫৪৬ শকে অনুলিখিত একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গেছে। কবি তাঁর কাব্য রচনা করে উৎকলরাজ মুকুন্দদেবের সভায় পাঠ করেন—

১ কাহ গো তোমার চাঁদ কি খেনে দেখিলাম রাই আখিল ভুবন অনুপামা।
কুরঙ্গ নয়ানি ধনি ইঙ্গিতে পঞ্চম হানি মরমে মারিয়া গেল আমা॥
.. ..
রাধিকার অনুরাগে অন্তরে আনল জাগে দগধে দারুণ কামেশ্বরে।
তাহার বিরহে প্রাণ ধরিতে নারিবে কান বলহ বড়াই বুদ্ধি মোরে॥ পৃ - ৩ক, ৬১৬২

২ বড়াইর বেশ কত কি কহিতে পারি। পাকাচুলে রঙ্গফুলে বান্ধ্যাছে কবরী
সিঁথায়ে সিন্দুর ভালে চন্দনের ফোঁটা। শ্রবণে কুণ্ডল জেন দিন করে ছটা॥
বৃদ্ধ বয়সে বুড়ি না ছাড়ে কজ্জল। বসনা চালনে নড়ে দশন সকল॥
স্বর্ণসূত্রে নাস পুরে গজমতি দোলে। স্তন গোটা দুই তার দুলে নাভিমূলে॥ -খ, ৬১৬২

৩ সঙ্গে সদা রাখিব রাধিকা চন্দ্রাবলী।
এত শুনি বলেন নাগর বনমালী। নৌকায় আসিয়া উঠ রাধা চন্দ্রাবলী। - পৃ ২য়, ৬১৬২

৪ সাগ্নাড় দুর্জ্জন তার আয়ান খুরের ধার তিলেক না পাএ অপসর। - ৪ক ৬১৬২
বা সিংহের ঘরণী দেখ লোভিত শৃগালে। পতঙ্গ পড়িতে চাহে জ্বলন্ত আনলে॥
পৃ - ৫খ, ৬১৬২

বা সাগ্নাড় দুর্জ্জন মোর জিয়ন্তে যম।
পাপ ননদিনি ভয়ে না ছাড়ী নিঃশ্বাস।
সার্দ্দুল হইআ জেন কুরঙ্গিণী বাশ॥ - ৬খ, ৬১৬২

উৎকলের যত রাজা না কৈল যেই কর্ম্ম। শ্রীযুত মুকুন্দদেব সাধিল সেই কর্ম্ম॥
মুকুন্দ রাজার গুণ শুনিঞা শ্রবণে। বাঢ়িল বিনোদ বড় শ্রবণে নয়নে॥
রাজার কাছে কবি গিয়ে বললেন,

শ্রীরঘুনাথ বিপ্রকুলে উৎপত্তি। আইলুঁ তোমার দেশে গুণ শুনি অতি॥
চিরকাল রাজা কর উৎকলের মাঝে। পাঞ্চালী রচিয়া আইলুঁ তোমার সমাজে॥
অশ্বমেধ পাঞ্চালী সে করিঞা কৌতুকে। আজ্ঞা দেহ আহ্মি পঢ়ি তোমার সভাতে॥

রাজা সানন্দে 'আজ্ঞা দিল ব্রাহ্মণকে পাঞ্চালী পড়িতে।' ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান, এই কাব্যের রচনাকাল খৃ: ১৫৬৭।[১]

বিশ্বভারতী সংগ্রহে দ্বিজ রঘুনাথ ভণিতায় 'নামমালা' নামক একটি রচনার দু'টি সম্পূর্ণ পুথি আছে।[২] ভণিতা থেকে জানা যায়, কবির পূর্ব নিবাস নৈহাটী-উদ্ধারণপুর।[৩]

কবি চৈতন্যদেব ও তাঁর আদ্য অনুচরদের বন্দনা করেছেন,
মহাপ্রভু গোপীনাথ প্রভু নিত্যানন্দ। অদ্বৈত আচার্য আর জত ভক্তবিন্দ॥
বরাহ পুণ্ডরীকাক্ষ নৃসিংহ স্মোরণ। দামুদর পর্দানাভ কেসব……॥

ইনি অশ্বমেধ পাঞ্চালি রচয়িতা দ্বিজ রঘুনাথের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করি।

।। পীতাম্বর দাস ।।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কবি পীতাম্বর দাস মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। কবি পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় দিয়েছেন—

কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বর। প্রতাপে প্রচণ্ড রাজা ভোগে পুরন্দর॥
তাহার তনয় সে সমরসিংহ নাম। মহামায়া চরণে ভকতি অনুপাম॥
মহাপুণ্য কথা তার আজ্ঞা পরমানে। পয়ার প্রবন্ধে শিশু পীতাম্বর ভনে॥

'শিশু' শব্দটি এখানে বালক অর্থে প্রযুক্ত হয় নি: এ এক ধরণের বিনয় প্রকাশ। ধর্মমঙ্গলকার ধর্মদাস বণিক ভণিতায় বহুবার নিজেকে 'শিশু' রূপে

১ বা সা ই. পৃ-৩৩
২ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা - ৩৪৩১, ৪৪৫৮
৩ ভনে দ্বিজ রঘুনাথ শুন দেবগণ। অন্তক কালে দিহ সভে চরণে স্মরণ॥
রঘুনাথ নামমালা করিল প্রকাশ। নৈহাটি উদ্ধারণপুরে জাহার নিবাস॥ - ২খ, ৪৪৫৮

উল্লেখ করেছেন। ওড়িয়া কবি অনন্তদাসের 'শিশু অনন্ত' ভণিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[১]

গ্রন্থে রচনাকালজ্ঞাপক পয়ার আছে—

পঞ্চবান বেদ আর শশাঙ্ক শকত। আরম্ভ করিলোঁ মার্কণ্ডেয় কথা যত ॥

অর্থাৎ ১৪৫২ শক = ১৫৩০-৩১ খৃ কাব্যটি রচিত।

পীতাম্বর দাস ভণিতায় 'নলদময়ন্তী চরিত্র' নামে একখানি পাঁচালি কাব্য পাওয়া যায়। মহাভারতের 'নলদময়ন্তী' কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। রচনাকালের নির্দেশ এই রকম—রস ঋতু বেদ চন্দ্র শকের প্রমাণে। কহে পীতাম্বর নারায়ণ পরসনে ॥ অর্থাৎ ১৪৬৬ শক = ১৫৪৪-৪৫ খৃঃ। কাব্য রচনার কারণ নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে—

·········। ভারতের পুণ্য কথা রচিব সংক্ষেপে ॥

ব্রাহ্মণের মুখে শুনি কথা পুণ্যবতী। পয়ার প্রবন্ধে রচোঁ হেন কৈল মতি ॥

নহো আমি পণ্ডিত না করোঁ অহঙ্কার। বুদ্ধির স্বভাবে হের রচিলোঁ পয়ার ॥

ভণিতা এইরূপ—নলদময়ন্তীব চরিত্র পুণ্যময়। পয়ার প্রবন্ধে পীতাম্বরে বিরচয় ॥

পুথির প্রথম পত্র খণ্ডিত হওয়ায় কবির পৃষ্ঠপোষকের নাম জানা যায় না। ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান, ইনি এবং পূর্বোক্ত পীতাম্বর দাস অভিন্ন ব্যক্তি।[২]

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'দ্বিজ পিতাম্বর' ভণিতায় শ্রীগীতগোবিন্দের পদানুবাদের পুথি আছে।[৩] কবির ভণিতা এই রকম,—

চন্দদয় নাম টিকাকার [পয়ার] প্রবন্ধে।
দ্বিজ পিতাম্বর কহে শ্রীগীতগোবিন্দে ॥

গ্রন্থে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে সর্বত্র। পুঁথিতে কবির নাম ছাড়া অন্য কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নি; কাজেই ইনি আলোচ্য পীতাম্বর দাস কি না নিশ্চিত করে বলা যায় না; তবে ষোড়শ শতকে রচিত গীতগোবিন্দের টীকার ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

১ ওড়িয়া সাহিত্য - পৃ - ২৪

২ বা. সা ই - পৃ - ২৩২; কোচবিহার দরবার গ্রন্থাগারে পীতাম্বরের 'ভাগবত দশম স্কন্ধ' এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের পুথি আছে।

৩ বিশ্বভারতী পুথি - ৫৫৬৮। পত্র সংখ্যা ৪। খণ্ডিত।

।। দ্বিজ হরিদাস ।।

ষোড়শ শতকে 'হরিদাস' নামধেয় একাধিক ব্যক্তি সাহিত্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।[১] তারমধ্যে একজন হরিদাস গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলা কালেই কীর্তনীয়া রূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন।[২] ফুলিয়ার মুখটী নৃসিংহের সন্তান হরিদাসের নিবাস ছিল টেঞা-বৈদ্যপুরের সন্নিকট কাঞ্চন-গড়িয়া গ্রামে। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। এঁর দুই পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে শ্রীনিবাস আচার্য দীক্ষাদান করেন। শেষ জীবনে ইনি বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন।[৩] বৃন্দাবনে দ্বিজ-হরিদাসের সমাধি আছে।

ইনি কবি ও সুগায়ক ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম' এঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রচনা। এখনও বাংলা দেশের অনেক বাড়ীতে এই রচনা নিয়মিত গীত হয়। এছাড়া পদকল্পতরু গ্রন্থে 'দ্বিজ হরি দাস' ভণিতার ৪টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে এবং 'হরিদাস' ভণিতায় ২টি।[৪] পদ দুটি চৈতন্য-বিষয়ক।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'দ্বিজ হরিদাস' ভণিতায় 'নাম সংকীর্তন' নামে একটি পুথি পেয়েছি।[৫] রচনাটি অপ্রকাশিত। দ্বিজ হরিদাস ভণিতায় আর

১ পদকল্পতরু - ৫ম খণ্ড - পৃ - ২২৮-৩০

২ গৌ প. ত - পৃ - ২১৭, ৩২৬

৩ পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড - পৃ - ৫৭

৪ পদকল্পতরু - ৫ম খণ্ড - পৃ - ৫৭

৫ বিশ্বভারতী পুথি ৬৮১১। খণ্ডিত।

শুন শুন অরে ভাই নাম সংকির্ত্তন। জেই নাম স্মরণে হয় ব্রজের গমন॥
অন্তে তের শত নাম জে করে স্মরণ। অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
ভক্তি বাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন। এই হৈতে পূর্ণ হৈল নাম সংকির্ত্তন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদে মজাইয়া মন। দ্বিজ হরিদাস কহে নামসংকির্ত্তন।

একটি রচনার কেবলমাত্র পুষ্পিকাংশ পাওয়া গেছে।[১] রচনাটি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক। রচনায় রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে।

এছাড়া বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'হরিদাস' ভণিতায় 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের একটি পুথি পেয়েছি।[২] গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত। আরম্ভ এইরূপ,

জার কণ্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া। আচার্য বনমালী বন্দো দ্বিজ কাশীনাথ॥
মহাপ্রভুর বিভাহে ঘটনা জার সনে॥ সুই রাগ॥
ভাল অবতার গৌরাঙ্গ অবতার। এমন করুণা নিধি প্রভু নাহি দেখি আর॥
উস্যর পুরি গোসাঞী বন্দিব সাবধানে। ......সিক্ষা দিক্ষা প্রভু কৈল জার স্থানে॥
কেসব ভারথি বন্দো সান্তিপুনি বলি। প্রভু জারে নিজ গুরু করি নমস্করি॥

-পৃ-৩খ

ভণিতা, গোপীগণ দেখি কৃষ্ণ হাসি দুগ্ধ খায়।
রসের সাগরে ভাসে হরিদাসে গায়॥ -পৃ-৯খ

বন্দনাংশে কবি কেশবভারথি, রামচন্দ্র পুরি, পরমানন্দ পুরি, উদ্ধব, দামোদর পুরি, গোবিন্দ পুরি, নরসিংহানন্দ, সত্যানন্দ ভারথি, বিষ্ণুপুরী,, ব্রহ্মানন্দ পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, রূপ, সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, রাঘব গোসাঞি, গোপাল ভট্ট, কাসীশ্বর গোসাঞি, প্রবোধানন্দ গোসাঞি, রঘুনাথ ভট্ট, স্বরূপ গোসাঞি, লোকনাথ গোসাঞি, ভূগর্ভ ঠাকুর, জগদানন্দ পণ্ডিত, পুরন্দর পণ্ডিত, কাসীনাথ মিশ্র, কনীনাথ পট্টনাএক, রায় রামানন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, সুগ্রব পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ, শ্রীগদাধর দাস, প্রমুখের উল্লেখ করেছেন। এই নাম তালিকা থেকে অনুমান হয়, কবি চৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্তী।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'হাটক হাট পড়ল নদিয়াপুরে' পদটি 'হরিদাস' ভণিতায় পাওয়া যায়।[৩] এই পদটি বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে 'জ্ঞানদাস' ভণিতায়

১ বিশ্বভারতী পুথি - ১৪৮৩। পত্রসংখ্যা - ১
...............পিবিণ্ডি। ভোজন করিয়া সোয়ে কৃষ্ণের সংহতি॥
রজনি প্রভাত হৈল রবির প্রতাপ। ....কহে দ্বিজ হরিদাস॥
বারাড়ি রাগ॥ সোভন্তিসাং জয়শ্চেসাং কৃষ্ণতেসাং পরাভব......... জনার্দ্দন
শ্লোকং॥ রজনি প্রভাতে বাব্যাইল তিনজন॥
ভিমস্থাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক॥ পাটক শ্রীজলধর মাম্না॥
২ বিশ্বভারতী পুথি - ২১২৭। পত্রসংখ্যা - ৩-৯। খাণ্ডত।
৩ বিশ্বভারতী পুথি - ১৩৩

মুদ্রিত হয়েছে।[১] পদটিতে দীন অকিঞ্চনের উল্লেখ আছে। দীন অকিঞ্চন অষ্টাদশ শতকের কবি।[২] সুতরাং পদটি জ্ঞানদাসের রচিত হওয়া সম্ভব নয়।

॥ **শ্রীনিবাস আচার্য** ॥

ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে বাংলা দেশের বৈষ্ণব মহান্তগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। ইনি শ্রীচৈতন্যের 'দ্বিতীয় আবির্ভাব' রূপে গণ্য হয়েছিলেন। যদুনন্দনের সংগ্রহতোষণী গ্রন্থের (পুথি)[৩] বর্ণনা অনুসারে,

প্রভুর অপ্রকটে তুই প্রভুর প্রকাশ।
গড়ের হাটে নরোত্তম রাঢ়ে শ্রীনিবাস॥ -পৃ-১২৯খ

'চৈতন্যশক্তি শ্রীনিবাস নৃত্যানন্দ নরোত্তম' (পৃ—১৩০ক)—এই রকম বিশ্বাস ও ভক্তগণের মধ্যে দৃঢ়মূল ছিল।

শ্রীনিবাস আচার্য রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা বেশী নয়। তাঁর প্রতিভায় সৃজনীশক্তি অপেক্ষা বিশ্লেষণী শক্তিই ছিল বেশী। এই গুণেই তিনি তৎকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে গুরুরূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। বৈষ্ণব গীতিকবিতার উন্নতি সাধনে এঁর উদ্যম ছিল অসাধারণ।[৪]

শ্রীনিবাস আচার্য রচিত ৫টি পদ পাওয়া গেছে। পদকল্পতরুগ্রন্থে এঁর ৩টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে।[৫] এই ৩টি পদ ছাড়া শ্রীনিবাস আচার্যের আর একটি পদ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।[৬] বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে শ্রীনিবাস-রচিত একটি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি। পদটি উদ্ধৃত হলো—

ধনি রঙ্গিনী ভোর। ভুলল গরবে কানু করি কোর॥
মন মানস সুখে। চুম্ব দেই বদনে তাম্বুল দেই মুখে॥

১ বৈষ্ণব পদাবলী - পৃ - ৭৮৯

২ বা. সা. ই - পৃ - ৬৬৫

৩ বিশ্বভারতী পুথি - ৫৬৩৩

৪ H. B. L.-P-95

৫ পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড পৃ - ২৬

৬ পদটি প্রথম ছত্র 'অনুখন কোনে থাকি বসনে আপনা ঢাকি'। পদটি পদকল্পতরুতে মুদ্রিত হয়েছে (পদসংখ্যা—৮৫৯) 'অজ্ঞাত ভণিতায়।

মন মানস সাধা। কাণু পরাভব—জীবন জীয়ল রাধা ॥
ভণে শ্রীনিবাস দাসে। রাইকানু রঙ্গ দেখি সখিগণ হাসে ॥

'শ্রীনিবাস দাস' অর্থে শ্রীনিবাসের শিষ্য মনে করার কারণ নেই। এটি কবির বিশিষ্ট ভণিতা। যে সব পদ শ্রীনিবাস-রচিত বলে অবিসংবাদিত রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত সেই সব পদেও 'শ্রীনিবাস দাস' ভণিতা আছে।

এছাড়া বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'চিনিবাস' ভণিতায় আর একটি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি।[১] রচনাশৈলীর সাদৃশ্যে অনুমান হয়, এটি শ্রীনিবাস আচার্য রচিত। পদটির প্রথমছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' দেওয়া হলো।

'কায়িকাপটল' নামে শ্রীনিবাস ভণিতাযুক্ত একটি রচনা আছে।[২]

॥ নরোত্তম দাস ॥

"আকুমার ব্রতচারী সর্বতীর্থ দর্শী পরম ভাগবতোত্তমঃ শ্রীল নরোত্তম দাসঃ"[৩] চৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। 'সংগ্রহতোষণীর' বর্ণনা অনুসারে, প্রভুর অপ্রকটে দুই প্রভুর প্রকাশ। গড়েরহাটে নরোত্তম রাঢ়ে শ্রীনিবাস।' চৈতন্যশক্তি শ্রীনিবাস নিত্যানন্দ নরোত্তম'—এই রকম বিশ্বাস ভক্তগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

নরোত্তম দাসের সাহিত্যসৃষ্টির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়, বল্লভ দাস রচিত একটি পদে।[৪] উক্ত পদে বর্ণিত তালিকায় 'চন্দ্রিকাপঞ্চমসার (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা,[৫] সাধনভক্তিচন্দ্রিকা বা ভক্তিউদ্দীপন, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, রসভক্তিচন্দ্রিকা বা সিদ্ধভক্তিচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা), তিনমণি সারাৎসার (সূর্যমণি, চন্দ্রমণি ও প্রেমভক্তিচিন্তামণি), গুরুশিষ্য সংবাদ পটল বা উপাসনা পটল, হাটপত্তন ও অসংখ্য পদ রচনার উল্লেখ আছে।

১ বিশ্বভারতী পুঁথি- ৩৩৪৪ পৃ - ১৫১ ক খ
২ ক ২০০৮। পত্রসংখ্যা - ৩। লিপিকাল—১২১১
৩ ভক্তি রত্নাকর - ১ম তরঙ্গ
৪ গৌ. প. ত - পৃ - ৪৭৯
৫ নরোত্তমদাসের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থের ভোজপুরী, কয়থী ও ভগ্ন বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন ডঃ সনৎকুমার দে মহাশয়। পুঁথির শেষাংশ মুদ্রিত হয়েছে পুঁথি পরিচয় - ৩য় খণ্ডে (পৃ - ১৭৩)

এছাড়া স্বরূপকল্পতরু, স্মরণমঙ্গল, দেহকড়চা, চমৎকারমঞ্জরী, চমৎকার-বিলাস, বস্তুতত্ত্ব, বস্তুতত্ত্বসার, ভজননির্দেশ, নবরাধাতত্ত্ব, রাগমালা, ভক্তি-লতাবলী, প্রেমবিলাস, আশ্রয়নির্ণয়, ভক্তিসারাৎসার প্রভৃতি রচনা নরোত্তম দাসের নামে প্রচলিত।[১] প্রেমমদামৃত, অভিরামপটল[২], কাঁকড়া বিছা গ্রন্থ, বৈষ্ণবামৃত[৩] গ্রন্থ নরোত্তম দাসের রচনা বলে কথিত।

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'নরোত্তম' ভণিতায় মঙ্গলারতি[৪], শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকীর্ত্তন[৫], নামসংকীর্ত্তন[৬], আশ্রয়নির্ণয় বা আশ্রয়তত্ত্ব[৭], সিদ্ধিপটল[৮] বৈষ্ণবামৃত[৯], ভক্তিউদ্দীপন[১০], চতুর্দ্দশপটল[১১] নামক পুথি পাওয়া গেছে। এই সকল নিবন্ধাদির রচয়িতা ও নরোত্তম দাস অভিন্ন ব্যক্তি এই রূপ মনে করা কখনই সমীচীন নয়।

নরোত্তম দাস ছিলেন রাগমার্গের সাধক। তাঁর সাধন পদ্ধতিতে তান্ত্রিক আচার ছিল কিনা জানা যায় না তবে তিনি ছিলেন বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধক। যাঁদের এখন সহজিয়া বাউল নামে চিহ্নিত করা হয় নরোত্তম দাস তাঁদের গুরু বলে মান্য হয়েছিলেন। ফলে এই সম্প্রদায়ের অনেক রচনা স্বাভাবিকভাবে নরোত্তম দাসের নামে চলে গেছে। মতান্তরে, সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে 'নরোত্তমদাস' নামে এক বা একাধিক স্বতন্ত্র কবি ছিলেন এঁদের রচনা পরবর্তিকালে নামসাদৃশ্যে মিশে যাওয়া খুবই সম্ভব

১ বা. সা. ই - পৃ - ৩১৭ ; ২ বা. সা. ই - পৃ - ১০১০
৩ বা. সা. ই - পৃ - ৪১১
৪ বি. ভা. পু ১০৮ (পু. প. ১ম খণ্ড পৃ - ৬৪-৬৫)
৫ ,, ১২৯৩ (,, ,, ৫ম ,, পৃ - ২৮৭-৮৮)
৬ ,, ৫৪৭ (,, ,, ২য় ,, পৃ - ১৪১-৪২)
৭ ,, ৫৪৪ (,, ,, ,, ,, পৃ - ১৪-১৫)
৮ ,, ৯৭০ (,, ,, ,, ,, পৃ - ৩৮২-৮৩)
৯ ,, ১৭৮ (,, ,, ১ম ,, পৃ - ৩৮-৩৯)
১০ ,, ১৩৭, ১৭৯ (,, ,, ,, ,, পৃ - ৮৬-৮৭)
১১ ,, ৫১৮ (,, ,, ২য় ,, পৃ - ৯৯-১০)

বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'নির্হেতুপ্রেমতত্ত্ব'[১] নামক নিবন্ধটি সহজিয়া নরোত্তম দাসের রচনা। আরম্ভ এইরূপ—

স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর নপুংসক। এই তিন লিঙ্গ মধ্যে না হয় ভাবক ॥
এই তিনের পরে লিঙ্গ আছে আর। বিধাতার সৃষ্টি নহে বেদান্তের পার ॥
বেদ বেদান্তের পার তার পার যে। তার পারে যার বাস তার কর্ম্ম সে ॥
সপ্তম অক্ষর মধ্যে বান ঘুচাইয়া।[২] তাহার যতেক কর্ম্ম দেখহ ভাবিয়া ॥ পৃ-২৪

সহজ সাধনার মহিমা বর্ণিত হয়েছে নিম্নাংশে—

বেদবিধি অগোচর পরমাত্মা সাধনে। সহজ বস্তু বিনে রাগ হইবে কেমনে ॥
... .
গোচর নহিলে বস্তু প্রাপ্তি হবে কেনে। সহজ সাধন সার রসময় চৈতন্য ॥

রচনার মধ্যে ২টি গান আছে :

১। চৈতন্যের সঙ্গ পাইয়া কহে নিত্যানন্দ। মাকে ভজ বাপকে পাবে ঘুচে যাবে ধন্ধ ॥

২। যাইবার কালে পথে সম্বল নাহি সাথে সুধামৃত পড়ে গেল মনে ॥

ভণিতা এইরূপ—

নরোত্তম দাস তত্ত্ব বিচার করি কয়। নিরহেতু প্রেম বিনা ব্রজপ্রাপ্তি নয় ॥ পৃ-৪১

নরোত্তম ভণিতায় 'বস্তুতত্ত্ব'[৩] নামক রচনাটির প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, স্বরূপ, রূপ, রঘুনাথ, গোপালভট্ট এবং 'কবিরাজ গোসাই'র বন্দনা করা হয়েছে। রচনায় সহজিয়া সুলভ গুপ্তভজনের নির্দেশ আছে—

কৃষ্ণদাসে শিক্ষা দিয়া কহিল গোসাই। গোপত ভজন না করিবে কারু ঠাঁই ॥
নরোত্তম দাস বলে মনেতে ভাবিয়া। বিকাইলাম রাঙ্গা পায় লহত কিনিয়া

'সাধননির্ণয়'[৪] গ্রন্থে 'সাধ্য সিদ্ধ বিবরণ' সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে ; ভণিতায় সহজিয়াসুলভ গুপ্ত ভজনার নির্দেশ প্রমাণ করে ইনি সহজিয়া কবি।[৫]

১ বিশ্বভারতী পুথি—১৭০৬
২ ষড়রিপু
৩ বিশ্বভারতী পুথি—১৬২৬
৪ বিশ্বভারতী পুথি—৫০১৫। খণ্ডিত
৫ গুপতে সাধিত কাহা না কর প্রকাশ।
সাধন নির্ণয় কহেন নরোত্তম দাস ॥

'সহজপটল'[১] নামক নিবন্ধটির রচয়িতা নরোত্তমদাস বন্দনাংশে অদ্বৈত গোসাঞী, হরিদাস, স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথভট্ট, লোকনাথ, শ্রীজীব গোসাঞী—প্রমুখের সঙ্গে শ্রীনিবাস নরোত্তম ও রামচন্দ্রদাসের[২] নাম উল্লেখ করেছেন। ফলতঃ ইনি যে পরবর্তিকালের কবি তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

ভণিতায় কবি সর্বত্র নরোত্তম দাসের গুরু লোকনাথ দাসের উল্লেখ করতে ভোলেন নি—

লোকনাথ গোস্বামীর চরণ মহাবল। নরোত্তম দাস কহে সহজপটল॥ ইত্যাদি
পৃ-১ক, ১২খ।

অন্যত্র কবি পরমগুরুর উল্লেখ করেছেন,—

ঠাকুরের ঠাকুর মোর বৈষ্ণব গোসাঞি। কলি ভব তরাইতে আর কেহো নাই॥ —২খ

গ্রন্থে চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ রয়েছে—

চৈতন্যচরিতামৃতে গোস্বামী লিখিলা। তাহার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থ মাঝে দিলা। —৮ক

'প্রেমভক্তিরসালিকা'[৩] ও প্রেমতত্ত্বসার[৪] নামক বৃহৎ নিবন্ধ ২'টির রচয়িতা কোন্ নরোত্তমদাস সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না তবে ভাব ও ভাষায় আধুনিকতা থেকে অনুমান হয় ইনি অর্বাচীন কালের কবি।

১ বিশ্বভারতী পুথি—৫৬৪৬। সম্পূর্ণ।

২ জয় জয় প্রভু মোর জয় শ্রীনিবাস। জয় জয় নরোত্তম রামচন্দ্রদাস॥ -পৃ· ১৯

৩ বিশ্বভারতী পুথি—৫০৭৬। খণ্ডিত।

পুন নিত্যানন্দ কহে প্রভুর চরণে। অবিশ্বাসি লোকের তরে না হল তারণে।
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আর কিছু হএ। বৈষ্ণব বিশ্বাস হৈলে অবশ্য তরয়ে।
... ...
পুনর্ব্বার জন্ম যদি হএ যবনস্য কুলে। বৈষ্ণবের শেষ জল দৃঢ় মন হএ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তির উল্লাস। প্রেমভক্তিরসালিকা কহে নরোত্তম দাস॥ -৫খ

৪ বিশ্বভারতী পুথি— ২২৯, খণ্ডিত। জগদীশপুরের পুথি। করাল সংগ্রহ।

চৌষট্টি সখির নাম কহিলাম কারণ। প্রধান অষ্ট সখির নাম শুন দিয়া মোন॥
ললিতা বলিয়া নাম শ্রীরাধিকার সখি। শ্রীস্বরূপ দামোদর তান নাম লিখি॥
বিসাখা বলিয়া সখি কৃষ্ণলীলার সহায়। সেইরূপ অবতির্ন্ন শ্রীরামানন্দ রায়। -১০
ভণিতা, শ্রীগুরু সেবিলে জদি ফল ফুল ধরে। তথাপী পাইবে রূপ ব্রজের ভিতরে।
বহু গ্রন্থ দেখি গ্রন্থ করিলাম লিখন। প্রেমতত্ত্বসার কহে দাস নরত্তম। -৩৪খ

ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে 'রামচন্দ্র' ভণিতার 'পদ্মমালা' নামক একটি নিবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন।[১] বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'পদ্মমালা' গ্রন্থের একখানি পুথি আছে 'নরোত্তম' ভণিতায়।[২] কাব্যের মঙ্গলাচরণে "শ্রীরাধায়াং প্রণয়মহিমা কীদৃশবা নয়ৈবাস্বাদো………………" শ্লোকটি আছে।

ভণিতাংশ এইরূপ—

চরিত্ররূপা ভক্তের পাদপদ্ম করি আস। পদ্মমালা গ্রন্থ কহেন শ্রীনরোত্তম দাস॥
—পৃ-৬ক

শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আস। পদ্মমালা গ্রন্থ বর্ণিলা শ্রীনরোত্তম দাস॥
—পৃ-১০ক

বন্দনাংশে শ্রীরূপগোসাঞী, শ্রীসনাতনগোসাঞী, রঘুনাথভট্ট, গোপালভট্ট, লোকনাথ গোসাঞী, সরকার-ঠাকুর, শ্রীনিবাস-আচার্য, রামচন্দ্র [কবিরাজ] চৌষট্টি মহান্ত, দ্বাদশ গোপাল, অষ্ট কবিরাজ, ছয় চক্রবর্তীর উল্লেখ থেকে অনুমান করা হয় কবি পরবর্তিকালের।
পক্ষান্তরে, গোপালভট্ট গোসাঞীর শাখা শ্রীনিবাস ঠাকুর। এ সর্ব্বের পাদপদ্মে ভক্তি রহুক মোর॥, শ্রীনিবাস আচার্য মোর প্রেমের অঙ্কুর। (পৃ-৯খ) প্রভৃতি বর্ণনা থেকে অনুমান হয়, ইনি আমাদের আলোচ্য কবি হওয়া সম্ভবপর। তবে কি অষ্ট কবিরাজ, ছয় চক্রবর্তী, চৌষট্টি মহান্তের উল্লেখ পরবর্তিকালের সংযোজন ?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু তাঁর post chaitanya sahajiya cult গ্রন্থে নরোত্তমদাস রচিত ৭টি সহজিয়া গ্রন্থের নাম-তালিকা দিয়েছেন।[৩] তার মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রন্থই সহজিয়া সম্প্রদায়ের রচনা কি না এবং সহজিয়া প্রভাব থাকলেও তা কোন্ সূত্রে সংযোজিত তা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে দেখা দরকার।

১ বা. সা. ই - পৃ - ৩২০
২ বিশ্বভারতী পুথি—২৫২৮। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা-১-১০
৩ P. C. S. C—P - 296-98

বিশ্বভারতী সংগ্রহের নরোত্তম ভণিতাযুক্ত 'রাধারসকারিকা'[১] গ্রন্থখানি উক্ত গ্রন্থের নাম-তালিকায় ধৃত হলেও অভ্যন্তরীন বিচারে দেখা যায় রচনাটি সহজিয়া প্রভাবমুক্ত। রচনার বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ-নামমন্ত্রের মাহাত্ম্য কথন। আরম্ভ এইরূপ—

৺৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নমোঃ ॥

জাহা হৈতে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়। সেই বস্তু সাধি জানহ নিশ্চয়॥

রাধাকৃষ্ণ ভক্তে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র লঞা। জ্ঞান কাণ্ড জপ তপ দুয়েতে যাগিঞা॥

কায়মনোবাকে৷ নিষ্টা হয় কৃষ্ণ জ্ঞানে। তবে কেনে নাঞি পায় ব্রজে সির্দ্ধ জনে ॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি নাঞী অনুগত বিনে। মন্ত্রে অইসি প্রাপ্তি হয় সাস্ত্রের প্রমাণে ॥ —১খ

ভণিতাংশ,

শ্রীলোকনাথ প্রভুর পাদপদ্মে করি আশ। রাধারসকারিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি ॥ শ্রীরাধারসকারিকা সংপূর্ন্ন ॥ সকাব্দা ১৭১৮ সন ১২০৩ সাল। পৃ-৪খ

'গুরুতত্ত্বসার'[২] নামক রচনাটিতে কোথাও সহজিয়া প্রভাব অনুভূত হয় না এবং নরোত্তম দাসের স্বভাবসুলভ বৈষ্ণবদীনতা সুস্পষ্ট।[৩] সুতরাং গ্রন্থখানি সহজিয়া সাহিত্যের তালিকাভুক্ত করা অযৌক্তিক।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'নরোত্তম'-ভণিতার 'রাগমালা'[৪] গ্রন্থখানি পূর্বরাগ-অনুরাগ-আদি বিভিন্ন রাগের লক্ষণ এবং তার প্রকারভেদ বর্ণিত হয়েছে সবিস্তারে; রচনায় কোথাও সহজিয়া ভাবের ইঙ্গিতমাত্র নেই। এই বিষয়

১ বিশ্বভারতী পুথি - ২৭১২। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা - ১-৪

২ বিশ্বভারতী পুথি - ৫৭৬৬। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১-৯। কীটদষ্ট

আরম্ভ, ৺৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ:। শ্রীগুরুতত্ত্বসার গ্রন্থ লিক্ষতে ॥

সুন রে ভকতগণ পূর্ব্বকথা এই। এই কথা জে না মানে মূঢ়মতি সেই ॥

কৃষ্ণের ভকত হয়্যা জদি হেলা করে। সেই জোনে ইহকাল পরকাল নাহি তরে ॥ পৃ - ১খ

... ...

ভণিতা, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা দিষ্টা গুরু সেব হঞ নিষ্টা কহে নরোত্তম দাস ॥ শ্রীগুরুতত্ত্বসার গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ লিপিকাল - ১২৩৪ সাল ॥ -পৃ - ৯খ

৩ বৈষ্ণব ঠাকুর মোর বড় দয়া তার। কেমনে হইব তার নাছের নফর ॥ - পৃ -৮ক

৪ বিশ্বভারতী পুথি ৪২২। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা - ২-১২

অবলম্বনে রূপ গোস্বামী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সংস্কৃতে, আলোচ্য গ্রন্থখানি তদনুযায়ী রচিত। কবি পূর্বরাগের স্বরূপ বিচার ও শ্রেণী ভাগ করেছেন এইভাবে—

স্পর্শগুণ অঙ্গেতে লাগে অতি সুশীতল। সেই গুণ লাগি রাধা হইলা বিকল ॥
সেই গুণ হয়ে পূর্ব্বরাগের উদয়। পূর্ব্বরাগ ক্রম য়েবে করিএ নীর্ন্নয় ॥
আগে পূর্বরাগ হয় দুই ত প্রকার। পাছে ছয় মত হয় তাহার বিচার ॥
অকস্মাৎ শ্রবন আর হঠাৎ দর্শন। এই ত শ্রবন হয়······তিন দর্শন ।। পৃ-২খ ভণিতা,

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে কহিল কিছু এ সব আক্ষান ।।
প্রভুর সম্মতেতে কৈল রাগ মালার প্রকাশ। এ সব অ্যাক্ষাণ করে নরোত্তম দাস ॥
লিপিকাল সন ১১৫৭ সাল। —পৃ-১২খ

এইভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, Post Chaitanya Sahajia Cult গ্রন্থের তালিকাভুক্ত অনেক রচনাই সহজিয়া প্রভাবমুক্ত এবং আমাদের আলোচ্য ষোড়শ শতকের নরোত্তম দাসের লেখনীজাত হওয়া অসম্ভব নয়।

এছাড়া বিশ্বভারতী সংগ্রহের বিভিন্ন পুথি থেকে প্রাপ্ত 'নরোত্তম' ভণিতাযুক্ত ১৮টি অপ্রকাশিত পদের সূচী 'অপ্রকাশিত পদসংগ্রহে' দেওয়া হলো।

॥ **রামচন্দ্র-কবিরাজ** ॥

নরোত্তম দাসের সুহৃদ রামচন্দ্র-কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন।[১] এঁর পিতা চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা ও ভ্রাতা গোবিন্দদাস-কবিরাজ। সম্ভবত শ্রীখণ্ডেই চিরঞ্জীবের দুই পুত্রের জন্ম হয়; পরবর্তিকালে ইনি তেলিয়া-বুধরী গ্রামে বসবাস করতেন।[২]

রামচন্দ্র-কবিরাজ কয়েকটি নিবন্ধ রচনা করেন। 'স্মরণ দর্পণ' রামচন্দ্রের অন্যতম প্রখ্যাত গ্রন্থ। নরোত্তম দাস এই গ্রন্থের আদর্শে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' রচনা করেন। 'সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা' রামচন্দ্র-কবিরাজ রচিত নিবন্ধ গ্রন্থ। 'দুর্লভা-মৃত' নামে এঁর আর একটি নিবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩]

১ বা. সা. ই - পৃ - ৩১৯
২ রামচন্দ্র কবিরাজের জীবনী ভক্তমালা, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ইত্যাদি গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে।
৩ বা. সা. ই - পৃ - ৩১৯-২০

এছাড়া, বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'রামচন্দ্র' ভণিতায় রসচন্দ্রিকা, ভক্তি-প্রকাশ, স্মরণচমৎকার, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ও প্রার্থনাবিলাস—এই পাঁচটি রচনার সন্ধান পেয়েছি।

রসচন্দ্রিকা[১] গ্রন্থে মাধুর্যভজন, রাগাত্মিকা ভজন, পরোক্ষভজন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ভজন-আচরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

আরম্ভ, শ্রীরসচন্দ্রিকা গ্রন্থ ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণবে করিআ নমস্কার। সংক্ষেপে করিয়ে কিছু ভজন অঙ্গ সার ॥
ঐসর্জ্জা জতেক রস ইস্বরের খেলা। মাদুর্জ্জা ভজনের মূল হয় নব লিলা ॥
পূর্ব্বে ঐস্বর্জ্জা অপার আস্বাদিলা। ঐস্বর্জ্জা আস্বাদিতে মনে ভাবিতে লাগিলা ॥
এইরূপে না হইল বাঞ্ছিত পূরণ। এইরূপে না হৈল নিগুড় প্রেম আস্বাদন ॥

—পৃ-১খ

... ...

পরথ্য ভজন সব সাক্ষাতে করিব। রাগাত্মিকা দেখি তার আশ্রয় হইব ॥
লাবন্য...... মৃত জেইত নাইকা। বিদগধ স্থির রতি প্রেমেতে বিদিতা ॥

... ...

আপনি করিব তার দাসি অভিমান। গুরু বুধে৷ দাস তার করিব সেবন ॥

রচনায় নরোত্তম দাসের সঙ্গে কবির হৃদ্যতার কথা আন্তরিকতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত অংশে—

নরোত্তম কবিরাজ মনে কৃপা করি। জানাইলা প্রেমতত্ত্ব রসের মাধুরি ॥
তাহার প্রেমের সিমা কি কহিব আর। কহিতে না পারি তার স্যামক প্রকার ॥
অতএব তার তত্ত্ব তিঁহো জানে মাত্র। আমার জীবন প্রাণ তার কৃপা পাত্র ॥
দুহে রাত্রিদিন বসি প্রেমরস রঙ্গে। যদি জন্ম হয় পুন রহি তার সঙ্গে ॥
জুগল মধুর কথা রস আলাপনে। নিরন্তর রহে দুহে অন্য নাই জানে ॥ —৪খ

রচয়িতা যে রামচন্দ্র-কবিরাজ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

ভণিতাংশ এইরূপ,

সর্ব্ব জুতগুণ [মো] রে ক্ষেম অপরাধ। তোমা সভার পদরেণু করিহ প্রসাদ ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুর পদ হিদয় বিলাস। শ্রীরসচন্দ্রিকা কহেন রামচন্দ্রদাস ॥
ইতি শ্রীরসচন্দ্রিকা সংপূর্ন্ন ॥ —পৃ-৫খ

১ বিশ্বভারতী পুথি—৬১৮০। পত্রসংখ্যা - ১-৫। সম্পূর্ণ।

'ভক্তিপ্রকাশ'[১] গ্রন্থে ভক্তির মহিমা বর্ণনায় 'অজামিল-উপাখ্যান', 'গোহোক চণ্ডাল', রবিদাস মুচিরামের কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। কাব্যের আরম্ভ চৈতন্য ভাগবতের মতো।[২] বন্দনাংশে কবি 'শ্রীগুরুচরণ পদ্ম' বন্দনা করেছেন যথারীতি; তবে স্পষ্টভাবে গুরুর নামোল্লেখ নেই।[৩] অন্যত্র কবি শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও অন্যান্য গৌর-পারিষদগণের চরণ বন্দনা করেছেন[৪]। কবি আলোচ্য রামচন্দ্র-কবিরাজ কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না; তবে বন্দনাংশ থেকে অনুমান হয় কবি অর্বাচীন নন। পুথির লিপিকাল সন ১১৮৮ সাল।[৫]

'স্মরণচমৎকার'[৬]-রচয়িতা 'রামচন্দ্রদাস' শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুরূপে জনৈক 'কবিরাজ গোসাঞীর' নামোল্লেখ করেছেন।[৭] রচনায় চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ আছে।[৮] মনে হয় ইনি কৃষ্ণদাস-কবিরাজের শিষ্য।

১ বিশ্বভারতী পুথি - ৫৩৬। পত্রসংখ্যা - ১-৪। সম্পূর্ণ।

২ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

৩ শ্রীগুরু চরণপদ্ম করিয়া বাঁধন। জাহার কৃপাতে পাই প্রেমভক্তধন ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক দেহ। ইহাতে অন্যমত না করিহ কেহো ॥

৪ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ। জাহার সর্বস্ব তাবে মিলে এই ধন ॥
গৌর পরিষদগণ সভার চরণ। কায়মনোবাক্যে মোর এই নিবেদন ॥

৫ স্মরণ মঙ্গল কাব্য পরম প্রকাশ। এ সব সিদ্ধান্ত কহে রামচন্দ্র দাস ॥ ইতি
শ্রীভক্তিপ্রকাস গ্রন্থ সমাপ্ত। সন ১১৮৮ সাল তাং ১০ আশ্বিন রোজ শনিবার -পৃ - ৪খ

৬ বিশ্বভারতী পুথি - ৪২৬৯। পত্রসংখ্যা ৬-৮। খণ্ডিত।
আরম্ভ, স্থির আজ্ঞা কবি পুরুষ হৈল দেখি। গুরু গোসাঞের আজ্ঞা সকল উপেখি ॥
গুরুকে দেখিয়া জীব অষ্টাঙ্গনা করে। বৈষ্ণব দেখিঞা জিব কটাক্ষে না হেরে ॥
এই মত পাপ তাপে করিল প্রকাস। এই হেতু জীবের নরকেতে বাস ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ দুহু ভজিনু। মহামায়া জালে পড়ি নিশ্রঅ ডুবিনু।
পতিতপাবন প্রভু চৈতন্য নিত্যানন্দ। তাহাকে ভজিলে ভাই ছুটে ভববন্ধ ॥ পৃ - ৭ক

৭ সিক্ষা দিক্ষা গুরু লেখেন কাবরাজ গোসাঞী। নিষ্কাম্যি হইলে শিক্ষা করিবে তোথাই ॥

৮ প্রভু পুছেন রায় কহেন বিবরিয়া। হর্ষ হইলা মহাপ্রভু সে কথা সুনিঞা।
প্রভু কহেন বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা সার। রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনু বিদ্যা নাহি আর ॥
- পৃ - ৮খ

... ...

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মোর পরিহার। রামচন্দ্র দাস কহে স্মরণচমৎকার ॥ - পৃ - ৮খ

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'[১]-রচয়িতা রামচন্দ্রদাস গোবিন্দদাস-কবিরাজের সহোদর নন; ভিন্ন ব্যক্তি। কৃষ্ণদাস কবিরাজকে প্রভু এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কবি প্রভুর প্রভু বা পরম গুরুরূপে উল্লেখ করেছেন,

জয় জয় রঘুনাথ দাস মহাশয়। আমার প্রভুর প্রভুর জানিহ নিশ্চয় ॥
জয় জয় প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞী। তাহা বিনু সংসারে আর কেহ নাই ॥
—৩য় প্রকরণ

বা, জন্মে জন্মে প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞা। তাহার তুলনা দিতে ত্রিভুবনে নাঞি ॥

গ্রন্থখানি অষ্টাদশ প্রকরণে সম্পূর্ণ।

'প্রার্থনা বিলাস'[২] রচয়িতা রামচন্দ্র-দাস শ্রীনিবাস-আচার্যের পুত্র গতি-গোবিন্দের শিষ্য। 'স্মরণদর্পণ' গ্রন্থের পদগুলি রামচন্দ্র কবিরাজের রচনা।[৩] রামচন্দ্র মল্লিক নামে ষোড়শ শতকে একজন কবি ছিলেন। 'রামচন্দ্র' ভণিতার পদগুলি কিছু এঁর রচনা বলে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন।[৪]

'কাহারে কহিব মনের কথা কেবা যায় পরতীত' পদটি 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে রামচন্দ্র ভণিতায় উদ্ধৃত হয়েছে।[৫] পক্ষান্তরে, উক্ত পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে 'পূর্বরাগ ও অনুরাগ' শীর্ষক অংশে সামান্য পাঠ পরিবর্তন করে 'চণ্ডীদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।[৬] পদ দুটির মূল কাঠামো এক এবং শৈলী চণ্ডীদাসের অনুসারী।

বিশ্বভারতীর পুথি থেকে 'রামচন্দ্র' ভণিতায় ২টি নূতন পদ পেয়েছি। রচয়িতা কোন রামচন্দ্র নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। পদদ্বয়ের প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' সন্নিবিষ্ট হলো।

১ বিশ্বভারতী পুথি - ৩১২৮-৩১১৯। খণ্ডিত।
২ বিশ্বভারতী পুথি—৪৮৪০। পত্রসংখ্যা - ১-৪। সম্পূর্ণ।
পুষ্পিকাংশ, শ্রীগুরু গোবিন্দগতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গতি মন রহুক জনমে জনমে। কহে রামচন্দ্র দাস প্রার্থনাবিলাস অপরাধ ক্ষেম ভক্তগণে॥ ইতি প্রার্থনাবিলাসে আদ্যপদে সমাপ্তঃ॥
লিখিতং শ্রীগরিবরাম দাসবৈরাগ্য। সাকীন গুমাই। সন .২৪৭ সাল। - পৃ - ৪থ
৩ বা. সা. ই - পৃ - ৩১০।
৪ H B. L. P 202-5, 414
৫ অ. প্র. প. র - পদসংখ্যা—৪১০
৬ বৈষ্ণব পদাবলী (১৯৬১) - পদসংখ্যা—১০

॥ শ্যামানন্দ দাস ॥

শ্রীনিবাস-নরোত্তমের প্রধান সহযোগী শ্যামানন্দ দাস (আঃ ১৪৭৫ শকে =১৫৩৫-৩৬ খ্রীঃ) উৎকলের ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে জন্মগ্রহণ করেন।[১] কবির পিতার নাম কৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা দুরিকা দেবী, অনুজ বলরাম। অল্পবয়সেই ইনি অম্বিকা-কালনায় হৃদয়ানন্দ বা হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কবির পূর্বনাম 'দুখি কৃষ্ণদাস'। পরে হৃদয়ানন্দের পাদপদ্ম কৃপা হইতে। শ্রীশ্যামানন্দ নাম হৈল পাইল ব্রজেতে ॥[২] গুরুর আদেশে ইনি বৃন্দাবন গমন করেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে মিলিত হন।[৩] সেখানে কুঞ্জসেবা, নূপুরপ্রাপ্তি, তিলক ধারণ প্রভৃতি সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী পুথিতে বর্ণিত হয়েছে।

পরে শ্যামানন্দ গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মেদিনীপুর-ওড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার শ্যামানন্দের প্রধানতম কীর্তি।

শ্যামানন্দ কয়েকটি ছোট ছোট সাধন নিবন্ধ রচনা করেন। যথা—'উপাসনাসার' (বা উপাসনা সারসংগ্রহ), গোবর্ধনোপদেশ সংপ্রার্থনা, ভাবমালা ও অদ্বৈততত্ত্ব। 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' যদি শ্যামানন্দের ভণিতা হয় তবে 'বৃন্দাবন পরিক্রমা' এঁর রচনা হওয়া সম্ভব।[৪]

এছাড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'শ্যামানন্দ দাস' ভণিতা 'রসপুরকারিকা'[৫] নামে একখানি পুথি আছে। রচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হ'লো—

প্রেম গাইতি প্রেমবিজ্ঞ কহিয়ে তাহারে। অগোচর নাহি হয় রসিক মাঝারে ॥
হইবে জেই তাহা না জানে বর্ন্নন। সহজ রিত প্রিত তাহার কারণ ॥
মানুসের সেবা করে মানুস ভজন। মানুস বিগ্রহ বিনা না জানে অন্ন্যজন ॥

১ গৌ বৈ. সা - ৮/২৪
২ শ্যাম নন্দ প্রকাশ (বিশ্বভারতী পুথি - ৬১৬০) - পৃ - ৩৪
৩ শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞের কৃপা আজ্ঞা হৈলা।
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞি ব্রজে বাস কৈলা ॥
শ্রীজীব গোসাঞের সঙ্গেতে রহিলা।
শ্রীজীব বাৎসল্য স্নেহ বহুত করিলা ॥ -পৃ-ক, ৬১৬০
৪ বা সা. ই - পৃ - ৩২২
৫ বিশ্বভারতী পুথি - ১৬০৫

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে রচনাটি সহজিয়া সম্প্রদায়ের। পদকল্পতরুগ্রন্থে 'শ্যামানন্দ'-ভণিতায় ৩টি এবং 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' ভণিতায় ৩টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' ভণিতায় পদগুলি আলোচ্য শ্যামানন্দের রচনা।[১]

॥ দীন-কৃষ্ণদাস ॥

'দীন-কৃষ্ণদাস' ভণিতায় দু'একটি পদ শ্যামানন্দ বিরচিত।[২] বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'দীন-কৃষ্ণদাস' ভণিতায় 'সাধনামৃতচন্দ্রিকা'[৩], 'বৃন্দাবন বর্ণনা ও ধ্যান', 'ভক্তিরসাত্মিকা' নামে কয়েকটি অপ্রকাশিত বৈষ্ণবতত্ত্ব নিবন্ধ জাতীয় রচনা পেয়েছি।

'সাধনামৃতচন্দ্রিকায়' কবি গুরুবন্দনা করেছেন এইভাবে—

॥ গুরুবন্দনা ॥

কৃপা মকরাঙ্কান্বিত শ্রীপাদ কমল। শ্বেতাম্বর গৌররুচি সনাতনবর ॥
মঙ্গলদ সুমাল্যাভরণ গুণালয়। চিন্তিব শ্রীগুরু সুদ্ধ ভক্তিময় ॥ — পৃ ২খ

মনে হয়, ইনি সনাতন গোস্বামী। কারণ কবি গ্রন্থ রচনার কারণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে—

শ্রীগোস্বামী পদে গ্রন্থের শ্লোকার্থ নিগুঢ়। বুঝিতে না পারোঁ মুই অতিশয় মূঢ় ॥
সে সব গ্রন্থের শ্লোক একত্রে গাথিল। সাধনামৃতচন্দ্রিকা গ্রন্থনাম হৈল ॥ —পৃ-১ক

চৈতন্যবন্দনার রীতি[৪] থেকে অনুমান হয়, কবি চৈতন্যদেবের অব্যবহিত

১ বা. সা ই - পৃ - ৩১৩
২ বা সা. ই - পৃ - ৩২১
৩ বিশ্বভারতী পুথি—৪৪০৪, ৩৩৮৩। সম্পূর্ণ। প্রথম পত্র কীটদষ্ট।
আবস্তু, শ্রীগুরুর পদাম্বুজে কোটি নমস্কার। এমন করুণা সিন্ধু প্রভু নাহি আর ॥
অজ্ঞান তিমিরে মোর অন্ধদৃষ্টি ছিল। জ্ঞানাঞ্জন দিয়া মোর চক্ষু প্রকাশিল ॥

এমন গুরুদেব পতিত পাবন। হরিনামামৃত দিয়া তারিল ভুবন ॥
যাঁর কৃপা হৈতে রাধাকৃষ্ণ কৃপা হয়। যাঁর কৃপা বিনা কোন কালে গতি নয়।
৪ জয় জয় গৌরচন্দ্র শচির নন্দন। জয় নিত্যানন্দ তনু অদ্বৈত জীবন ॥
জয় গদাধর নাথ প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর। জয় জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণের ঈশ্বর ॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পাবন.................. ॥
ভক্তগণ সঙ্গে তোমার নদীয়া বিহার। নিরন্তর হৃদয়েতে স্ফুরুক আমার ॥

পরবর্তী। গুরুকে কবি 'বৈষ্ণব গোসাঞী' রূপে অভিহিত করেছেন[১]

'ভক্তিরসালিকা'[২] গ্রন্থের আরম্ভ চৈতন্যভাগবতের মতো—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ।।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুনার সাগর। কৃপা কর নিত্যানন্দ রসের সাগর ।।
কলিযুগে অবর্তির্ন হৈলা দুই ভাই। শ্রীচৈতন্য মোর দয়ার নিতাই ।। —পৃ-১খ

কবি একাধিক স্থানে গুরুরূপে বৈষ্ণব গোসাঞির সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন।[৩] এই বৈষ্ণব গোসাঞি যদি সনাতন গোস্বামী হন তাহলে 'ভক্তিরসালিকা' রচয়িতা দীন কৃষ্ণদাস এবং সাধনামৃতচন্দ্রিকা-কার দীন-কৃষ্ণদাস অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর।

'দীন-কৃষ্ণদাস' ভণিতায় বিশ্বভারতী সংগ্রহে 'বৃন্দাবন বন্দনা ও ধ্যান' নামক একটি পুথি পেয়েছি।[৪] বন্দনাংশে কবি শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর ও নরহরির বন্দনা করেছেন। মনীন্দ্র মোহন বসু তাঁর Post Chaitanya

১ পতিত পাবন জয় বৈষ্ণব গোসাঞী। ত্রিভুবনে তোমা বিনে মোর কেহ নাঞী ॥

২ বিশ্বভারতী পুথি—২৬২৮। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা - ১-৭

৩ মূর্খ হইএ আমি অত্যন্ত কাতর। বৈষ্ণব গোসাঞি হও দয়ার সাগর ॥ -৪খ
বা, বৈষ্ণব গোসাঞি স্থানে হয় অপরাধ। গুরুকৃষ্ণ নামে তার খণ্ডাইতে অপরাধ ॥ -৫খ
বা, বৈষ্ণবের পদে মোর প্রণাম প্রচুর। বৈষ্ণব গোসাঞি মোর বিঘ্ন কর দূর ॥ - ৫খ
ভণিতা, শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ ভক্তি প্রকাশ। ভক্তি রসালিকা কহে দিন কৃষ্ণদাস। লিপি-কাল সন - ১১৮১ সাল। - পৃ - ৫খ

৪ বিশ্বভারতী পুথি—১৬৮৪। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা - ১-৪
৺শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নম ।। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রায় নম ।।
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ধন্য ।।
জয় জয় নরহরি জয় গদাধর। এ সভার চরণে মোর প্রণতি বিস্তর ।।
ইহা সভার স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশ। অনায়াসে হয়ে নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ।।
বায়রু (?) হইতে জমুনা আইলা বৃন্দাবন। শ্রীবৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করি মথুরা দক্ষিণ ।।
গোকুল প্রদক্ষিণ করি গেলা পূর্ব্বমুখে। প্রয়াগ গঙ্গার সনে গেলা বহু সুখে ।। - পৃ - ১খ
... ...
চৌরাশী ক্রোশ বেষ্টিত হএ শ্রীব্রজমণ্ডল। তাহার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল এই স্থল ।।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আশ। বৃন্দাবন ধ্যান কহে দিন কৃষ্ণদাস ।। লিপিকাল - সন - ১২৩১ সাল

Sahajia Cult গ্রন্থে কৃষ্ণদাস রচিত 'বৃন্দাবন বর্ণনা ও ধ্যান' গ্রন্থটি সহজিয়া রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত রচনায় সহজিয়া প্রভাব নেই।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্তন' (পুথি সংখ্যা —১২৯৩) নামক একখানি প্রাচীন পদসংকলন গ্রন্থে 'দীন কৃষ্ণদাস' ভণিতায় ৮টি ও অন্যান্য পুথি[১] থেকে ৩টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি। পদগুলির প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' সন্নিবিষ্ট হ'লো।

।। জগন্নাথ দাস ।।

জগন্নাথ দাস ধারাবাহিকভাবে পদাবলীতে ব্রজলীলা বর্ণনা করে-ছিলেন।[২] পদকল্পতরুগ্রন্থে 'জগন্নাথ দাস' ভণিতায় ৪টি ব্রজবুলি[৩] এবং ৬টি বাঙ্গালা পদ মুদ্রিত হয়েছে।[৪] তার মধ্যে একটি পদ দানলীলা বিষয়ক ও একটি পদ নৌকাবিলাস সম্পর্কিত। এঁর চৈতন্যবিষয়ক পদগুলিতে ভাবের আন্তরিকতা থেকে অনেকে ধারণা করেন ইনি চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[৫]

শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের মধ্যে 'জগন্নাথ দাস' নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। একজন ওড়িষ্যাবাসী। দৈবকীনন্দন বৈষ্ণববন্দনায় সম্ভবতঃ এঁর সম্পর্কে বলেছেন—"জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীতের পণ্ডিত। যার গীত শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মোহিত ।।" এই জগন্নাথ রচিত ভাগবতের অনুবাদ ওড়িয়া সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ।[৬]

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ একজন জগন্নাথ দাসের নামোল্লেখ করেছেন। তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এবং সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ। এঁর নিবাস ছিল কান্তকলা গ্রামে।[৭]

১ বিশ্বভারতী পুথি—২৩০৭, ৬০০৩-২৮
২ বা. সা. ই - পৃ - ৩০৬
৩ পদকল্পতরু-পদসংখ্যা—৬৩০, ২১১৬, ১৩২৩, ১৫৪৪
৪ ঐ ঐ ,, ১০৮৩, ১১২০, ১৩৫৫, ১৪১৫, ২৩৩৬, ২৮০৫
৫ বা. সা. ই – পৃ - ৩০৩
৬ ওড়িয়া সাহিত্য - পৃ - ২১
৭ H. B L - P. - 810-14

'অভিনব সংকবি' পদবীযুক্ত জগন্নাথ দাস নামে আর একজন কবি ছিলেন।[১]

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'জগন্নাথ দাস' ভণিতায় 'শিবরহস্য আগম'[২] নামক একটি রচনার সন্ধান পেয়েছি। কবি রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন আগমের আধারে। কবির পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে।

১ বা. সা. ই · পৃ - ৩০৬

২ বিশ্বভারতী পুথি—২০৮৯। পত্রসংখ্যা - ১-১১। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

পার্ব্বতি বলেন এক কথা হইল স্মরণ। রাধাকৃষ্ণ তৎ কথা কহীবা কারণ॥

জদি দাসী বলে কৃপা থাকে মোর তরে। তবে কৃপা করি প্রভু কহাবে আমারে॥

এ বোল য়ুনিয়া তুষ্ট হইল পঞ্চানন। কহিব তোমারে প্রীয়া সব বিবরণ॥

গুর্য্যের অধিক গুর্য্য পরম রহস্য। তুমী সে আমার প্রীয়া কহিবা অবশ্য॥

॥ তথাহিঃ ॥ একং ব্রহ্ম দীধাভুতং যোবীমাং ধ্যানাহি তরে।

জদানন্দময়ই রাধা তদানন্দময় হরি॥

রাধাকৃষ্ণ এক দেহ জানীহ নিশ্চয়। দ্বিভার করিলে তার বড়ই সংশয়॥

এক দেহ ভজনে পাইল সর্ব্বজনে দুই দেহ হইল যোগী সিদ্ধার কারণে॥

... ...

কলিকাল ভুজঙ্গে সব জিব খাঞাছিল। হরি নাম মন্ত্র পেয়া তারা প্রাণ দান পাইল॥

ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ কহন না জায়। অনন্ত মহিমা বেদে পুরাণে না পায়॥

সংক্ষেপে কহিল কিছু আগমের ভাশা। ইহা শ্রবনে হয় বিপদ বিনাশ॥

জে হয় রশীক সে করএ শ্রবণ। হইতে জানিবে তত্ত্ব সকল কারণ॥

... ...

কৃষ্ণকথা রশে সদা বিপদ বিনাশ। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ হিদয়ে কর আস॥

সেই তত্ত্ব বিরচিল জগন্নাথ দাস। ইহা সুনিলে হয় বৃন্দাবনে বাস॥ ইতি সিব রহস্য আগমের হরগৌরী সংবাদে আগম উক্তি সমাপ্ত॥

বিশ্বভারতী সংগ্রহের জগন্নাথ দাস ভণিতায় প্রাপ্ত 'রাগাত্মিকা ভজন'[১] নামক রচনাটিও অপ্রকাশিত। রচনাটি সহজভাবে প্রভাবিত। Post Chaitanya Sahajia Cult গ্রন্থে উল্লিখিত 'তত্ত্বকথা' ও 'রসোজ্জ্বল'-রচয়িতা জগন্নাথদাস ও 'রাগাত্মিক ভজন' রচয়িতা অভিন্ন হওয়া সম্ভব।

পদকল্পতরুতে 'জগন্নাথ দাস' ভণিতায় ১০টি ও 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে ১৯টি পদ মুদ্রিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথি থেকে 'জগন্নাথ দাস' ভণিতায় ২০টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি। অধিকাংশ পদ গোষ্ঠলীলা, নৌকাখণ্ড ও দানলীলা বিষয়ক। রচনানৈপুণ্যের নিদর্শন রূপে একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হলো; অন্য পদগুলির প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' দেওয়া হ'লো।

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ মাধব ধিক রহু তোমার পিরিত।
তেজি জাতি কুলশীল জে তোমার স্মরণ নিল তারে ছাড় এ নহে উচিত ॥

১ বিশ্বভারতী পুথি - ৪৭:৪। পত্রসংখ্যা—৫। আদ্যন্ত খণ্ডিত।
..................। অতএব সেইরূপ রাগের আশ্রয় ।।
সেইরূপ প্রেমবতি নেত্র রাগরতি। অতএব রূপ নাম বিশুদ্ধ কর্ম্ম প্রতি ।।
বিশুদ্ধ বিরুদ্ধ ধর্ম অখণ্ড অকাম। অনিণ্ডি বিবজা.........ধাম ।।
বিবোজ নদির পার সেই দেশ খান। সহজপুর সদানন্দ নামে সেই গ্রাম ।।
তাহার পশ্চিম দিগে কলিঙ্গ কলিকা। চম্পককলিকা নামে তাহার নামিকা ।।
... ...
সদানন্দ সদা মগ্ন সদা অভিলাস। সহজ মানুষ তাথে সদা করে বাস ।।
তাহার দক্ষিণ দিগে চিদানন্দপুর। চন্দ্রকান্তি দেশ নাম কিঞ্চিত হয় দূর ।। - পৃ - ৩ক
... ...
জগত তাহাতে সুমেরু বেঢ়া। জগত তাহাতে তিঁহো ছাড়া।
শতদল সহস্র দল লক্ষ সহস্র দল। তার মধ্যে মূল শ্রেষ্ঠ উলটা কমল।
উলটীয়া থাকে পত্র ভুমে লোটাইঞা। তাহাতে জগৎ সৃষ্টি শক্তি সঞ্চারিয়া। - পৃ - ৪খ
।। তথাহি পদং ।।
চল গো সজনি পিরিতি নগরে বসতি করিব মোরা।
মরম না জানে ধরম বাখানে বাহিরে রহক তারা ।। —পদটি মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের 'সহজিয়া সাহিত্য' গ্রন্থে (পৃ - ৭৮-৭৯) চণ্ডীদাস ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

কি দোষে ছাড়িলে রাই সুধাইতে আইলাম তাই.........
জার ত্রিভুবনে দিতে নাহি তোলনা।
নাহি জানি তোমা হেন কি দিঞা বন্দেছ মন পরিহরি.........সোনা ॥
......দুখে কলানিধি রাই নিরবধি লোরে কমল জায় ভাসি।
খেনে খেনে তাপ ভরে এমনি নিষাস ছাড়ে নাসার বেসর পড়ে খসি ॥
রাই হেন মুরতি কি হবে তাহার গতি তুমি সে পিরিতে...... ।
জগন্নাথ দাস কহে ধিক রহু পিরিতি ছাড়িতে বৃকভানু...... ॥

—বিশ্বভারতী পুথি-২৮১৯

॥ গোবিন্দদাস-কবিরাজ ॥

কবিরাজ-গোবিন্দদাসের জীবন-কাহিনী সম্পর্কে সমকালীন সাহিত্য নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করে পদকল্পতরু গ্রন্থের সম্পাদক ৺সতীশচন্দ্র রায় এঁর জীবনকাহিনী সম্পর্কিত বাস্তবানুগ তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন।[১]

'রসনির্যাস' পুথিতে একটি পদের "গৌরী শঙ্কর চরণ কিঙ্কর কহই গোবিন্দদাস" ভণিতা থেকে অনেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন শাক্ত মতাবলম্বী।[২] এ সম্পর্কে ভিন্নমত-ও প্রচলিত আছে। সে যাই হোক, বৈষ্ণব গীতিকবিরূপেই এঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ষোড়শ শতকে 'গোবিন্দ' নামে একাধিক কবি বর্তমান ছিলেন।

(১) প্রখ্যাত বাসুঘোষের জ্যেষ্ঠ-সহোদর গোবিন্দ ঘোষ।
(২) গোবিন্দ আচার্য।
(৩) গোবিন্দ চক্রবর্তী।

গোবিন্দ ঘোষের পদে 'গোবিন্দ দাস' ভণিতা পাওয়া যায় না। গোবিন্দ-আচার্য দ্বিজ-গোবিন্দ ভণিতাও ব্যবহার করতেন। ষোড়শ শতকের শেষে গোবিন্দ চক্রবর্তী 'গোবিন্দদাস' গোবিন্দদাসিয়া, পামরী-গোবিন্দদাস ভণিতায় পদ রচনা করেছিলেন। পরবর্তিকালে এঁর পদ গোবিন্দদাস কবিরাজের পদের সঙ্গে মিশে গেছে নির্বিচারে। রসকল্পবল্লী-প্রণেতা রামগোপাল

১ পদকল্পতরু - ৫ম খণ্ড - পৃ - ৬২, বা. সা. ই - পৃ - ৩২৫
২ বা. সা ই - পৃ - ৩২৫ ২৬

দাস এই রকম একটি পদ (প. ক. ত—১৭০৪) গোবিন্দ চক্রবর্তী রচিত বলে নির্দেশ করেছেন। 'পদামৃতসমুদ্র' গ্রন্থের সংকলক রাধামোহন ঠাকুর 'গোবিন্দ দাস' ভণিতায় প্রচলিত আরও ৪টি পদ গোবিন্দ চক্রবর্তী রচিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।[১] পদকল্পতরু সংকলয়িতা বৈষ্ণবদাসের মতে, একটি বারোমাসিয়া পদের শেষ ছ'টি ছত্র গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা।[২] 'গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ-কবিরাজ ও গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয়েছে।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধে আর কোনো কবি গোবিন্দদাস-কবিরাজের মতো এতো অধিক সংখ্যায় পদ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় না। পদ-কল্পতরু গ্রন্থে গোবিন্দদাস ভণিতায় মোট ৪৬০টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। বিশ্বভারতী সংগ্রহের একটি পুঁথিতে[৩] 'গোবিন্দদাস' ভণিতার প্রায় ৩০০টি পদ রসপর্যায় বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ পদ-ই অপ্রকাশিত। উক্ত পুঁথির বর্ণনা অনুসারে, গোবিন্দদাস গৌরচন্দ্রিকা, অভিষেক, দক্ষিণ গোষ্ঠ, উত্তর গোষ্ঠ, 'কৃষ্ণস্য প্রিয়াণাং রূপম্, কৃষ্ণপ্রিয়াণাং পূর্ব্বরাগ, কৃষ্ণস্য পূর্বরাগ, কৃষ্ণস্য প্রিয়াণাং স্বয়ংদৌত্য, শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং দূতি, শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাং আপ্তদূতি, শ্রীকৃষ্ণস্য আপ্তদূতি, রূপোল্লাস, নবসম্ভোগ, সম্ভোগ, রাস, রসালস, রসোদ্গার, অনুরাগ, দান, নৌকাখণ্ড, ফাগুয়া, অভিসারোৎকণ্ঠা, অভিসার, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, মানশিক্ষা, মানভঞ্জন, মান, শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহ, নির্হেতুমান, কলহান্তরিতা, দূত্যুক্তি, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, ভবন বিরহ, মাথুর, বার মাসিয়া, চিত্রগীত ও বিরহ বিষয়ক পদ রচনা করেন।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'পদমেরু' নামক সংকলন গ্রন্থে গোবিন্দদাস ভণিতায় শতাধিক পদ আছে।[৪] এ ছাড়া বিশ্বভারতী সংগ্রহের বিভিন্ন পুঁথিতে 'গোবিন্দদাস' ভণিতায় শতাধিক অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি; পদগুলির প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' দেওয়া হলো।

১ প ক. ত - ১৩৩, ২৬৭, ২৭৭, ১২৫৬

২ প. ক. ত - ১৮০২-১৩

৩ বি. ভা. পু - ১৪৫৮ (পুঁথি পরিচয় ৩য় খণ্ডে পদগুলির প্রথম ছত্রের সূচী মুদ্রিত হয়েছে। -পৃ - ১৩০-২৫)

৪ বা. সা. ই - পৃ - ৪৪২

বিদ্যাপতি, রায় বসন্ত, নৃসিংহ রূপনারায়ণ, ভূপতি রূপনারায়ণ, রায় চম্পতি, শ্রীবল্লভ, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ কবির সঙ্গে গোবিন্দদাসের যৌথ ভণিতায় অনেক পদ পাওয়া যায়। পদগুলিতে গোবিন্দদাসের কালজ্ঞাপক ঐতিহাসিক ইঙ্গিত মেলে। বারভূঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ কবির কালনিরূপণের মূল্যবান তথ্য। প্রতাপাদিত্যের জীবৎকাল গণনা করলে গোবিন্দদাস-কবিরাজ ষোড়শ-শতকের শেষার্ধ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত হবে না।

।। বল্লভদাস ।।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বল্লভদাস নামে একাধিক ব্যক্তি পদ রচনা করেন। তন্মধ্যে একজন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং অনুচর। একটি পদে (প. ক. ত—২৯৮১) ইনি শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র, গোবিন্দদাস-কবিরাজের তিরোধানের পরও জীবিত আছেন বলে খেদ করেছেন।

নরোত্তম দাসের শিষ্য 'বল্লভদাস'-ও পদকর্তা ছিলেন। সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, ইনি 'শ্রীবল্লভ' ভণিতা ব্যবহার করতেন।[১] শ্রীবল্লভ ও গোবিন্দদাস—এই যুগ্ম ভণিতায় অন্ততঃ ২টি পদ পেয়েছি। মনে হয়, ইনি কবিরাজ গোবিন্দদাসের সুহৃদ ছিলেন। 'কবিবল্লভ' ভণিতাযুক্ত 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' পদটি এঁর রচনা হওয়া সম্ভব। প্রেমবিলাসের মতে পদটি মাধব আচার্য বিরচিত। কিন্তু মাধব আচার্য পদে কোথাও 'বল্লভ' বা কবিবল্লভ ভণিতা ব্যবহার করেছেন এমন দৃষ্টান্ত নেই। পদটির রচনাশৈলী ও মাধব আচার্যের শৈলীর অনুসারী নয়।

বল্লভ দাসের পদে ভণিতা-বিভ্রাটের দৃষ্টান্ত-ও রয়েছে। রসকল্পবল্লী গ্রন্থে উদ্ধৃত বল্লভদাস রচিত (আর কিয়ে কনক)[২] পদটি পদকল্পতরুতে (পদ-সংখ্যা—৭৭৩) গোবিন্দদাস ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকে ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী স্বগ্রন্থে হরিবল্লভ বা বল্লভ ভণিতায় স্বরচিত অনেক পদ উদ্ধৃত করেছেন।

১ প. ক. ত - ২২৫, ২৩৫

২ রসকল্পবল্লী—১০৭ ; পদকর্তা বল্লভ চতুর্ধরীণ। -ভূ. পৃ -২৪

পদকল্পতরুগ্রন্থে 'বল্লভদাস' ও বল্লভ ভণিতায় মোট ২৫টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। পদমেরুগ্রন্থে বল্লভদাসের অনেক পদ আছে। এ ছাড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহের অন্যান্য পুথি থেকে বল্লভদাস ভণিতায় ২টি অপ্রকাশিত পদের সন্ধান পেয়েছি। পদগুলির প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত পদসংগ্রহে দেওয়া হলো।

॥ চম্পতি (-নাথ) রায় ॥

বিদ্যাপতি-চম্পতি ভণিতায় প্রচলিত পদগুলি থেকে অনেকে অনুমান করেন 'চম্পতি' বিদ্যাপতির অন্যতম উপাধি। কিন্তু চম্পতি, রায়-চম্পতি, কবি-চম্পতি চম্পতি-নাথ ভণিতাযুক্ত পদগুলি 'চম্পতি' নামক স্বতন্ত্র কবির রচনা হওয়া সম্ভব। গোবিন্দদাস তাঁর অনেক পদে রায়-চম্পতির উল্লেখ করেছেন।[১] মনে হয় ইনি, গোবিন্দদাসের পূর্ববর্তী ছিলেন।

'চম্পতি' শব্দটি নিয়ে গোলমাল আছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সেনাপতি, সংস্কৃত 'চমূপতি' শব্দের অপভ্রংশ। পদামৃতসমুদ্রকার রাধামোহন ঠাকুরের মতে, চম্পতি-রায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র। —শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজস্য মহাপাত্র চম্পতি রায় নামা মহাভাগবত আসীৎ স এব গীতকর্তা। —পদামৃতসমুদ্র-পৃ-১৯৪। চম্পতির পদে ওড়িয়া শব্দ 'পৈড' এর ব্যবহার আছে—'চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব তব মিলব হরি সঙ্গ।' (প ক ত—৪৮১)

কিন্তু কবি রচনার মধ্যে কোথাও প্রতাপরুদ্রের নামোল্লেখ করেন নি। তাছাড়া, চম্পটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি; গাঞি নাম। হিন্দু আমলের তাম্রশাসনে চম্পাহিট্টী (> চাঁপাহাটি) গ্রাম-নামের উল্লেখ আছে।[২] বাঙ্গালা দেশে 'চম্পতি' উপাধি অপ্রচলিত নয়। সেযুগে মেদিনীপুর-উড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওড়িয়া শব্দের বহুল প্রচলন ছিল; কাজেই কেবলমাত্র 'পৈড়' শব্দের উল্লেখ থেকে কবিকে ওড়িষ্যা অঞ্চলে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

১ রায় চম্পতি বচন মানহ দাস গোবিন্দ ভান ॥ -প. ক. ত - ৫৩১

২ মদন পালের মনহলি লিপির দান গ্রহিতা চম্পাহট্টির।
বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট চম্পাহিট্টি মহামহোপাধ্যায়। কুলজী গ্রন্থের মতে, চম্পটি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বারেন্দ্র গাঞীদের অন্যতম গাঞী। - বা. ই. - পৃ - ২৯৯

পদকল্পতরুতে 'চম্পতি' ভণিতায় ৯টি ও রায় চম্পতি ভণিতায় ১টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এছাড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহের বিভিন্ন পুঁথি থেকে 'চম্পতি' ভণিতায় অন্তত ৪টি পদ পেয়েছি ; একটি পদ উদ্ধৃত হলো ; অন্য পদ গুলির প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত পদসংগ্রহে প্রদত্ত হলো।

রাধে কেমন কঠিন মন তোর।
আপন তনু মন মুগুক দামিনী জীবন দগধলি মোর ॥
নিশি পরভাত নিকট জব আওল গলহি পীতাম্বর ধরি।
পদ ধরি ধরণীতে ধনি লোটায়ল তাহে নাহি পালট নেহারি ॥
কোপিনী গরবিনি গরবে গোঙাঅসি অছু কিএ পীরিতিক রীত।
বিনি অফরাদে রোখসি দোখসি মান কর আন চিত ॥
তু পেখলি জানি চলল হাম তৈখনে ফিরি ফিরি কত বেরি চাই।
নয়নক নীরে পথ লখই না পারই পথে মিলল সুবল বলাই ॥
সখীগণ মেলি করল কত কৌতুক জননী নিয়ড়ে লই গেল।
বেশ বনাই মাই পুন সোপল বামক করে ধরি দেল ॥
জমুনাক তীর ধীর সমীরণ নিপ তলে বৈঠল হাম।
পুরবক প্রেম সোঙরি মন মাতল ভূতলে করল পয়াণ।
তুয়া সহচরি কত সুবচনে সাধল অতএ আঅল সাথে।
হামত পেখি তোহ কৈছে গোঙায়লি কহতহি চম্পতি নাথে ॥

—বি ভা পু—১৭৩১

পদমেরুগ্রন্থে 'চম্পতিপতি' ভণিতায় একটি অপ্রকাশিত পদ আছে। পদটির প্রথম ছত্র—তখন ধায়ল বিরহিনি কালিন্দি রোধ।

॥ ভূপতি-নাথ ॥

রচনারীতির সাদৃশ্য, লিপিকরপ্রমাদ অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক চম্পতির অনেক পদ 'ভূপতি'-ভণিতায় এবং ভূপতির পদ চম্পতি-ভণিতায় পাওয়া যায় কিন্তু সেজন্য দু'জন কবিকে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়।

অনেক সমালোচকের মতে চম্পতি ছিলেন ওড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের সেনাপতি। প্রভুর মনোতুষ্টির জন্য কবি 'ভূপতি' বা 'ভূপতিনাথ'-ভণিতা ব্যবহার করেছেন।[১] কিন্তু পৃষ্ঠপোষক বা প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতাহেতু পদকর্তা

১ পদকল্পতরু - ৫ - পৃ - ১৮৩

স্বনাম সম্পূর্ণ বর্জন করে কেবলমাত্র ভূপতি, ভূপতিনাথ ভণিতা ব্যবহার করেছেন এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না। কাজেই এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। আর প্রতাপরুদ্রের নামের পরিবর্তে কেবলমাত্র ভূপতি বা ভূপতিনাথ শব্দ ব্যবহারেই-বা যৌক্তিকতা কি ?[১]

পদকল্পতরু গ্রন্থে ভূপতি ভনিতায় ৪টি এবং ভূপতিনাথ ভণিতায় ২টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। উক্ত নামে একজন কবির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'ভূপতি', ভূপতিনাথ, সিংহভূপতি ভণিতায় মোট ৬টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি ; পদগুলির প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদসংগ্রহে' উদ্ধৃত হলো। বিশ্বভারতীর ৪৭৫৬ সংখ্যক পুথিতে প্রাপ্ত বাঙ্গালায় রচিত পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হ'লো—

গোঁসানি বেসে জাব সেই দেশে খুজিব জোগিনী হয়া।
কারু ঘরে জদি পাব গোননিধি বাধিব বসন দিয়া ॥ ধ্রু ॥
য়ামার কুলে কালি দিলেক জে।
তারে বেধ্যা আনিলে য়াখিবে কে ॥
লয়া পরিহরি চলে সহচরি মাথাতে মৌথন হারি।
দহি নে দহি নে বলে সহচরি ॥
চমকিত মধুপুরি যুনি দ্বারিগণ ধাইয়া য়াইল।
দহি নে দহি নে বলে ॥
দ্বারি ছুতি সনে বচনে মাধুরী ভূপতিনাথেতে ভনে ॥

এই পদের রচয়িতা ,ভূপতিনাথ' যদি আমাদের আলোচ্য কবি হন তাহলে অন্ততঃ ভাষার সাক্ষ্য অনুসারে সিদ্ধান্ত চলে 'ভূপতিনাথ'-নাম মিথিলা বা রোসাঙ্গের কোনো রাজার নামের ইঙ্গিত[২] নয় ; ইনি বাঙ্গালী কবি।

১ রামানন্দ-রায় জগন্নাথ বল্লভ নাটকে পৃষ্ঠ-পোষক নৃপতির নামের সঙ্গে স্বনাম যুক্ত করেছেন সর্বত্র—

গজপতি রুদ্র নরাধিপ হৃদয়ে রসতু চিরং রসসারে।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং পরিচিতি কেলিবিসারে ॥ ১৫ ॥

বা, গজপতি রুদ্র নৃপতি কবি গীতম। সুখয়তু রামানন্দ সুগীতম ॥ ২৫ ॥

২ বা. সা. ই - পৃ - ৩৩৪

বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে সিংহভূপতি ও ভূপতিনাথ ভণিতার পদ স্বতন্ত্র-ভাবে সংকলিত হয়েছে। সম্ভবতঃ সম্পাদক মহাশয় উক্ত নামে স্বতন্ত্র দুই কবিব্যক্তিতে বিশ্বাসী।

'নরনারায়ণ ভূপতি বিজয়নারায়ণ' ভণিতায় একটি পদ আছে।[১] এক্ষেত্রে 'ভূপতি শব্দ অবশ্যই নৃপতি বা রাজা অর্থে ব্যবহৃত। পদমেরুগ্রন্থে ভূপতি ভণিতায় ১টি অ-পরিজ্ঞাত পদ আছে।[২]

॥ রায়-বসন্ত ॥

রায়-বসন্ত ও গোবিন্দদাস—এই যুগ্ম ভণিতায় প্রাপ্ত পদগুলি থেকে অনুমান হয় ইনি গোবিন্দদাস-কবিরাজের অন্যতম সুহৃদ।[৩] ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে 'দাস বসন্ত'-ভণিতায় একটি নরোত্তম বন্দনা বিষয়ক পদ আছে। উক্ত পদ আলোচ্য বসন্ত রায়ের রচনা হলে কবি নরোত্তম-শিষ্য ছিলেন। পদকল্পতরুর ২৪৩৪ সংখ্যক পদের কবিরাজ-গোবিন্দদাসের 'দ্বিজ রায় বসন্ত' উল্লেখ থেকে ধারণা হয় কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কর্ণানন্দের মতে, রায়-বসন্ত ব্রাহ্মণ।

অনেক সমালোচকের মতে, এই বসন্ত-রায় যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। কিন্তু তিনি জাতিতে ছিলেন কায়স্থ; সুতরাং স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

রায় বসন্ত'-ভণিতায় ৫১টি পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে এবং ৩২টি পদ বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পদমেরুগ্রন্থে রায়-বসন্ত ভণিতায় ৩৪টি পদ আছে; তন্মধ্যে 'রজনী বিলাসে দুহু আলসে ভোর' (পৃ-৪৫৭) ও 'সুন্দরি করবহি সত্য পয়ান' (পৃ-৪৬০) পদ দুটি নূতন।

॥ বংশী দাস ॥

'বংশীদাস'-ভণিতায় শ্রীনিবাস-আচার্যের বন্দনা-বিষয়ক একটি পদ আছে গৌরপদতরঙ্গিণী (পৃ-৫) গ্রন্থে। ইনি শ্রীনিবাসের অন্যতম শিষ্য বংশীদাস-ঠাকুর হওয়া সম্ভবপর। কর্ণানন্দে এঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'শ্রীবংশী দাস ঠাকুর যেই মহাশয়। প্রভুর প্রিয় সখা হয় মধুর আশ্রয়।' প্রেমবিলাসের

---

১ পদটির প্রথম ছত্র—সতবয় পুটপাক তাপক সার। —পৃ-৪৬; বি. ভা. পু-৩৩৪৪। পদটি অ-প্রকাশিত।

২ পদমেরু গ্রন্থ (বিশ্বভারতী) - পৃ - ১২৫

৩ দাস গোবিন্দ এ সব গাহক গাওয়ে রায় বসন্ত। - পৃ ৬২ ক-খ; বি. ভা. পু - ৩৩৪৪

মতে, বংশীদাস ঠাকুর খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে এঁকে বংশীদাস চক্রবর্তী নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বংশীদাস নামে একজন কবি রূপ-গোস্বামীর 'নিকুঞ্জরহস্যস্তব' অনুবাদ করেন। গ্রন্থখানি ৩৫টি গীতিকবিতায় সম্পূর্ণ। অধিকাংশ গীত ব্রজবুলিতে রচিত। ইনি আলোচ্য বংশীদাস হওয়া সম্ভব।

বংশীদাসের কাব্য[১] গীতিমূলক; বর্ণনাপ্রধান নয়। পুথির প্রারম্ভে বিষয় নির্দেশ করা আছে—অথ শ্রীভাগবতানুসারেণ গীত লিখ্যতে। প্রথমে রাসলীলা, তারপর যথাক্রমে দ্বিজপত্নী উপাখ্যান, রাধাকৃষ্ণের বিবাহ, খণ্ডিতা, বিপরীত-খণ্ডিতা, নৌকাবিলাস ইত্যাদি। অতঃপর ছয় পদে 'অথ শ্রীচৈতন্য জন্মরহস্য' বর্ণনা করে কৃষ্ণলীলা পুনরাবৃত্ত হয়েছে। প্রথম পদের প্রথমাংশ এইরূপ—

শারদ শশধর রঞ্জিত রাতি
কিসলয় মল্লিকা ফুলে অলি মাতি।
সুখময় নেহারই কান।
মোহন বেশ বনে করল পয়ান॥ ধ্রু॥

ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান, কবি ষোড়শ শতাব্দীর লোক। বিশ্বভারতী সংগ্রহে বংশীদাস ভণিতায় ভজনরত্ন, রসতত্ত্ব গ্রন্থ নামে পুথি আছে।

বংশীদাস একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। পদকল্পতরুতে বংশীদাস ভণিতায় ১৭টি এবং বংশীবদন ভণিতায় ২৫টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়ের মতে, বংশীদাস এবং বংশীবদন অভিন্ন ব্যক্তি। বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে বংশীদাস ও বংশীবদনের পদ পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়েছে। প্রস্তুত গ্রন্থেও এই রীতি অনুসৃত হলো। বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহ থেকে বংশীদাস ভণিতায় ১১টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি; পদগুলির প্রথমছত্র অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট হলো।

॥ **গোকুল [গোকুলানন্দ] দাস** ॥

গোকুলানন্দ নামে শ্রীনিবাস আচার্যের তিনজন শিষ্য ছিলেন।

(১) হরিদাস আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোকুলানন্দ আচার্য

---

১ ক ৫২৯৬ (খণ্ডিত)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহে বংশীদাস ভণিতায় আরও অনেক কাব্য আছে। যথা—নিশাজলবিহার (৫২৯১), সুখতাম্বুলবিলাসরস (৫২৯২) ইত্যাদি। কাব্যগুলির রচয়িতা কোন্ বংশীদাস বলা যায় না।

(২) গোকুলানন্দ চক্রবর্তী
(৩) গোকুলানন্দ দাস

ভক্তিরত্নাকরের মতে, দ্বিজ হরিদাসের দুই পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে শ্রীনিবাস আচার্য দীক্ষা দান করেন। তন্মধ্যে গোকুলানন্দের উপাধি ছিল কবীন্দ্র; আদি নিবাস কডুই গ্রামে, পরে তিনি পঞ্চকোটের শেরগড়ে বসবাস করেন।

যদুনন্দনের সংগ্রহতোষণী গ্রন্থের 'ভক্তমাহাত্ম্য ও পাটের নির্ণয়' অংশে একজন গোকুলের উল্লেখ পাওয়া যায়—শ্রীগোকুল কবিরাজ গোয়াসে বসতি। কৃষ্ণনাম প্রেমদান সদা তার কীর্তি।

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, গোকুলানন্দের একটি পদে চৈতন্য-দেবকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা আছে। পদটি—

সঙ্গে পরিকর গৌরবর সুন্দর যাওত সুরধুনি তীর।
ও রূপ নেহারি চিত উমতাওল সরম ভরম গেও হইনু অথির।
গোকুলানন্দের হিয়া রূপের সায়র মাঝে ডুবল না জানে সাঁতার।

—H. B. L. P-544

পদকল্পতরু গ্রন্থে গোকুলদাস ভণিতায় ১টি ও গোকুলানন্দ ভণিতায় ১টি পদ মুদ্রিত হয়েছে। সম্পাদক মহাশয়ের মতে, এই গোকুলদাস ও গোকুলা-নন্দ একজন কিংবা বিভিন্ন পদকর্তা নিশ্চিত বলা কঠিন।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে (পুথি সংখ্যা—১৭৪৭) 'গোকুল' ভণিতায় বাংলা ও ব্রজবুলিতে রচিত ৪টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি; পদগুলির ভঙ্গি রাধাকৃষ্ণের সংলাপ। উল্লেখযোগ্য বিবেচনায় পদগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

৺৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

বিহানে আইলে কেনে দিতে মরেঁ তাপে।
ধিক ধিক ধিক জেবা স্যাম নাম জপে ॥
প্রতি য়ঙ্গে রতি চিহ্ন [র]হিলে কোন স্থানে।
জামিনি জাগিলে কোন রমনির সনে ॥
কপালে সিন্দুরের বিন্দু কার্জ্জলের সাত।
তাম্বুল চর্ব্বিত সহ দসনের ঘাত ॥
পদ নখ চিহ্ন তোমার দেখি হিআ মাঝে।
আমরা হইলে বল্ক মরিতাম লাজে ॥

জায় জায় নির্ল্লজ্জ তোমার বো [জ] লাম রীত।
সরল কথন নয় তোমার পিরিত ॥
সখিপানে রসবতি ফিরেল বয়ান।
গোকুল কহে চোর সমান হইল য়পমান ॥ ১ ॥

[সোন সো]ন সোন্দরি কর য়বধান।
আমি রাধা রাধা জপি তুমি বাস আন ॥
পূর্ব্বের নিয়ম······য়াছে গোপকুলে।
ভগবতি পূজি আমরা দিঞা নানা ফুলে ॥
সিন্দুর কার্জ্জল আর চন্দনে ভোসিত।
সে স[ব] লঞাছি আমি বল আন রিত ॥
নমস্করি···············করি বিষকা সঙ্গে।
তুমি বল পদ নখ চিহ্ন তুমার য়ঙ্গে॥
পরোপরি বাদ দীঞা কত সুখ পাঅ।
নিজ কুচে হাত দিঞা সপতি করাঅ ॥
সম্বুর সমান তোমা[র] দেখি কুচগিরি।
গকুল কহে ভাল কি ড্যাকব গিরিধারী ॥ ২ ॥

বোজিলহি চাতুরি নাগর ঢিট। কঙ্কণ দাগ বেকত ভেল পিট।
টাড়ক চিত্র বিরাজিত মুখে। হারক পাঁতি সুবিতত বুকে॥
কুঞ্জে পুহায়নু জাগিঞা রজনী। সো বহু সুন্দরি হাম কুরুপিনি ॥
তোহ রসিক বড় সুরসীকিনী। গমন করহ তহু হামার সহিনি ॥
জানলুঁ রঙ্গিনী সব রস তোর। এত বলি মানিনি মানে বিভোর
রাধা বিরস দেখি দুখিত শ্যামরায়।
দুহু করিছে ছেদে গকুল করে হায় হাঅ ॥ ৩ ॥

মলিন বদন কানুর তখন কহএ সোনহ রাই।
বৃন্দাবনে থাকি রিদে তোমা জপি ফুকুরে বাঁশিতে গাই ॥

কর অবধান রাখ মোর প্রাণ এমতি না কর মোরে।
অনুগত তোমা জানে জগজনা একথা বলিব কারে॥
কেনে প্রেমে বাদ খেম অপরাধ তুমি সে আমার গতি।
·········ধরি দুটি পায় পড়িলে অখিল পতি ।।
করে কর দিঞা ফেলিল ঠেলিঞা······নিঠুর পোনা।
মুখাইল মুখ গকুলে [র] দুখ হেরিঞা রসিকজনা॥
বিনয় বচন না হের তখন মাতে মাতিনি।
বুঝি অনাদর কাঁপে থর থর······কাঁন্দিঞা চলিলে হরি ।।
আদ পথ জাঞা······উলটিঞা চায়।
······পিতবাস ধরি······ ।। অতঃপর পুথি খণ্ডিত।

উপরোক্ত পদগুলির মধ্যে 'শুন শুন সুন্দরি কর অবধান' পদটি বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। সম্পাদক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, পদকর্তা গোকুল বীরভূমের মঙ্গলডিহি-নিবাসী।

॥ প্রতাপ-আদিত্য ॥

প্রতাপ-আদিত্যের ভণিতায় একটি পদ পাওয়া গেছে ১৬৪০ শকাব্দে (১৭১৮ খৃঃ) অনুলিখিত একটি পুথিতে। পদটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হলো—

রাগ নট ।। বন্ধুর লাগি কোন দেশে যাইমু।
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাইমু ।। ধ্রু ।।
... ...
প্রতাপ আদিত্যে কহে বিড়ম্বনা আছে।
মিছা ভুলি রৈলুম এ ভব মায়া রসে ।।

পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের একটি পদে (পদসংখ্যা ৫৩৮) প্রতাপ-আদিত্যের উল্লেখ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় বৈষ্ণবীয় পরম্পরায় তিনি ছিলেন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এখানে অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, পদকল্পতরুর পদের ভণিতা,—প্রাত আদিত ও রস গাহক দাসগোবিন্দ ভান। ফলে পণ্ডিতমহলে স্বভাবতই সংশয়ের উদ্রেক হয়েছিল কিন্তু বিশ্বভারতী ১৪৭৮ সংখ্যক পুথিতে ওই পদটির ভণিতায় প্রতাপ-আদিত্যের নামটি স্পষ্টই লিখিত রয়েছে।

॥ শিবরাম দাস ॥

নরোত্তম দাস-ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য শিবরাম দাসের ২৪টি পদ পদকল্পতরুতে সংকলিত হয়েছে; তন্মধ্যে বাংলা ও ব্রজবুলি ছাড়াও মিশ্র হিন্দি

ভাষায় রচিত কিছু পদ আছে। শিবরাম দাসের একটি পদ উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোক-বিশেষের মর্মানুবাদ।

বিশ্বভারতী সংগ্রহ থেকে শিবরাম দাস ভণিতায় ৫টি অপ্রকাশিত পদ পেয়েছি ; পদগুলির প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' দেওয়া হলো। এর মধ্যে একটি পদ (বি ভা পু-২৯৪৭) মৃদঙ্গ বাদ্যের বোল সম্পর্কিত। পদটি নিম্নে উদ্ধৃত হ'লো—

বাজে গির গির দিমিদাং দিমিদাং দৃমিদাং কীটী দাম।
তঘট তপট তাল মিদঙ্গ রঙ্গ রতন ঘন
তা তা থদি দদি রণ ঝননন ঃ ঝর্ঝর বর নানা নানা নানা ঃ
ঝঙ্কৃত ঝনন রণণ মনমথ মন ভুল।
হরস পরস হাস নয়ন ছয়ন রতিবিলাস।
চঞ্চল পট অঞ্চল মণিকুন্তলা তিলফুল ॥
তারক মণী হারক শশী ঝিলিমিলি দর্পীদার কলশী।
মুঞ্জন অতি পুঞ্জ গুঞ্জতি অলিকুল।
তা তা থৈ থৈ নাদ নূপুর গান মান তাল মধুর।
ধ্বনি শুনি শিবরাম দাষ অন্তর আনন্দে ভুল ॥

'শিবাই দাস'-ভণিতার ৬টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে। 'শিবাই দাস' শিবরাম ও শিবানন্দ—এই উভয় নামের সংক্ষেপ হতে পারে। ...... তবে শিবরামের রচনারীতির সঙ্গে শিবাইদাসের রচনার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

॥ **গোবিন্দ চক্রবর্তী** (-গোবিন্দদাসিয়া) ॥

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য গোবিন্দদাস চক্রবর্তী পদ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রগাঢ় ধর্মভাবুকতার জন্য ইনি ভাবক চক্রবর্তী নামে আখ্যাত হন। এঁর নিবাস ছিল বোরাকুলি গ্রামে। কবিপত্নীর নাম সুচরিতা, তিনপুত্র—রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ এবং কিশোরীদাস।

ইনি গোবিন্দদাস ও গোবিন্দদাসিয়া ভণিতায় পদ রচনা করেন ; স্বভাবতই এঁর পদ গোবিন্দদাস-কবিরাজের পদের সঙ্গে মিশে গেছে। রাধামোহন ঠাকুর তাঁর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় ৪টি পদ (পদকল্পতরু-পদসংখ্যা-১৩৩, ২৬৭, ২৭৭, ১৯৫৬) গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলে নির্দেশ করেছেন। রসকল্পবল্লী-রচয়িতা রামগোপালদাস ১টি পদ (পদকল্পতরু-পদসংখ্যা-১৭০৪) এঁর রচনা মনে করেন। পদকল্পতরু-সংকলক বৈষ্ণবদাসের মতে, একটি বারো-

দাসিয়া পদের (পদকল্পতরু-পদসংখ্যা-১৮০৮-১৩) শেষ ৬টি পদ গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, গোবিন্দদাস ও গোবিন্দদাসিয়া ভণিতাযুক্ত দু-একটি পদ গোবিন্দ আচার্যের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু গোবিন্দ আচার্য দ্বিজ-গোবিন্দ ভণিতাতেও পদ রচনা করতেন। পামরী-গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদ গুলি গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ পাঁচ শতাধিক নিঃসন্দিগ্ধ পদে কোথাও পামরী বা গোবিন্দদাসিয়া নামের উল্লেখ করেন নি।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথিতে গোবিন্দদাসিয়া ভণিতায় ১টি এবং পামরী গোবিন্দদাস ভণিতায় ১টি নূতন পদ উদ্ধার করেছি। পদদ্বয়ের প্রথম ছত্র অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে প্রদত্ত হ'লো।

॥ মোহনদাস ॥

কর্ণানন্দের বর্ণনা অনুসারে—'শ্রীমোহনদাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে। নৈতিক ভজন যাঁর অতি নিরমলে ॥' ৺সতীশচন্দ্র রায়ের মতে, কর্ণানন্দের এই পরিচয়ে মোহনের কবিত্বের উল্লেখ না থাকলেও অপর কোনো প্রসিদ্ধ মোহনের অবর্তমানে পদরচনার কৃতিত্ব ইঁহাকে অর্পণ করাই সঙ্গত মনে করি। পদকল্পতরুতে মোহন ভণিতায় ৩০টি পদ সংকলিত হয়েছে। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

॥ নৃসিংহ বা নরসিংহ ॥

পদকর্তা নৃসিংহ (বা নরসিংহ) নরোত্তম দাসের শিষ্য ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ—শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি সেহো। যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথির সূত্র থেকে নরসিংহ দাস নামে একজন কবির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর শিষ্য। নরসিংহ দাস ভণিতার মনঃশিক্ষা নামক ২২৫০, ২৩৭৩ সংখ্যক পুথিতে কবি অনেকবার উল্লেখ করেছেন—শ্রীরূপ গোসাঞির সঙ্গে সাক্ষাত সেবন রঙ্গে সদা তাঁর গণ যুক্ত হঞা। বন্দনাংশে পরম-গুরুরূপে শ্রীমিশ্র গোসাঞি নামে এক ব্যক্তির সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। এ ছাড়া চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর উল্লেখ আছে। বোধ হয় একাদশ

শ্লোকে রচনাটি সম্পূর্ণ। গ্রন্থে সেই রকম উল্লেখ পাই—

জীবের করিল হিত কহিল পরম রীত গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ
দাস মনঃশিক্ষা ভক্তিরস শ্লোক কৈল একাদশ…………
বলে বিষয় রস নানা।

কবির বিশিষ্ট ভণিতা দন্তে করি তৃণচয় নরসিংহদাস কয় কৃপা কর বৈষ্ণব গোসাঞি। অন্তে স্মৃতি এই ধন্য শ্রীগদাধর চৈতন্য শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ পাই॥

॥ কবি শেখর রায় ॥

রামগোপাল দাস শাখা-নির্ণয়ে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর-প্রভুর শাখায় একজন কবি শেখরের উল্লেখ করেছেন-- আর এক শাখা হয় কবি শেখর রায়। যাঁর গ্রন্থ পদ অনেক বিদিত সভায়। (পৃ—২১৩) কবিশেখর রায় শেখর ও শেখর-ভণিতাযুক্ত পদ গুলি এই কবিশেখরের হওয়া সম্ভব। কারণ এই সব ভণিতার পদে রঘুনন্দনের বন্দনা করা হয়েছে। একটি পদের ভণিতা—শেখরের প্রাণ মুকুন্দনন্দন তরল করিল প্রেমে। সুতরাং কবি যে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব তথ্যের প্রতি লক্ষ না করে পূর্বতন গবেষক ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর 'বিদ্যাপতি সমীক্ষায়' মন্তব্য করেছেন—পদকর্তা কবিশেখর যে রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন একথা রসিকদাসের উল্লেখ বাদ দিলে প্রমাণসহ নয়।

অনেক পদে কবি 'নবকবিশেখর' ভণিতা ব্যবহার করেছেন। মনে হয় এটি কবির উপাধি-বিশেষ। ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে গোপাল-বিজয়-কার দৈবকীনন্দন সিংহের কবিশেখর উপাধি ছিল এবং তিনি পদ রচনা করেছিলেন। নব কবিশেখরের উপাধি পূর্ববর্তী কবিশেখর দৈবকীনন্দনের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্যও হতে পারে।

বিশ্বভারতী সংগ্রহের একটি পুথিতে ভণিতা পাওয়া যায় 'কবি শেখর রায়'। অপ্রকাশিত হওয়ায় সমগ্র পদটি নিম্নে উদ্ধৃত হ'লো—

এ তুয়া চরণ তলে হাম। পদে ধরি কৈছে ঘুণ শ্যাম॥
তবু নাহি হের বয়ান। মানিনি উপেখি চলু শ্যাম॥
কুঞ্জ অঙ্গণে কুঞ্জরাজ। কাঁপী কাঁপী পড়ু খেতি মাঝ॥
ফেরি নেহারই রাই। মরি মরি কি হলা মাধাই॥
বজর পড়ব যুনি বোল। ধাই ধনি বন্ধু করি কোর॥
কো সমঝায়ব এহ। দোহা প্রেমে না বান্ধয়ে থেহ।

নিরলস হেরি বয়ান। সরবস কর [সমাপণ] ।।
কহ কবি শেখর রায়। দোঁহে দোহার [হৈল] সহায় ।।

পৃ—২১৬খ ; ৩৭৪৪

এ ছাড়াও কবি 'দুখিয়া শেখর' 'পাপিয়া শেখর' প্রভৃতি ভণিতা ব্যবহার করেছেন।

কবির ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অনেকের মতে, ইনি বর্ধমান জেলার পড়ান গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দ্বিজ কবিশেখর ভণিতা অবশ্যই জাতিবাচক। নৃপ কবিশেখর ভণিতা থেকে মনে হয় কবি ছিলেন সম্পন্ন ব্যক্তি।

কবির জীবৎকাল সম্পর্কে 'রায় শেখরের পদাবলী' গ্রন্থের সম্পাদক-দ্বয়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের মতে, খেতুরীর মহোৎসব ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হয়; সেই উৎসবে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে রায়-শেখরের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল অল্প এবং কবিকৃতিও প্রচারিত হয় নাই। এঁর রচিত পদগুলি অনুশীলন করলে দেখা যায় রচনাশৈলীতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি গোবিন্দদাসের অনুসরণ করেছেন; এই হেতু তাঁকে গোবিন্দদাসের পরবর্তী মনে করা যেতে পারে।

এদিকে রায়শেখরের পদাবলী গ্রন্থে ধৃত 'দুখিয়াশেখর' ভণিতাযুক্ত বন্দনাবিষয়ক একটি পদে কবি চৈতন্যদেবের আদ্য অনুচরগণের নামোল্লেখ করেছেন। পদটিতে রামানন্দ, অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, পরমানন্দ, শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ, স্বরূপ, জগদানন্দ, শ্রীবাস, মুকুন্দ, গোবিন্দ, নরহরি, গদাধর, দামোদর লোচনদাস, হরিদাস, ঠাকুর শ্রীসুন্দর, বনমালী, শ্রীধর, বক্রেশ্বর, গৌরীদাস, কাশীশ্বর, পুরীদাস, শিবাই, নন্দাই প্রমুখের উল্লেখ থেকে অনুমান হয় কবি রায়-শেখর গোবিন্দদাস-কবিরাজের অনেক পূর্বেই পদরচনা শুরু করেন।

রায়শেখরের পদাবলী গ্রন্থে রায়শেখর রচিত মোট ২৫৩টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। বিশ্বভারতী সংগ্রহে রায়শেখর, শেখর, কবিশেখর ভণিতায় মোট ১৮টি নূতন পদ সংগ্রহ করেছি; সেগুলির প্রথম ছত্রের সূচী অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে, সন্নিবিষ্ট হলো।

॥ দৈবকীনন্দন ॥

'বৈষ্ণববন্দনা'-রচয়িতা দৈবকীনন্দন ছিলেন নিত্যানন্দ-প্রভুর অনুচর পুরুষোত্তম দাসের শিষ্য। বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থে বীরভদ্রের পুত্রত্রয়ের উল্লেখ আছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, এই অংশ প্রক্ষিপ্ত না হলে গ্রন্থখানি ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে রচিত।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে (পুথি সংখ্যা—১৭৬৬; পত্র সংখ্যা—২ ; সম্পূর্ণ) শ্রী দৈবকীনন্দন কবিরাজ ভণিতায় বৈষ্ণব অভিধান নামে একটি রচনা রয়েছে। বন্দনাংশে কবি গুরুরূপে পুরুষোত্তমের নামোল্লেখ করেছেন। রচনাটি চৈতন্য পরিকরবর্গের নাম-তালিকা সম্বলিত।

গ্রন্থোক্ত তালিকায় মাধবপুরী, অদ্বৈতাচার্য, গোপীনাথ, শ্রীবাস, গোবিন্দ, চন্দ্রশেখর, পীতাম্বর, জগন্নাথ, নীলাম্বর চক্রবর্তী, গঙ্গাদাস, সুদর্শন-পণ্ডিত, বিদ্যানিধি, শ্রীসদাশিব, শুক্লাম্বর, শ্রীধর পণ্ডিত, রামদাস, হলায়ুধ, জগদীশ, সঞ্জয়, বাসুদেব, মুকুন্দ, বল্লভাচার্য, নন্দনাচার্য, কবি মধুসূদন সার্বভৌম, সুবিদ্ধি মিশ্র, তুলসী মিশ্র, শ্রীনাথ শংকর, চৈতন্যদাস, পরমানন্দ গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, শ্রীল রঘুনন্দন, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, সতীর্থ-পরমানন্দ, বক্রেশ্বর দ্বিজ, রায়-রামানন্দ, বাণীনাথ পট্টনায়ক, হৃদয়ানন্দচৈতন্য, শ্রীমৎ-আচার্য মাধব, সনাতন প্রমুখের নাম আছে।

রচনাটি আলোচ্য দৈবকীনন্দনের হতে পারে।

॥ কৃষ্ণদাস ॥

ষোড়শ শতকে বাংলা সাহিত্য 'কৃষ্ণদাস' নামে অনেক কবি ছিলেন তারমধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।[১] কাব্যটি ভাগবৎ অবলম্বনে রচিত; দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কাহিনী গৃহীত হয়েছে হরিবংশ থেকে। এ সম্পর্কে কবির কৈফিয়ৎ—

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে। অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে ॥
আর অপরূপ কথা অমৃতের ভাণ্ড। না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকাখণ্ড।
হরিবংশে লিখিঞাছে করিঞা বিস্তার। এবে গোপীগণ হৈলা যমুনাতে পার ॥

এছাড়া, অপৌরাণিক ভারখণ্ড ও বংশীচৌর্যকাহিনী-ও গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত (১৩৩৩)।

কৃষ্ণদাসের পিতা যাদবানন্দ, মাতা পদ্মাবতী, বসতি 'জাহ্নবীর পশ্চিম কূলে।' কবি মাধবাচার্যের সেবক ছিলেন। মাধবাচার্য কৃষ্ণদাসকে বলেছিলেন—দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার। এথাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার।

দীক্ষাগুরু সম্পর্কে কবি বলেছেন—আমার [প্রভুর ?] প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী। দীক্ষামন্ত্র দিলা প্রভু মোর কর্ণে ধরি॥ —এই শ্রীমতী ঈশ্বরী কে নিশ্চিত করে বলা যায় না ; তবে ভক্তিরত্নাকরে বহুবার জাহ্নবী দেবীকে শ্রীমতী ঈশ্বরী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাব্যটি 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত ছিল। বিশ্বভারতী সংগ্রহের ৬০৭৩ ও ৫৯৭৭ সংখ্যক পুঁথিতে ভণিতা পাওয়া যায় এইরূপ—

রাধাকৃষ্ণ নাম শিশু অন্তরে ধেয়ায়। গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণদাসে গায়॥
হরিকথা শ্রবণে অশেষ পাপ নাশে। গোবিন্দমঙ্গল গীত গায় কৃষ্ণদাসে॥

ভূমিকাংশে সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেছেন, মাত্র দু'খানি পুঁথির উপর নির্ভর করে সম্পাদনকার্য সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে একটি পুঁথি খণ্ডিত। সম্পাদনায় তেমন-কোনো ত্রুটী না থাকলেও প্রায় চারশ বছরের প্রাচীন গ্রন্থ সুসম্পাদনার পক্ষে দু'খানি মাত্র পুঁথি যথেষ্ট নয়। কতকগুলি জায়গায় সম্পাদক মহাশয়কে নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করে পাদপূরণ করতে হয়েছে। গ্রন্থটির একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ হওয়া উচিত।

॥ **বংশীদাস** ॥

মনসামঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ-বংশীদাসের কাব্যরচনাকাল সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে ৺অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগ্রহে শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ নামে একটি মুদ্রিত পুঁথি আছে।[১] গ্রন্থের মুখপত্রে বলা হয়েছে, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দেবের আদেশানুসারে শ্রীযুক্ত বংশীদাস ভট্টাচার্য দ্বারা প্রণীত।

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নারায়ণ দেবের আদেশে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল একথা সুবিশাল গ্রন্থে কোথাও বলা হয় নি। কেবলমাত্র এক জায়গায় আছে—দ্বিজ বংশীদাস ভনে আজ্ঞা দিল নারায়ণে অদ্ভুত সমুদ্র মথন। পৃ–১৭। বলা বাহুল্য এ 'নারায়ণ' কবি নারায়ণ দেব নন :

১ শ্রীশ্রী পদ্মপুরাণ ৩১৮ নং অপর চিৎপুর রোড শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত ৩য় সংস্করণ সন ১৩০১ সাল।

ইনি কবির ইষ্টদেব। একাধিক স্থলে কবি তাঁর ইষ্টদেবের দোহাই দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থটি বংশীদাসের কাব্যের বিশুদ্ধ সংস্করণ নয়; নারায়ণ দেব, দ্বিজ জানকীনাথ, বিপ্রষষ্ঠীনাথ প্রমুখ কবির রচনা এতে মিশেছে

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যের প্রামাণিক সংস্করণে[1] রচনাকালজ্ঞাপক পয়ার পাওয়া যায় এইরূপ—জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার। শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥ পৃ—১৪

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, এই পয়ারের অকৃত্রিমতা সবিশেষ সন্দেহজনক। প্রথমতঃ এই দুই ছত্র কোনো পুথিতে নেই। দ্বিতীয়তঃ "জলধির (৭) বামেতে ভুবন (১৪) মাঝে দ্বার (৯) অর্থাৎ ১৪৯৭ শকাব্দ—১৫৭৫-৭৬ খৃঃ—এই রকম হিসাব নিতান্ত কষ্টকল্পিত এবং উদ্ভট। তৃতীয়তঃ ১৩১৩ সালে বংশীদাসের যে নিকটতম অধস্তন পুরুষ বর্তমান ছিলেন তিনি কবির সপ্তম স্থানীয়। সুতরাং বংশীদাসের জীবৎকাল সপ্তদশ শতকে হওয়া দুরূহ।[2]

। **বলরাম কবিকঙ্কণ** ।।

অনেকের মতে, বলরাম-কবিকঙ্কণ নামে একজন কবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের পূর্বে কাব্য রচনা করেছিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বঙ্গবাসী-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংস্করণের দিগ্‌বন্দনাংশে উদ্ধৃত "বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ। প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণ" ॥ —ছত্রটি এই বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। কিন্তু কোনো প্রাচীন পুথিতে এই পাঠ পাওয়া যায় না। তাছাড়া বলরাম কবিকঙ্কণের কাব্যের কোনো প্রামাণিক পুথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং কবির অস্তিত্ব সবিশেষ সন্দেহজনক। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর অভিমত, এই কবিকঙ্কণ একজন অভিজ্ঞ গায়েন হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়। তাছাড়া মুকুন্দরামের উল্লেখিত শ্রীকবিকঙ্কণ ও বলরাম কবিকঙ্কণ যে অভিন্ন ব্যক্তি সে বিষয়ে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ কিছু নেই।

বর্ধমান জেলার রায়না-সন্নিহিত বর্তমান বিদ্যানিধি (বা বিদ্যেনি) নিবাসী মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিবৃতি অনুসারে, বলরাম কবিকঙ্কণের কাব্যের একটি অতি-অর্বাচীন পুথি (খাতার আকারে ২৬ পৃষ্ঠার)

১ দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও রামনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত সংস্করণ (১৩১৮)।
২ বা. সা. ই. পৃ- ৪৭১

মেদিনীপুরের ঈশানচন্দ্র বসুর নিকট ছিল। ভণিতা দৃষ্টে অনুমান হয়, বলরাম মুকুন্দরামের অনেক পরবর্তী অনুকারক মাত্র।

যোগেশচন্দ্র বসুর মতে, এঁর কাব্য ওড়িয়া ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল ; ফলতঃ ইনি রাঢ়-ওড়িষ্যা সীমান্তের অধিবাসী হওয়ার অধিক সম্ভাবনা।

॥ **কবিচন্দ্র** ॥

চণ্ডীদাসের মতো কবিচন্দ্র শব্দটিও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি সমস্যা বিশেষ। এই সময়ে কবিচন্দ্র নামে একাধিক কবি সাহিত্য সৃষ্টি করেন।

গোবিন্দমঙ্গলকার কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর সন্নিহিত লেগো গ্রামের দক্ষিণে পানুয়া (বর্তমান পেনো) গ্রামে।

গুরুদক্ষিণা-রচয়িতা কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত কুলচণ্ডা গ্রামে। মল্লভূম-নিবাসী একাদশী পাঁচালিকার কবিচন্দ্রের উপাধি ছিল মিশ্র।

আমাদের আলোচ্য গৌরীমঙ্গল-রচয়িতা কবিচন্দ্র মহামিশ্র-জগন্নাথের বংশজাত হৃদয় মিশ্রের পুত্র ; কবিকঙ্কণ মুকন্দরামের অগ্রজ। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, ইনি-ই গঙ্গাস্তোত্রের রচয়িতা।

বিশ্বভারতী সংগ্রহে গঙ্গাস্তোত্রের যতগুলি পুথি আছে সবই মুকুন্দরাম ভণিতাঙ্কিত। বোধহয় মুকুন্দরাম দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করায় তাঁর খ্যাতির অন্তরালে স্বল্পখ্যাত কবিচন্দ্রের রচনা আত্মগোপন করে গেছে।

গৌরীমঙ্গল কাব্যটি দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ভণিতায় কবিচন্দ্র মিশ্র, কবিচন্দ্র, শ্রীকবিশঙ্কর, শঙ্করকিঙ্কর প্রভৃতি উল্লেখ আছে। কাব্যখানি নব শশী সুর ইন্দ্র (নব=৯, শশী=১, সুর=৪, ইন্দ্র=১)=১৪১৯ শক বা ১৪৯৭ খৃঃ পঞ্চগৌড়ের অধিপতি হুসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল।

কবিকঙ্কণ বহুবার তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ করেছেন—মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন। তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পূর্বে উল্লেখ করেছি মুকুন্দরামের অগ্রজ কবিচন্দ্রই গৌরীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। এই সিদ্ধান্তের মূলে সংগৃহীত তথ্যগুলি উপস্থাপিত করছি—

(১) মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যের দেবখণ্ড অংশের ভণিতায় বলেছেন—মুকুন্দ রচিল গৌরীমঙ্গলের সার। (পৃ—২৯৯)। মুকুন্দ রচিল গীত গৌরী

মঙ্গল ভাষা (পৃ—৮৭)। এতে মনে হয় কবিচন্দ্রের গৌরীমঙ্গল মুকুন্দরামের দেবখণ্ড রচনার আদর্শ ছিল।

(২) উভয়ের আত্মকাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মুকুন্দরাম ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে দামিন্যা ত্যাগ করে মেদিনীপুর চলে যান। পক্ষান্তরে বালাগুর গুণীজন সভা ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কবিকে স্বগ্রাম থেকে নিয়ে গিয়ে গন্ধমাল্য দ্বারা সম্মানিত করে বিধিবদ্ধ পাঁচালি রচনার অনুরোধ করেন। সেই কাব্যই গৌরীমঙ্গল।

(৩ আত্মপরিচয়ে উভয়ের সাদৃশ্য আছে। কবিচন্দ্র মাতার নাম বলেছেন লীলাবতী ; মুকুন্দরামের মাতার নাম দেবকী কি না সন্দেহ আছে। লীলাবতী নামটি মুকুন্দরামের প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই হয়তো মুকুন্দরামের মাতৃনাম। কবিচন্দ্র পিতার উল্লেখ করেন নাই তাঁকে কেবল 'গুণের নিধান' বলেছেন : মুকুন্দরাম পিতাকে বলেছেন গুণীরাজ।

(৪) দিকবন্দনায় কবিচন্দ্র উল্লেখ করেছেন—উতরেত চক্রতীর্থ নাম পুণ্যস্থান। দেবচক্রপাণি তথা নিত্য অধিষ্ঠান। মুকুন্দরাম বলেছেন—দামুন্যার ঠাকুর বন্দিব চক্রাদিত্য। এই দুই দেবতা মূলতঃ একই ; দামুন্যায় অধিষ্ঠিত চক্রপাণি বিষ্ণু।

বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে (অধিগ্রহণ সংখ্যা—৪৪৩২) বৈষ্ণববন্দনার পুথিতে একটি ছত্র আছে—কবিচন্দ্র মুকুন্দ বন্দো বলরাম সাথ। এ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় কবিচন্দ্র মুকুন্দের আত্মীয়।

॥ **মাণিক দত্ত** ॥

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, মাণিকদত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের জনশ্রুতিমূলক আদি কবি। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের বন্দনাংশে এঁর উল্লেখ আছে—'মানিক দত্তের দাণ্ডা কবিয়ে বিনয়। যাহা হৈতে হৈল গীত পথে পরিচয়।' দাণ্ডা বা দাঁড়া অর্থে সুপ্রাচীন পরম্পরাবাহী ধারা। গ্রামাঞ্চলে জলবাহী নালা অর্থে ওই শব্দের প্রচলন আছে।

মাণিক দত্তের কাব্যের যে পুথি পাওয়া যায়, ডঃ সুকুমার সেনের মতে, তিনি চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি নন ; কারণ পুথিতে এক পূর্বতন মাণিক দত্তের উল্লেখ আছে।

যে মাণিকদত্তের চণ্ডীকাব্যের পুথি পাওয়া গেছে তিনি চৈতন্য পরবর্তী যুগে কাব্য রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যের বন্দনা থেকে অন্তত তাই প্রমাণ

হয়। তবে এই কবি পূর্ববর্তী মাণিক দত্তের কাছে কতখানি ঋণী ছিলেন এবং চৈতন্যবন্দনা অংশটি পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ কি না সঠিকভাবে বলা যায় না। পুথি খুব প্রাচীন নয়। কাব্যটিতে ছড়ার বাহুল্য আছে। কাব্যের প্রারম্ভে ধর্মঠাকুরের শাস্ত্র অনুযায়ী সৃষ্টিপত্তন কাহিনীর বর্ণনায় প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণ লক্ষণীয়।

।। সপ্তিবৃত্ত ।।

।। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ।।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। এঁর কাব্যরচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ থাকলেও ১৫৭৪-১৬০৪ খৃঃ গ্রহণযোগ্য।

কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রে ইনি মানিক দত্তের অনুসরণ করেছিলেন; আবার কোনো কারণে মাণিক দত্তের আদর্শ পরিত্যাগ করে অন্য কবির অনুসরণ করেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং কবির বিবৃতি—মাণিক দত্তকে করিয়ে পরিহার। বড়ু সর্ব্বানন্দকে করিল নমস্কার॥ বড়ু সর্বানন্দের কাব্যের কোনো সন্ধান পাই নি।

কাব্যের প্রথম অংশ (কতদূর পর্যন্ত বলা মুসকিল) দামিন্যায় লেখা। কারণ কাব্যে প্রথম দিকে ভণিতা আছে—'দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।' পরবর্তী অংশ আড়রায় লেখা। কাব্যটি দীর্ঘদিন ধরে রচিত হয়েছিল।

কাব্যের প্রথম দিকে প্রদত্ত আত্মকাহিনীতে সেকালের সমাজের রাজনৈতিক অ-স্থিরতার সংবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া সমাজের সর্বস্তরের জনজীবনের খুটি-নাটি তথ্যে গ্রন্থখানি সবিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। প্রখ্যাত সমালোচকের মতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরানো কবিদের মধ্যে শুধু মুকুন্দরামের প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচয়িতার ভাব ও রসদৃষ্টি ছিল। কবির বাস্তবদৃষ্টির আলোকে কাব্যটি অসাধারণ উৎকর্ষ দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর মতে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় প্রখ্যাততম কবি মুকুন্দ রাম চক্রবর্তীর লোকদুর্লভ প্রতিভা চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বিংশ শতকের সমালোচকগণ মুকুন্দ প্রতিভায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কবি-সমালোচক রামানন্দ যতি তাঁর

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে (১৭৬৬-৬৭ খৃঃ) মুকুন্দরামের কঠোর সমালোচনা করেছেন। কবির ভাষায়—

মুকুন্দের বিরচণ ইন্দ্রপুরে কাঁটাবন ইন্দসুত তাহে তোলে ফুল……
নিমাই চরণ রায় প্রতি পদে দোষ গায় পুস্তকের সম (?) দোষ নাশ
অষ্টাহের গান হয় এতো দোষ ধর‍্যা কয় তাহে পাবে দোষের প্রকাশ।
পার্ব্বতী যে পঞ্চশর পুরেন প্রভুর পর সেই শর শিশুর উপর
কালিদহে পুরে কালী মাকে এত দেয় গালি……মুকুন্দ গাবর।
শাস্ত্রের কথন হয় তবে পণ্ডিতেরা লয় মিথ্যা বর্ণনাতে এত দোষ।
কিছু বোধ নাই যার দোষ গুণ কিবা তার দোষ শুন্যা করে আর রোষ॥

মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীর অলৌকিকতার প্রতিও রামানন্দ যতি কটাক্ষপাত করেছেন—

চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা যায় লেখা পাঁচালির অমনি রচন
বুদ্ধি নাই যার ঘটে তারা বলে সত্য বটে পথে চণ্ডী দিলা দরশন।
এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে চণ্ডী রচে রামানন্দ-যতি

রামানন্দ যতি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন কিন্তু জনসাধারণকে চৈতন্য দান কর্মে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন জানি না।

॥ কবি-বল্লভ ॥

কবিবল্লভের রসকদম্ব কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য নয়; বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থ। গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা কোনো গ্রন্থ-বিশেষের নাম নয়; শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণু-পুরাণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাবলীকে কবি ব্যাপক অর্থে শ্রীকৃষ্ণসংহিতা অভিধায় বিশেষিত করেছেন। গ্রন্থশেষে কবি আত্মপরিচয় প্রদান করেছেন—

পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা। করতোয়া তীরে মহাস্থানের সমীপে। আড়োরা গ্রামেতে জন্ম। ইত্যাদি।

কবির গুরু উদ্ধব দাস। ইনি গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত উদ্ধব দাস বলে অনেকে মনে করেন। নরহরি ঠাকুরের শিষ্য মুকুটরায় কবির অন্যতম সুহৃদ। তাঁরই অনুরোধে গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল। বনমালী দাসও কবিকে গ্রন্থরচনা বিষয়ে উপদেশ দান করেছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ রূপ-সনাতনের অনুগ্রহ-প্রাপ্ত অদ্বৈত উপশাখা প্রবর্তক বনমালী দাস। চৈতন্যবন্দনার রীতি থেকে মনে হয় কবি চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। গ্রন্থরচনাকাল সম্পর্কে

কবির বিবৃতি—ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে। বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে।। বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক। তখনে রচিল রসকদম্ব পুস্তক। অর্থাৎ ১৫২০ শক বা ১৫৯৯ খৃঃ গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়।

২২টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পরে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ-প্রভু প্রমুখ গৌরভক্তের বর্ণনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্ররস, তৃতীয় অধ্যায়ে বিভবরস, চতুর্থ অধ্যায়ে হাস্যরস পঞ্চম অধ্যায়ে প্রেমরস, ষষ্ঠ অধ্যায়ে অদ্ভুতরস, সপ্তম অধ্যায়ে শিক্ষারস, অষ্টম অধ্যায়ে ভেদরস, দশম অধ্যায়ে শৃঙ্গাররস, একাদশ অধ্যায়ে প্রেমরস, দ্বাদশ অধ্যায়ে শান্তিরস. ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভাবরস, চতুর্দশ অধ্যায়ে ভজনরস, পঞ্চদশ অধ্যায়ে বীভৎস রস, ষোড়শ অধ্যায়ে আস্থারস, সপ্তদশ অধ্যায়ে ভক্তিরস অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভীতরস, ঊনবিংশ অধ্যায়ে বিস্ময়রস, বিংশ অধ্যায়ে করুণরস, একবিংশ অধ্যায়ে বীররস, দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দীক্ষারস বর্ণিত হয়েছে।

অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত রসের অনুশীলন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নয় এবং আলংকারিক অর্থে কবি রসগুলির নাম প্রয়োগ করেন নাই, কবি বিভিন্ন রসের নাম দিয়েছেন অধ্যায়ের বিষয় ইঙ্গিত করার জন্য। যথা—যে অধ্যায়ে দ্বারকার বৈভব বর্ণিত হয়েছে সেই অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে বৈভবরস। গ্রন্থারম্ভে প্রথম অধ্যায়ের নাম আদিরস ; কিন্তু অলংকার শাস্ত্রোক্ত আদিরসের বর্ণনা কবির উদ্দেশ্যে নয়।

অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের গ্রন্থে কবি-বল্লভের রসকদম্ব সহজিয়া গ্রন্থতালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বকোষেও রসকদম্ব সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থরূপে উল্লেখিত হয়েছে। কবিবল্লভ সহজিয়া ধর্মের আলোচনা মাত্র করার জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই। 'সহজ' বা সহজিয়া শব্দ কবি-বল্লভের গ্রন্থে কোথাও নাই। তবে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি ভাবের উপাসনার কথা আছে। কিন্তু একমাত্র সে কারণে রসকদম্ব গ্রন্থকে সহজিয়া গ্রন্থরূপে প্রচার করা সমীচীন নয়।

।। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ ।।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা রূপে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের খ্যাতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়াও কৃষ্ণদাসের নামে অনেক রচনা প্রচলিত আছে। অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু তাঁর Post chaitanya sahajia cult (P-293-95) গ্রন্থে এই রকম ৫৮টি রচনা সহজিয়া সাহিত্যের

তালিকাভুক্ত করেছেন। তন্মধ্যে সব গুলি চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস-কবিরাজের রচনা কি না এবং রচনাগুলির প্রত্যেকটি সহজিয়া লক্ষণাক্রান্ত কি না স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

এছাড়া বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে 'কৃষ্ণদাস' ভণিতায় আরও অনেক অপ্রকাশিত ও অপরিজ্ঞাত রচনা রয়েছে 'কৃষ্ণদাস'-ভণিতাযুক্ত বৃন্দাবন জ্ঞান (বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা-১৬৬৪) পুথিতে বৃন্দাবনের ভৌগোলিক বর্ণনা আছে লেখক সম্ভবতঃ চৈতন্যচরিতামৃতকার স্বয়ং।

'রঘুনাথদাসের গুণলেশ সূচক' নামক রচনাটি শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবনকাহিনী সম্বলিত। বঙ্গানুবাদ সহ ১৪টি শ্লোকে রচনাটি সম্পূর্ণ। রচনার পরিচয় নিম্নরূপ ঃ—

বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা—১৪৯৪। পত্র সংখ্যা—৩। খণ্ডিত।

······রাধাকুণ্ডতটে বসন্নিয়মিত সভাত্ররুদ্ধয়া বাসঃ কম্বলকৈঃ পলৈর্ভজত বৈগর্ব্বৈশ্চ বৃত্তিং দধৎ। রাধাং সংস্মৃতি কীর্ত্তনৈর্ভজয়তি স্নানং ত্রিসন্ধ্যং চরণ ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহমে ভূয়ঃ সদৃগগোচর॥ রূপের আজ্ঞায় তিহো রাধাকুণ্ডতীরে। বসতি করিল তিহোঁ নির্ন্নয় অন্তরে॥ বসন পরিধেয় আর এ ছিণ্ডা কম্বল। ব্রজভব গব্য ভুঞ্জে দিনে তিন পল॥ রাধাকৃষ্ণ স্মরণ কীর্ত্তন ভজে জেই। তিনবার রাধাকুণ্ডে স্নান আচরই॥ সেই রঘুনাথ দাস পুন এ নয়নে গোচর হউক করু কৃপা নিরক্ষণে॥

এছাড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহে (পুথিসংখ্যা—২২৭৪) 'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিতং শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীনং অষ্টক' এবং 'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীসনাতন গোস্বামী অষ্টক' নামক দুটি রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। রচনা দুটি ৯টি শ্লোকে সম্পূর্ণ। রচনার নিদর্শনরূপে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হলো—

শ্রীরূপ গোস্বামীষ্টক॥ শ্রীরূপ গোস্বামীএ নমঃ। গৌরচন্দ্র ভক্তবিন্দু ·····বল্লভঃ। গৌরচন্দ্র পাদপদ্ম দ্রিপি বিলাস পল্লবং। দীন হীন নিন্দুকাদি সর্ব্বলোক তারণং। দেহি রূপ পাদপদ্ম মাম দীন দুর্লভং ॥ ১ ॥

ব্রজবিলাস রসোল্লাস গ্রন্থ লক্ষ বর্ন্নং।·········পরম শ্রীগোবিন্দ বিগ্রদৃষ্ট সেবনং। দেহি রূপ পাদপদ্মে মাম দীন দুর্ল্লভং। রসাঙ্কুর ভক্তিতত্ত্ব দান কেলি গুঞ্জনং। ভাগবতামৃতাদিকং সর্বভাব লক্ষণং স্তবাদীচ ছন্দোবন্ধ নাম গুণ·········দেহি রূপ পাদপদ্ম মাম দীন দুর্ল্লভং। ভণিতা, ইতি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীনাং অষ্টকং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিতং সম্পূর্ণং॥

গৌরচন্দ্র প্রভুভক্তি জষ্ট নিত্য বিগ্রহং। সর্ব্বসাগু বিচারেষু জষ্ট নিত্য আগ্রহঃ। হরিভক্তিবিলাসে সুলক্ষণ গ্রন্থবর্ণনং। জষ্ঠ অগ্রগণ্য মান্যয়ে শ্রীসনাতনং ॥
ভণিতা, ইতি শ্রীসনাতন গোস্বামী অষ্টক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত সংপূর্ণং ॥

।। **দ্বিজ-মোহন দাস** ।। (**নবাবিষ্কৃত**)

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিজ-মোহন দাস একটি নূতন নাম। এঁর রচিত 'ভক্তমালা' নামক একখানি বৃহৎ গ্রন্থের একাধিক খণ্ডিত প্রতিলিপি বিশ্বভারতী সংগ্রহে (পুথিসংখ্যা—৩৫৫১, ৩৭২৭, ৫৬১৯) সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে ৫৬১৯ সংখ্যক পুথিখানি দুই শতাধিক পত্র সম্বলিত। সম্পূর্ণ পুথি না থাকায় গ্রন্থখানির পূর্ণ পরিচয়-প্রদান সম্ভবপর নয়।
ভক্তমালা গ্রন্থখানি নানা দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গ্রন্থে নিম্নলিখিত ভক্তগণের কাহিনী নিয়ে মালা গাঁথা হয়েছে :—

১। গোপীভক্তের বর্ণনা। সুপ্রাচীন নৌকাখণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে কবি ব্রজগোপীগণের ভক্তির মহিমা বর্ণনা করেছেন। রাধা প্রধানা গোপীর ভূমিকায় অবতীর্ণা। কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলন সংঘটনে বড়াই-এর ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করেছে। গ্রন্থের এই অংশ আদি রসাশ্রিত। বড়াই চরিত্র চিত্রণে কবি কোথাও কোথাও শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করেছেন।

২। বড়াই এর দুই দাসী কুন্দুলী ও জঞ্জালীর উপাখ্যান।

৩। মধুবনে রাসলীলা। এই অংশ আদি রসাশ্রিত।

৪। রামায়ণের বিভীষণ, কৌশল্যা, অহল্যা, শবরী-প্রমুখ রামভক্তের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সবিস্তারে। কবি বাল্মীকির কাহিনীও এই অংশে স্থান লাভ করেছে।

৫। মহাভারতের কৃষ্ণভক্ত অভিমন্যুর পূর্বজন্মের কাহিনী।

৬। লীলাশুক বিল্বমঙ্গল, জয়দেব প্রমুখ রসিক ভক্তের উপাখ্যান। জয়দেবের প্রসঙ্গে কবির ভৌগোলিক তথ্য সমৃদ্ধ বর্ণনা—
কেন্দুবিল্লি গ্রাম আছে অজয় কিনারে। জয়দেবের বাস সেথা.........হিরে
জয়দেব রাখেন করয়া কোপিন। বৃক্ষের তলেতে বাস সদা উদাসীন ।।
—পৃ ১৪০-৪৪ : ৫৬১৯
নীলাচলে রাজা এক পুস্তক বর্ন্নিলা। শ্রীগীতগোবিন্দ গ্র........................ ॥

'পুস্তক জগন্নাথের অগ্রে ধরিলা। পণ্ডিত সকল রাজার অগ্রে·········॥

পুন গঙ্গা জয়দেব কহেন বচন। গৃহে বসি·····················দরশন॥
জয়দেব কহি মাতা নিবেদি চরণে। দরশন দিবে তোমায় চিনিব কেমনে॥
গঙ্গা কহে·········বচন আমার। সেই দিন অজয়েতে হইবে জুয়ার॥
সেদিন অজয়ে হবে কমলের বন। নিশ্চয় জানিবে············আগমন॥
পোউষ মাসের শেষ সংক্রান্তির দিনে। মকরের দিনে সেই জগজনে জানে॥
পৃ—১৪০-৪৪ : ৫৬১৯

এই সব বর্ণনাও ঐতিহ্যসম্মত।

৭। চৈতন্যলীলা। এই অংশে চৈতন্যদেবের আর্বির্ভাব, সন্ন্যাসগ্রহণ, নীলাচল গমন, সার্বভৌমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সার্বভৌমের জবানীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণ সম্পর্কিত কাহিনী, কেশব ভট্টের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গোবিন্দ-প্রেমাবতির বর্ণন, গোবিন্দকুণ্ডের বিহার এবং অন্ত্যলীলা কাহিনী।

চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর নবদ্বীপবাসীর শোকোচ্ছ্বাসের বর্ণনা অতিশয় প্রাণবন্ত, আন্তরীক ও মর্মস্পর্শী—

নদীয়ার নরনারী কান্দিয়া ভ্রমিছে সারি শরীরে সোয়াস্ত কারো নাই।
নেত্রে অশ্রুধারা চলে কহে গোরা কোথা গেলে দেখা দেহ বারেক গোসাঞি॥
নবদ্বীপের ঘরে ঘরে কান্দে সবে উচ্চস্বরে কেহ কেহ ভূমে গড়ি যায়।
·········কহেন তবে কাদিলে আর কিবা হবে বিধির ঘটনা কে ঘুচায়॥
সুনি মুকুন্দের মুখে নেত্রে শচি নাহি দেখে মুখে বাক্য নাহি বাহিরায়।
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে পুন ওঠে পুন পড়ে কহেন বাছা কোথারে নিমাই॥
তথা পড়শির গণে কেহ শীতল জল আনে দেন শচীর মুখ ধোয়াইয়া।
কতক্ষণে শচীমাতা উঠিয়া বসিলা তথা পুন পড়ে নিমাই বলিয়া॥
সেকালে নগর নারি মাতারে কোলেতে করি লয়া গেলা গৃহের ভিতরে।
বিষ্ণুপ্রিয়ায় দেখে গিয়া ভূমে গড়ি জায় হিয়া অঙ্গ ভিজিয়াছে অশ্রুধারে।
পৃ—২৮ ক, খ : ৫৬১৯

জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ কাহিনীর সঙ্গে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত কাহিনীর মৌল সাদৃশ্য আছে। তবে দ্বিজ-মোহনদাসের বর্ণনায় কোনো কোনো স্থলে অভিনবত্ব লক্ষনীয়। ভক্তমালার বর্ণিত কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—

ষোল যুগ ধরে এই মন্দির বালুকা গর্ভে ছিল। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ এই চতুর্দিকে চারজন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করলেন মন্দির অন্বেষণে। রাজা খরচ দিলেন পঞ্চাশ মোহর। রাজপুরোহিত গমন করলেন পূর্বদিকে। ব্রজধাম থেকে পুরীতে পৌছুতে সময় লাগল প্রায় এক মাস। সেখান থেকে কয়েকদিন পরে এলেন গৌড়-দেশে। গৌড়দেশ থেকে নীল পর্বতের সংবাদ সংগ্রহ করে দক্ষিণ দেশ অভিমুখে রওনা হলেন তিনি। জাজপুরে এসে দেখলেন দুর্ভেদ্য জঙ্গল। বনে প্রবেশ করে 'নীচ বংশ' জাতিদের দেখা পেলেন। তারা ব্রাহ্মণকে তাদের পরিচয় দিল—"হেন কহে শবর জাতি বনে থাকি আমি।। শবর কহেন পর্বতে আছেন ঈশ্বর। শবর জাতি মোরা সব কৃষ্ণের চাকর।। কৃষ্ণের মন্দির নীল পর্ব্বত উপরে। তথা গিয়া নিতি আমি দেখি শ্রীকৃষ্ণেরে ।।" অতঃপর শবরের নির্বন্ধাতিশয্যে রাজপুরোহিত শবর কন্যা বিবাহ করলেন। ফেরার পথে বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ পথের দুধারে সর্ষে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে এলেন। সংবাদ পেয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে নীলপর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মন্দির বিলুপ্ত হয়েছে। হতাশ হয়ে রাজা অনশন আরম্ভ করলেন। রাজার দুশ্চর তপস্যায় সহস্র বৎসর অতিবাহিত হ'লো। "সে কালে মন্দির গেলা বালুর ভিতর।" রাজা একাদিক্রমে তিনবার মন্দির তৈরি করলেন। "হেন তিন মন্দির গেলা বালুর ভিতরে।" অবশেষে আকাশ বাণী হলো—কলিযুগে না রহিবে মন্দির তাম্বার। মন্দির বালুতে গেছে আর কতবার।। প্রস্তরেতে শ্রীমন্দির রাজা কর তুমি। এবার নিশ্চয় তথা আসিব হে আমি।" নির্দেশমতো রাজা প্রস্তরমন্দির স্থাপন করলেন ; রাজার মানস সফল হ'লো।

স্কন্দপুরাণের পুরুষোত্তম খণ্ডে জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণ সম্পর্কিত একটি বিস্তৃত কাহিনী আছে। সম্ভবতঃ এই পৌরাণিক উপাখ্যান ষোড়শ শতাব্দীর কবিদের হাতে পল্লবিত হয়েছিল নানাভাবে। তবে দ্বিজ-মোহন দাসের কাহিনীতে শবর জাতির প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক। জগন্নাথদেব মূলতঃ শবর জাতির পূজিত দেবতা। এখনও পুরীর মন্দিরে পূজাকৃত্যের বিভিন্ন পর্বে শবর জাতির প্রাধান্য অব্যাহত আছে। হাড়ির ঝাঁটা, কাঁজী পোড়া ভোগ এই জাতীয় পূজা-বিধি।

শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা সম্পর্কে দ্বিজ-মোহনের বর্ণনা জয়ানন্দের বর্ণনার অনুসারী। জয়ানন্দ ইঙ্গিত দিয়েছেন নীলাচলে টোটার গোপীনাথের

মন্দিরে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান ঘটে। জয়ানন্দের বর্ণনা—চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥

দ্বিজমোহনদাসের বর্ণনা—

জদি প্রভুর অন্তর্ধান টোটা গোপীনাথে। পণ্ডিতের গমন সত্য তবে নদীয়াতে॥
একদিন মহাপ্রভু বিচারিলা মনে। নিলাচলে না রহিব জাব বৃন্দাবনে॥
প্রবাসে জেমন সব গৃহী লোক জায়। তেন মুই দ্বারাপুরে নিলাচল নদ্যায়॥
সেই মত প্রবাস মোর নীলাচল নদীয়া। গোপীরে না দেখি মোর বিদরিছে হিয়া॥
বিচারি গেলা প্রভু টোটা গোপীনাথে। তথাতে জাইয়া প্রবেশিলা মন্দিরেতে॥
জে কালে প্রভু মন্দির প্রবেশ হইলা। পণ্ডাগণ দেখে প্রভু মন্দিরেতে গেলা॥
মন্দির বাহিরে পণ্ডাগণ বিচারয়। এতক্ষণ মন্দিরেতে প্রভু কি করয়॥
এক পণ্ডা ভিতরেতে গেলা দেখিবারে। পণ্ডা কহে প্রভু নাই মন্দির ভিতরে॥
কেহ কহে বাহির হৈতে দেখি নাই। কেহ বলে কোথা গেল চৈতন্য গোসাই॥
মন্দির ভিতরে পুন সব পাণ্ডা গেলা। প্রভু নাই গোপীনাথ আছেন একলা॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণ অনুমানে জানিলা। কহে মহাপ্রভু লীলা সমাপ্ত করিলা।

পৃ—১৮৫ ক, খ

বাসু ঘোষের একটি পদে ও টোটার গোপীনাথের মন্দিরে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ইঙ্গিত আছে। পদটির প্রাসঙ্গিক অংশ—কি করিব কোথা যাব বচন না সরে। হারাইনু গোরাচাঁদ গোপীনাথের ঘরে॥

৮। নিত্যানন্দ-লীলা, জগাই-মাধাই উদ্ধার।

৯। রায়-রামানন্দ, রূপগোস্বামী, প্রকাশানন্দ, গৌরীদাস-পণ্ডিত, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাহিনী।

১০। শ্রীনিবাস-আচার্য, নরোত্তম দাসের কাহিনী, শ্রীনিবাস কর্তৃক বৃন্দাবন থেকে পুথি আনয়ন, বন-বিষ্ণুপুরে পুথি লুণ্ঠন, বীরহাম্বিরের দীক্ষা গ্রহণ কাহিনী

১১। শ্যামানন্দ বা দুখি-কৃষ্ণদাসের আদ্যকথা, রসিকানন্দের উপাখ্যান।

বন্দনাংশ ও ভণিতা[১] থেকে মনে হয়, কবি ছিলেন জাহ্নবা দেবীর

১ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। জয় জয় শ্রীজাহ্নবা জয় ভক্তগণ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ -পৃ-১খ, ৭৬ ৯
ভণয়ে মোহনদাস জাহ্নবার পদ আশ না ছাড়িব শ্রীরাজা চরণ।
এই কৃপা কর মোরে সদা জেন সেবি তোমে তুয়া পদে লইলাম স্মরণ॥ -পৃ-২৬১ক, ৭৬১১

শিষ্য। সেইজন্য ইনি জাহ্নবা দেবীর কাহিনীও লিপিবদ্ধ করেছেন সবিস্তারে। কবির ধারণা জাহ্নবা দেবী পূর্বজন্মে সখী-অনঙ্গমঞ্জরী রূপে লীলা করেন। সূর্যদাসের কন্যারূপে অবতীর্ণা হন নবদ্বীপ লীলায়। অপ্রকটের পর তিনি পুনরায় নিত্যবৃন্দাবনে অনঙ্গমঞ্জরী রূপে নিত্যলীলায় অভিষিক্তা হন। যেখানে—নরহরি দাসী বেশে ভূষণ পরিয়া। জাহ্নবার কাছে বৈসেন মাথে ঘুঙটা দিয়া। ....রঘুনন্দন কহে আমি শ্রীরাধার দাসী। .... ঘুঙটা দিয়া দাসী হয়্যা বৈসে রামচন্দ্র॥ পৃ—১৭৪ক ; ৫৬১৯
বীরচন্দ্রের বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পুথি খণ্ডিত হওয়ায় এর পরের অংশ পাওয়া যায় নি।

এবার কবি-পরিচয়। ইনি বাংলা সাহিত্যে উল্লিখিত মোহন দাস অপেক্ষা স্বতন্ত্র ব্যক্তি। মোহন দাস জাতিতে বৈদ্য[১] এবং শ্রীনিবাস-আচার্যের শিষ্য।[২] কিন্তু আলোচ্য কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ; পূর্ণ-নাম দ্বিজ-মোহন দাস এবং নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পর তৎপত্নী জাহ্নবা দেবী বৈষ্ণবসমাজে গুরুরূপে খ্যাতি লাভ করেন সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে। সুতরাং দ্বিজ মোহন দাসের জন্মকালের নিম্নতম সীমা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হওয়া সম্ভবপর। পক্ষান্তরে, গ্রন্থে শ্রীনিবাস, নরোত্তম শ্যামানন্দের কাহিনী যদি পরবর্তী প্রক্ষেপ না হয় তাহলে কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জীবিত ছিলেন।

গ্রন্থের একাধিক স্থলে নাভাদাস ও প্রিয়াদাসের উল্লেখ আছে। নাভাজী ভক্তমাল রচনা করেন আঃ ১৬২৩ খৃঃ। প্রিয়াদাস তার টীকা রচনা করেন ১৭১২ খৃঃ। কিন্তু সেজন্য কবিকে অর্বাচীন মনে করার হেতু নেই। কারণ ভক্তমালার মালার ফুল মূল গ্রন্থ রচনার অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত গ্রথিত হয়েছে ভক্ত কবিদের দ্বারা অথবা কেবলমাত্র ভক্তমালা গ্রন্থ রচনার সূত্র ধরে দ্বিজ-মোহন, নাভাজী ও প্রিয়াদাসকে একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে নির্বিচারে। সুতরাং দ্বিজ-মোহনের 'ভক্তমালা' গ্রন্থে নাভাজী ও প্রিয়াদাসের প্রসঙ্গ অবশ্যই পরবর্তিকালের সংযোজন। দ্বিজ-মোহনের জীবৎকাল ১৫৫০ খৃঃ থেকে ১৬২০ খৃঃ-র মধ্যে হওয়াই সম্ভবপর।

১ শ্রীমোহনদাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে। নৈষ্ঠিক ভজন যাঁর অতি নিরমলে॥ —কর্ণানন্দ
২ বা. সা. ই-পৃ-৪৪২

॥ যদুনন্দন দাস ॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত কবি 'যদুনন্দন দাস' সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা ও অনুবাদকরূপে পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। এঁর 'সংগ্রহ তোষণী, গ্রন্থখানি বিদগ্ধ সমাজে অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত। এ সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতের অনুসরণে তিনি সিদ্ধান্ত করেন—'সংগ্রহতোষণী' নামক একটি বৈষ্ণব সহজসাধন ঘটিত গ্রন্থের রচয়িতা যদুনাথ (বা যদুনন্দন) নিজেকে হেমলতার শিষ্য বলেছেন (দ্রঃ বীরভূম বিবরণ–৩ পৃ—৩৮-৩৯)। ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, জন্মস্থান পালিগ্রাম, নিবাস কাটোয়ার নিকটবর্তী বেগুনকোলা গ্রামে। পুথি একে অর্বাচীন; তার নিরুদ্দেশ। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলা চলে না।[১]

আচার্য সেন মহাশয়ের এই মন্তব্যের পর 'সংগ্রহতোষণী'র পুথিটি শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতীকে বিক্রয় করেন। বর্তমানে পুথিটি বিশ্বভারতী বাংলা পুথি সংগ্রহের অন্যতম সম্পদরূপে সযত্নে রক্ষিত আছে। পুথির পরিচয় এইরকম—অধিগ্রহণ সংখ্যা-৫৬৬৩[২]। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা—১-১৩৬। ,৩৬,৩৮.৮৫ সংখ্যক পত্র নাই; ৬৭ সংখ্যক পত্রের ২টি প্রতিলিপি। ১ম এবং ১৩৬-তম পত্র কীটদষ্ট। আকার ১০ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি; আধার হস্তনির্মিত তুলট; লিপি আঃ ১৭৫ বছরের পুরাণো। সংগ্রহতোষণীর পুথি অর্বাচীন নয়।

গ্রন্থে একস্থানে বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও রায়শেখর এই পঞ্চরসিকের পূর্বজন্মের কাহিনী বিবৃত হয়েছে; কিন্তু একমাত্র এই কারণে গ্রন্থটিকে বৈষ্ণব-সহজসাধন ঘটিত গ্রন্থ বলা চলে না।

শ্রীনিবাস আচার্যের আজ্ঞায় শ্রীজীব গোস্বামীর অমৃততোষণী গ্রন্থের অনুসরণে গ্রন্থখানি রচিত– শ্রীজীব মূল দৃষ্টে শ্রীনিবাস আজ্ঞা সম্মত হেমলতা প্রসাদেন যদুনাথ বর্ন্নং। অথঃ অমৃততোষণী দৃষ্টং সংগ্রহ [তোষণী] যদুনাথ দাস বিরচিতং যথা। শ্রীজীব গোস্বামীন্ তর্ত্ত গুরু। পৃ—৭৮ক

১ বা. সা. ই - পৃ - ৪৩১

২ পরিবর্তিত সংখ্যা-১৯১০। পুথি পরিচয় ৪র্থ খণ্ডে মুদ্রিত করার জন্য এই পরিবর্তন করা হয়।

গ্রন্থারম্ভে শ্রীচৈতন্যবন্দনা বিষয়ক একটি শ্লোক আছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ·········সর্ব্বলোকৈব তারণ' ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ দ্বয় যুক্তকং ॥ ২ ॥ নিত্যস্থানে যথাসঙ্গি····· সর্ব্বসার স্বরূপকং······শ্রীনবদ্বীপে প্রকাশিতং ॥ ৩ ॥ সর্ব্বউচ্চো সর্ব্ববরা সর্ব্বদেবো····· গৌরাঙ্গ সাঙ্গকৃতি বিগ্রহং ॥ ৪ ॥ —পৃ—১খ

বন্দনাংশ,

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
জয় জয় চৈতন্যগণ পতিতপাবন। জগত তারিতে বল ধরে জনে জন ॥
অনন্ত প্রভুর ভক্ত কে করে গনন। ············ ·····যৈছে দীপ্ত নক্ষত্রশোভন ॥
············ ······ ····· ············ ············
জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর। জয় জয় নরোত্তম করুণা প্রচুর ॥
জয় জয় রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়। নর···········বিলসয় ॥ পৃ—১খ

কবির আত্মপরিচয়—

শ্রীহেমলতার শিষ্য আমি বিপ্রকুলে জন্ম। কণ্টক নগরে বাস কহিলাম মর্ম্ম ॥
গইল গ্রামে জন্ম হয় যদুনাথ নাম। ভক্তির অযোগ্য হই সদা অভিমান ॥
শিবুপ্রসাদ পিতা মোর মাতা ব্রহ্মমহি। আচার্য প্রভুর পরিবার যদুনাথ কহি ॥
সতির্থ জেষ্ঠ হন রঘুনাথ দাস। তার আজ্ঞাসারে লিখি সংগ্রহ বিলাস ॥ পৃ—২ক

কবি অন্যত্র বলেছেন,

শ্রীহেমলতার শিষ্য হই পালিগ্রামে বাস। সংসার বাসনায় থাকি হৈয়া মায়ার দাস ॥
কেশে ধরি হেমলতা উকাসে (?) তুলিল। আচার্য প্রভুর পদে শিক্ষায় সমর্পিল ॥
············ ············
তৎপিহ পুণ পুণ লিখিএ প্রকাশ। হেমলতা মোর ইষ্ট বেগুনকোলায় বাস ॥
ব্রজের রমণী হন লীলা অধিকারী। লীলামৃত জানান মোরে বহু কৃপা করি ॥
—পৃ—৫২ ক, খ

গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনায় কবি স্বপ্নাদেশের মোহ ত্যাগ করে বাস্তব পন্থা অনুসরণ করেছেন—

ঠাকুরের ঠাকুর মোর শ্রীনিবাস আচার্য। তেহো কৈল বৃন্দাবনে গোপালভট্টে পূর্যা ॥
কৃপা করি শ্রীজীব গোসাঁই বহু গ্রন্থ দিল। তার মধ্যে সংগ্রহ গ্রন্থ সত্তরে ধরিল ॥
সন্দেহ ছেদন ইথে সূত্রবিত্ত মানি। শ্লোকময় সংস্কার বুঝিতে না জানি ॥
হেন গ্রন্থ আচার্য্য প্রভু আমাকে সমর্পণ। নয় পত্র গ্রন্থ ইথে ষড়দর্শন ॥

প্রভু মোর পড়াইলা নিভৃতে বসিয়া। পয়ার করহ যত্ন উপাসনা দিঞা ॥
হেন আজ্ঞায় হেমলতার চরণ প্রত্যাশ। সংগ্রহ পয়ার লেখেন যদুনাথ দাস ॥
—পৃ—২২ ক

অতঃপর চৈতন্যলীলার বর্ণনা। মধ্যযুগের সিদ্ধরীতিতে নানান অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করে কবি শ্রীচৈতন্যের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলা বর্ণনা করেছেন। চৈতন্য অবতার সম্পর্কে যদুনন্দনের ব্যাখ্যা—পূর্ব্ব বৃন্দাবনে সূত্র নবদ্বীপে বৃত্তি। সূত্র বিনা বৃত্তি নাই গৌরলীলা কীর্তি। (পৃ-৫৩খ) ফলতঃ কবি চৈতন্যলীলার অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার যোগসূত্র আবিষ্কার করেছেন। শ্রীচৈতন্যের সপারিষদ কীর্তন বিহারের সঙ্গে কবি রাসলীলার সংযোগ স্থাপন করেছেন স্বাভাবিকভাবেই।

গ্রন্থে নিত্যানন্দের কাহিনী এইরকম -

রাঢ়দেশ মধ্যে হয় পরগণে মৌড়েশ্বর। একচাকা খলোকপুর গ্রাম সর্ব্বপর ॥
দ্বিজের নন্দন হই ছয় সহোদর। পিতা হয় হাড় ওঝা পণ্ডিত সুসর ॥
পদ্মাবতী মাতা মোর পতিব্রতা সতি। স্বগর্ভে জন্ম মোর কহিল প্রতিতি ॥
সুন্দরামল্ল বন্দীঘাটী পদবি নির্ণয়। পূর্ব্বাপর পরিচয় সুন মহাশয় ॥ পৃ-১৩২ক

নিত্যানন্দের বিবাহ সম্পর্কে যদুনন্দন একটি অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

গঙ্গা সন্নিধান উদ্ধারণপুরের উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় নিত্যানন্দপ্রভু 'বিবাহ লাগিয়া চলেন দক্ষিণ প্রবন্ধ।' একদা তাঁরা আতিথ্য গ্রহণ করলেন 'গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সূর্যদাসের গৃহে।' সূর্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবি। রূপমুগ্ধ নিত্যানন্দ-প্রভু বসুধাকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করছিলেন। এমন সময় বসুধা মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন যথারীতি শোক-বিলাপ করতে লাগলো। তাঁরা নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে নিবেদন করলেন—তোমা হেন অতিথি আজি মোর ঘরে। ইহাতে এতেক দুঃখ ঘটিল অন্তরে।' একথা শুনে পথ-সঙ্গী উদ্ধারণ দত্ত প্রস্তাব করলেন—জীয়াইলে প্রভুরে বিভাহ যদি দাও। তবে সে বাঁচিতে পারে সত্য কথা কও।" সূর্যদাস সম্মত হলে নিত্যানন্দ-প্রভু 'দ্বাদশ ঔষধির মূল' প্রয়োগ করে করে মৃতকন্যার প্রাণসঞ্চার করলেন। এবার নিত্যানন্দ-প্রভুর বংশপরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে সোরগোল উঠল। নিত্যানন্দপ্রভু তাঁর যথাযোগ্য কৈফিয়ৎ দিয়ে বললেন—নিত্যানন্দ বলে মুখ্য

শিষ্য বার জন। বার জেতে ঘর মোর করএ রন্ধন॥ মালি তিলি সুড়ি সোনার যবন চণ্ডাল। গোপ তাঁতি চক্রকায় বহুত মিশাল চিটা পিটা লোহার বৈদ্য এসকল লৈয়া। জার তার খাই ভাত পূর্বসূত্র লৈয়া॥ জে জন গৌরাঙ্গ গত করে সংকীর্তন। অন্নজলে কিবা আছে মোর প্রাণ ধন।। অবশেষে বসুধার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ হলো আর জাহ্নবা দেবীকে সমর্পণ করা হলো যৌতুকরূপে। —পৃ-১০২-৪

প্রেমবিলাস, অদ্বৈতপ্রকাশ প্রভৃতি গন্থে এই কাহিনী নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে এবং মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যে এই সব কাহিনী এখনও বহুল প্রচলিত।

সংগ্রহতোষণী গ্রন্থে 'চতুর্দ্দশপাটের বর্ণনা' অংশটি সবিশেষ মূল্যবান। এই অংশে শ্রীনিবাস আচার্যের চৌদ্দজন মুখ্য শিষ্যের শ্রীপাট বর্ণিত হয়েছে যথা—

শ্রীবাস আচার্য—সোনামুখি গ্রাম
কুমেদরাম চট্টরাজ বেগুনকোলা
গোবিন্দ চক্রবর্তী—বোরাকুলি
শ্রীদাস গোকুলানন্দ ঠাকুর—কাঞ্চন গড়িয়া
শ্রীরাম চক্রবর্তী—ফরিদপুর

বড়শাখার রামচন্দ্র অনুজ গোবিন্দ —বুধর
রামচন্দ্র কবিরাজ—ক্ষেতুর
কবিরাজ কর্ণপুর—কাটাগড়া
কবিরাজ নৃসিংহ—শ্রীদাস ঠাকুর —কাঞ্চনগড়্যা
শ্রীগোকুল কবিরাজ—গোয়াস
কবিরাজ ভগবান—বিরভোম— পৃ—৮৭ খ

গ্রন্থোক্ত শাখাবর্ণন অংশটি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীনিবাস ও তৎপত্নী হেমলতা ঠাকুরাণীর অনেক অজ্ঞাত-পূর্ব শিষ্যের নাম এই অংশ থেকে পাওয়া যায়; তার মধ্যে কবিরাজ গোপীরমন, শ্রীবনমালি-কবিনৃপ, শ্রীনিমাই-কবি ভূমিপো, শ্রীশ্যামদাস কবিরাজ-মহামতি অন্যতম। বিশেষণগুলি থেকে অনুমান হয়, এঁরা প্রত্যেকেই সেযুগে প্রখ্যাত কবি ছিলেন; যদিচ এদের কবিকৃতির কোনো নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

এছাড়া শ্রীনিবাস আচার্যের দীক্ষা কাহিনী, মধ্বাচার্য সংপ্রদা প্রণালী, রামানুজ, নিমানুজ (বা নিম্বার্ক), বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি সম্পদায়ের গুরুপ্রণালীর বিস্তৃত বর্ণনায় গ্রন্থখানি তথ্যবহুল; সে যুগের এক মূল্যবান সম্পদ-বিশেষ।

যদুনন্দন বলেছেন—

মোর প্রভু হন আচার্য আপুনি। নিজগুণে সুনান মুনি কৃতার্থ আমি ॥
দিন হিন দেখি দয়া করিল আমারে। সন্দেহ ছেদন করি সুধিলে অন্তরে ॥
—পৃ-৮০ খ

অন্যত্র বলেছেন,

আচার্য দিক্ষিত গুরু লীলাতর্ত্ত দিল। নিত্যতত্ত্ব জানাইতে শিষ্যে আজ্ঞা দিল। পৃ-১১৯ ক

এইসব বর্ণনা থেকে মনে হয়, কবি শ্রীনিবাস আচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য। শ্রীনিবাস আচার্যের পত্নী হেমলতা দেবীর নিকট সম্ভবতঃ পরে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে কবির বিবৃতি—

হেমলতা মোর ইষ্ট বেগুনকোলায় বাস। —পৃ-৫২ ক, খ

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধি যদুনন্দনের কালসীমা।

॥ যশশ্চন্দ্র ॥

যশশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলাস সুবৃহৎ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। গ্রন্থখানির দু'টি মাত্র প্রতিলিপি এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। একটি পুথি এশিয়াটিক সোসাইটির গ ৫৬৭৮ সংখ্যক; অন্যটি বিশ্বভারতী সংগ্রহের। বিশ্বভারতী পুথির পরিচয়—

অধিগ্রহণ সংখ্যা—১৯০৯। পত্রসংখ্যা—১—৪৯৮। লিপিকাল পূর্ব্বসকাব্দা ১৬২৯ সাল ॥ গ্রন্থ দেখিয়া লিখা হইল ইহাতে দুই-এক অক্ষর দৃষ্ট হয় না। জথা দিষ্ট তথা লিখিত। সাক্ষর মিদং শ্রীনকরচন্দ্র দাস......................ইতি শকাব্দা ১৭৫৩ ॥ সন ১২৩৮ বার সত আটত্রিশ সাল। তারিখ ২৫ ভাদ্র শুক্রবার। —পুষ্পিকাপত্র

কাব্যখানির অধ্যায় বিভাগে অভিনবত্ব আছে। যথা—আদ্যখণ্ড, রাধাখণ্ড, বাল্যখণ্ড (যমলার্জুনভঞ্জন) ধূলিখেলা, বাৎস্যচারণ, বৎসাসুর বধ, বকাসুর বধ, ধেনুকবধ, কালীদমন, পৌগণ্ড খণ্ড নন্দ-যশোদার সঙ্গে সাক্ষাৎ, দাবানল ভক্ষণ, প্রলম্ববধ, ভাণ্ডীর বনে গোচারণ, বস্ত্রহরণ, যদুপতির স্থানে অর্থ-ভিক্ষা, যদুপতির স্তব, গোধর্ধনধারণ, গোবর্ধন পূজা চৌত্রিশ অধ্যায়—অনুরাগ খণ্ড, শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ, সূর্যখণ্ড, পূর্ণিমাখণ্ড, নৌকাখণ্ড, উত্থানখণ্ড, কিশোরখণ্ড এবং মথুরাখণ্ডে সমাপ্তি।

বন্দনাংশে কবি রূপ গোস্বামীর প্রত্যক্ষ অনুসরণে চৈতন্যবন্দনা করেছেন—

নিজ নাম নিজ গুণ গাঞা রাত্রিদিনে। [১] বিভোল হইয়া প্রভু করেন রোদন ॥
নিজ গুণ সংকীর্ত্তন গোপত আছিল। প্রিথিবিতে গৌরচন্দ্র প্রকাশ করিল ॥

শ্রীচৈতন্যদেব প্রসঙ্গে ভাবের আন্তরিকতা প্রকাশিত হয়েছে এই বর্ণনায়—

সেই সংকীর্ত্তন ভাবে গোরাচান্দ নাচে। কান্দিঞা সকল জীবে প্রেমধন যাচে ॥

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের বন্দনা বেশ বিস্তারিত

সনাতন প্রভু বন্দো অতি দয়াময়। বৃন্দাবন মাঝে জার সদত আশ্রয় ॥
চৈতন্যের কৃপাপাত্র সেই সনাতন। তাহার চরণ পদ্ম করিব বন্দন ॥
তাহার অনুজ বন্দো শ্রীরূপ গোসাঞি। পরকাল প্রেমরস হৈল জার ঠাঞি ॥
চৈতন্যের আজ্ঞা মধু করিয়া ভক্ষণ। মত্ত হঞা বেক্ত কৈল প্রেমের লক্ষণ
উর্ধ্ববাদী ভক্ত সব থাকি বৃন্দাবনে। । জেই প্রেমভক্তি আশা কৈল অনুক্ষণে।
কেহো বা পাইল তাহা কেহো না পাইল। সেই প্রেম ভক্তি রূপ সর্ব্বজীবে দিল ॥
বন্দিব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। ব্রজবাসি ভক্ত বন্দো জোড় করি হাথ।
শ্রীজীব গোসাঞি বন্দো করিয়া ভকতি। জার নামে ঘুচিবেক অশেষ দুর্গতি ॥
শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভু বন্দো ভক্তি ভাবে। জাহার আসিসে হয় প্রেম ভক্তি লাভে ॥

কৃষ্ণদাস-কবিরাজকে বন্দনা করার জন্য অনেকে যশশ্চন্দ্রের কাব্যের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্থাপন করার পক্ষপাতী।[২] কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন দীর্ঘজীবী এবং জীবৎকালেই তিনি বিশিষ্ট ভক্ত এবং দার্শনিক পণ্ডিতরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সুতরাং যশশ্চন্দ্রের কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ—এই সন্ধিযুগে রচিত হওয়া সম্ভব।

কবির ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবি এক জায়গায় বলেছেন—

জন্মদাতা পিতা বন্দো অপর জননি। বন্দিব পরম ভক্তি গুরুর কামিনি ॥
শ্রীহরিদাস নাম জন্ম বৈদ্যকূলে। কৃষ্ণের ভক্তত সব দাস বলি বলে ॥

অন্যত্র বলেছেন, 'শ্রীহরিদাসের ত্রাস নাশ কর হরি। অপার সংসার সিন্ধু জাই জেন তরি ॥' সম্ভবতঃ হরিদাস কবিপিতার নাম।

১ তু. হাসে নিজ কীর্তন শুনিঞা। -চৈ. ভা. আ-পৃ-১৫
২ বা. সা. ই—পৃ ৪৩২

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব অনুসারে গ্রন্থে পরকীয়া প্রেমের প্রাধান্ত দান করা হয়েছে—স্বকীয়া হইতে সুখ পরকীয়া বাড়া। নহিবে সুন্দরি কভু মোর প্রেম ছাড়া। কৃষ্ণচরিত্র চিত্রণে মধুর রস অপেক্ষা বীররসের প্রাধান্য লাভ করেছে। বৎসাসুর বধ, অঘাসুর বধ, ধেনুকাসুর বধ, প্রলম্ব বধ, কালিয়দমন প্রভৃতি অধ্যায়ে কৃষ্ণের বীরত্ব প্রস্ফুট হয়েছে; তবে কাব্যটি সর্বত্র লৌকিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারে নি। সমকালের সামাজিক রীতি নীতির বর্ণনায় গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ।

॥ অকিঞ্চন দাস ॥

রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকটি অকিঞ্চনদাস বাংলা কাব্যে রূপান্তরিত করেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। কাব্যের বন্দনাংশে ছয়-গোস্বামী প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,

একত্রে করিনু এই ছয়ের বন্দন। আমার প্রভুর প্রভু হয় একজন।
পূর্ব্বে তিন মধ্যে তাঁর করিনু বন্দন। পুনরপি বন্দো তাঁর যুগল চরণ॥

ভক্তিরসাত্মিকা, ভক্তিরসালিকা ও ভক্তিরসচন্দ্রিকা নামক ক্ষুদ্র তত্ত্ব নিবন্ধগুলি এই অকিঞ্চন দাসের রচনা বলে ডঃ সেন মহাশয় অনুমান করেন।[১]

অধ্যাপক ৺মনীন্দ্রমোহন বসু তাঁর গ্রন্থে অকিঞ্চন দাসের ভক্তিরসাত্মিকা গ্রন্থখানি সহজিয়া সাহিত্যের নাম-তালিকা ভুক্ত করেছেন।[২]

বিশ্বভারতী সংগ্রহে অকিঞ্চন দাস ভণিতায় 'চৈতন্যবাচক গ্রন্থ' নামে একটি রচনার একাধিক প্রতিলিপি রয়েছে।[৩] গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সাধনতত্ত্বের আলোচনা। গ্রন্থখানি 'চৈতন্য নিত্যানন্দ সংবাদ' নামেও পরিচিত ছিল। বন্দনাংশে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর সম্পর্কে আন্তরিকতা খুব স্পষ্ট।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়। পতিত পাবন জয় জয় মহাসয়॥
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা সাগর। কৃপা কর নিতাই চান্দ রসের নাগর।

১ বা সা. ই—পৃ-৪০০

২ P. C. S. C.—P-293

৩ অধিগ্রহণ সংখ্যা—৩৪৪৮, ৪১৩১

কলিযুগে অবতির্ন্ন হইল দুই ভাই। চৈতন্য ঠাকুর মোর দআর নিতাই।
ভক্তগণ সঙ্গে করি প্রেম পরচার। জারে তারে কৈল দআ না কৈলা বিচার।।

পৃ—১খ ; ৩৪৪৮

ভণিতাংশ থেকে অনুমান হয় কবি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত ছিলেন—

এই মত বাচক রূপে নিতাই আবেশে। দয়ার ঠাকুর মোর কহে অকিঞ্চন দাস।।

... ...

ইহা জেই পড়ে সুনে ব্রজে হয় বাস। এই মত বাচক কহে অকিঞ্চন দাস।।
ইতি শ্রীচৈতন্য বাচক গিম্ভ সমাপ্ত।। সন ১২২২ সাল।

বন্দনাংশে অথবা গ্রন্থের অন্য কোথাও শ্রীনিবাস আচার্যের নাম নেই ; সুতরাং ইনি শ্রীনিবাস-শিষ্য অকিঞ্চন দাস অপেক্ষা স্বতন্ত্র ব্যক্তি ; একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

॥ মানসিংহ ॥

আঃ সপ্তদশ শতাব্দে বৃন্দাবন দাস সংকলিত 'রসনির্যাস' নামক পদসংকলন গ্রন্থে মানসিংহ দাস ভণিতায় একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি এইরূপ—

॥ দুতি নায়কং প্রিত্যাহ ॥

ওহে শ্যাম রাই কথা শুন মন দিয়া।
কি করিতে কি না করে গুমরী গুমরী মরে
কি দেখায় কপালে হাথ[১] দিয়া।। ধ্রু ।।
অতি সুকুমার তনু সিরিস কুসম জনু
ভাল মন্দ কিছুই না জানে।
রাজকুমারী[২] ঘরে রহিতে নাহিক পারে
তোমারে সে দেখিয়া সপনে।।
বসন না রাখে গায় কাতর নয়নে চায়
সোনার তনু ধুলায়ে পড়িয়া।
তোমার কঠিন মন[৩] তিরি বধ না গন[৩]
[৪]কুলবতি কুল দিলা চালাইয়া।[৪]

মুদ্রিত পাঠ—১ হাত ২ রাজার কুমারী
৩ তার বধ নাহি গন ৪ কুলবতি দিলা চালাইয়া

শুনিয়া সখির বাণি হরিশে রসিক মণি
কহে ঝাট মিলাহ জতনে।
মানসিংহ দাস ভনে হয়্যা উলসিত মনে
[1]ধনি কাছে পুন য়াগমনে।।[1] —পৃ—৬খ : ১৭৬১

কবি যে ষোড়শ শতকের শেষদিকে পদরচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন এ রকম অনুমান অসঙ্গত নয়।

তবে কবি যে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিশ্বভারতী সংগ্রহের একখানি পুথিতে 'সঙ্কর'-ভণিতাযুক্ত একটি পদের ভণিতাংশ থেকে জানা যায় কবির পুরো নাম শ্রীমানসিংহ রায় এবং ইনি তৎকালে ভক্ত-রসিক পদকর্তা রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পদটির ভণিতা,

সঙ্কর কহে এহ মরমক বেদন কোই না বুঝত আন।
শ্রীমানসিংহ রায় বিচক্ষণ সো ভালে ইহ রস জান।। বিশ্বভারতী পুথি—৪৩৯৭

।। পরিশিষ্ট ।।

।। গোবিন্দ-কর্মকার ।।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ পর্যন্ত বিবরণ সম্বলিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক একখানি গ্রন্থ ১৮৯৫ খৃঃ প্রথম প্রকাশ করেন অদ্বৈত-বংশীয় শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী। ১৯২৬ খৃঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বনওয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয়ের যুগ্ম সম্পাদনায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ঘনিয়ে ওঠে।[২] এ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত—যুক্তি তর্কের উপরে বিশ্বাসকে স্থান না দিলে গোবিন্দদাসের কড়চাকে খাঁটি বলা অসম্ভব।[৩]

১ ধনি কহে পুন আগমনে।

২ বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ গো. প. ত (মৃণালকান্তি ঘোষের সংস্করণ) ভূ. পৃ.-১২৯-৫১। এ বিষয়ে ইনি 'গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীঅমৃতলাল শীল 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করেন কড়চা-রচয়িতা গোবিন্দ-কর্মকার অত্যন্ত আধুনিক ব্যক্তি। Gobinda Das's Kadcha : A Black Forgery B. V. Dasgupta forwarded by Sri Jadunath Sarkar গ্রন্থখানিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৩ বা. সা. ই—১ম খণ্ড পূর্বার্ধ (৫ম সং) পৃ-৬৮৭

গোবিন্দ-কর্মকার নামধেয় চৈতন্যদেবের একজন স্বতন্ত্র পার্ষদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে গোবিন্দানন্দ প্রমুখ গোবিন্দ নামধেয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে গোবিন্দ কর্মকারকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করার প্রবণতা সাম্প্রতিক কালের গবেষকদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু সকলেই জানেন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের বৈরাগ্যখণ্ডে এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়—

হেনকালে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসি। সন্ন্যাস রহস্য যত গৌরাঙ্গ প্রকাশি।
শুনিয়া আনন্দময় হৈল গৌরচন্দ্র। গঙ্গা পার হৈয়া আগে রৈলা নিত্যানন্দ ।।
মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্মকার। মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপার।।
পৃ—৮৩

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-ও জানিয়েছেন মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণকালে তিনজন ভক্ত সব কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। এই সূত্রের অনুসরণে উপরোক্ত অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে - নিত্যানন্দ মুকুন্দ দত্ত ও গোবিন্দ কিংবা কেবল গোবিন্দই কর্মকর্তা ছিলেন; কিংবা কর্মকার হিসাবে গোবিন্দই হয়ত বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছিলেন। আবার সাধারণভাবে 'কর্ম করে যে' এই অর্থে কর্মকার শব্দের প্রয়োগ-যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন অনেকে। কিন্তু এইসব ভাষার হেঁয়ালীতে গোবিন্দদাস কর্মকার নামক এক ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব লোপাট করা যায় না। লৌহশিল্পী কামার জাতির সাধারণ পদবী কর্মকার। কামার কুলে জন্ম গোবিন্দের পুরো নাম গোবিন্দ কর্মকার। এই সহজ বিষয়টিকে কষ্টকল্পনা দিয়ে এত জটিল করা কেন ?

গোবিন্দ কর্মকার গ্রন্থারম্ভে আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

বর্দ্ধমানে কাঞ্চন নগরে মোর ধাম। শ্যামদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম॥
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার। মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥
আমার নারীর নাম শশীমুখী হয়। একদিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়॥

মধ্যযুগে লিখিত পুথির ভাষার সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরা কখনই এ ভাষা অকৃত্রিম বলে স্বীকার করবেন না। সে যাই হোক, সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেছি বর্তমান বর্ধমান শহরের অদূর-পশ্চিমে কাঞ্চন নগরে গোবিন্দদাসের শ্রীপাট অবস্থিত। একসময় কাঞ্চননগরে লৌহ অস্ত্র নির্মাণের স্থানীয় কেন্দ্র ছিল। একটি লুপ্তপ্রায় জঙ্গলাকীর্ণ ঢিবি গোবিন্দদাস-কর্মকারের ভিটা বলে স্থানীয় অধিবাসীরা নির্দেশ করেন। এখনও প্রতি বছর এখানে গোবিন্দ কর্মকারের জন্মোৎসব পালিত হয়। এঁর পূর্বপুরুষগণ বর্ধমান

জেলার বনপাসে বসবাস করতেন বলে জানা যায়। গোবিন্দ কর্মকারের ভিটায় সাম্প্রতিক কালে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে; স্তম্ভগাত্রে এঁর পরিচয়জ্ঞাপক ছত্রগুলি উৎকীর্ণ আছে। বস্তুতপক্ষে ভিটা সংলগ্ন মন্দির, কূপ, মূর্তি কোন কিছুতেই প্রাচীনত্বের তেমন কোনো নির্দশন নেই। কিন্তু তাহলেও গোবিন্দ কর্মকারের অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না। কাঞ্চননগরে গোবিন্দদাসের ভিটা কাকতালীয় নয়; অবশ্যই কোনো প্রাচীন ঐতিহ্য স্মৃতি এবং বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এদেশে লৌহশিল্পী কর্মকার জাতির ঐতিহ্যও অর্বাচীন কালের নয়। এই শৈল্পিক গোষ্ঠী (Guild) সেকালে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করতো। কালক্রমে বনপাস, ঢেকরী ভালকি এই তিনটি গ্রামের নামে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত হয়। মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত কামিল্যাও কর্মকারজাতির অন্যতম গাঞী নাম।

উপরোক্ত তথ্যাদি অনুযায়ী আমাদের সিদ্ধান্ত, গোবিন্দদাসের কড়চা গ্রন্থটি জালিয়াতি যদি হয়ও; গোবিন্দ কর্মকার নামক ব্যক্তিটি জাল নন।

॥ দ্বিজ মাধব (মাধবাচার্য) ॥

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজমাধবের ব্যক্তি-পরিচয়, বাসস্থান, কাব্যরচনা কাল এবং সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সমস্যা তেমন জটিল মনে হয় না। আদৌ যদি কোন সমস্যা থাকে তা অনেকটাই কল্পিত বা পরিকল্পিত। মাধব বা মাধবাচার্য নামে মধ্যযুগে একাধিক খ্যাতি-মান ব্যক্তি থাকায় মূলতঃ এই সমস্যার সূচনা। তাই বলে অকারণে সন্দেহবশে কষ্টকল্পনার সহায়তায় অযথা জটিলতা সৃষ্টি না করে খোলা মনে জট ছাড়ানোই উচিত। এসব ক্ষেত্রে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ভিত্তিক জ্যামিতিক পদ্ধতির অনুসরণ করে কয়েকটি সূত্রকে প্রাথমিকভাবে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। ইউক্লিডের নিয়মে ওই axiom বা স্বতঃসিদ্ধ গুলি প্রমাণ করা যায় না কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের স্বতঃসিদ্ধ গুলি সাহিত্যিক তথ্যের সূত্রে প্রমাণিত।

(১) ভগীরথ আচার্যের পুত্র মাধব আচার্যের (মহাপ্রভুর পড়ুয়া) সঙ্গে জাহ্নবা (জাহ্নবী) দেবীর কন্যা গঙ্গাদেবীর বিবাহ হয়। এঁর সাহিত্য-সৃষ্টির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(২) চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মাধবাচার্য।

(৩) প্রেমবিলাসের মতে, একজন মাধব আচার্য ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা কালিদাসের পুত্র। মাধবের গুরু ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। ইনি

কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা নন। যেহেতু কাব্যের অভ্যন্তরীণ প্রমাণে বা অন্য কোনো সূত্রে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। সুতরাং এ মত অপ্রামাণ্য।[১] মতান্তরে মাধবাচার্য পুরুষোত্তম গমন করে চৈতন্যের কৃপা লাভ করেন এবং সেখানেই তাঁর একখানি বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করার অভিলাষ হয়। এই মাধবাচার্যই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা। এঁর বংশীয় গোস্বামীগণ অদ্যাপি ময়মনসিংহ জেলায় বাস করেন।[২]

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার। মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার॥

—কবির পিতৃ-পরিচয়-জ্ঞাপক এই পয়ারটি অনেকের মতে সংস্কারকর্তার প্রক্ষেপ। কারণ কোনো বাঙ্গালীর পরাশর নাম প্রাচীন সাহিত্যে নাকি পাওয়া যায় না।[৩] কারো মতে পরাশর গোত্রনাম হতে পারে, ব্যক্তিনামও হতে পারে।[৪] কিন্তু এইভাবে সন্দেহের জাল বিস্তার করে কবি প্রদত্ত পিতৃপরিচয় অস্বীকার করার প্রয়োজন কি? জয়দেব তো স্পষ্টতই 'পরাশর' নামটি ব্যক্তিনাম হিসাবে উল্লেখ করেছেন—'পরাশরাদি বন্ধুকণ্ঠে'। পদ-কল্পতরু ৫ম খণ্ডে 'পরাশরাত্মজ মাধবের' পরিচয় পাওয়া যায়। মাধবাচার্যের সারদাচরিতে পিতৃপরিচয় দেওয়া হয়েছে –

ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল। সেই মহানদী তটবাসী পরাশর॥
তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য। ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য।
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত॥ পৃ—১৮৭

এই বিবরণ প্রামাণিক হলে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা এবং সারদাচরিত রচয়িতা দ্বিজমাধব অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর।

১ বা. সা. ই - ২০৯
২ বঙ্গভাষার লেখক-পৃ-১৪৪
৩ বা. সা. ই-পৃ-২১২
৪ কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব-পৃ-৭৪
পরাশর নাম ব্যক্তিনামই, গোত্র নাম নয়। বিশ্বভারতী সংগ্রহের বৈষ্ণববন্দনার পুথিতে কবিবল্লভ খ্যাতিসম্পন্ন একজন পরাশরের উল্লেখ পাওয়া যায়—
পরাশর নামেতে আছিলা দ্বিজবর। নানা ধনে পরিপূর্ণ তাহার কলেবর॥
কবিবল্লভ কবিখ্যাতি তাহার। তাহার দুই চরণে হইলু নমস্কার॥ -৩খ, ৪৮৩৩
তবে ইনি যে মাধবের পিতা পুথিতে সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশ নেই।

চৈতন্য চরণ ধূলি শিরে বিভূষণ করি দ্বিজমাধব রস ভানে, চৈতন্যচরণ ধন শিরে করি আভরণ দ্বিজমাধব রস গানে—এই সব ভণিতা দেখে অনেকে মনে করেন কবি চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই ধারণা আমার দৃঢ় হয়েছে বিশ্বভারতী সংগ্রহের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের (অধিগ্রহণ সংখ্যা—৩৪০৫ ; লিপিকাল—১১৮৬ সাল ২৪শে ফাল্গুন) একটি পুথির ভণিতা দেখে। ভাগবত-কৃষ্ণকথা অমৃতের সার। দ্বিজমাধব কহে চৈতন্যসখা জার। —পৃ ৩৭খ

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যের প্রতি পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিশ্বভারতী সংগ্রহের (অধিগ্রহণ সংখ্যা—৯৫০) 'পদমেরু' নামক সুবৃহৎ পদসংকলন গ্রন্থের পুষ্পিকায় উল্লেখ রয়েছে—'ইতি গৌরাঙ্গ হে কৃপাঙ্কর মাধব দিনবরে।' মনে হয় গ্রন্থ সংকলয়িতার নাম মাধব ; ইনি গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং ইনি যে কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধব তা অনুমান করা যায় গ্রন্থের প্রারম্ভে কৃষ্ণমঙ্গলের একাংশের বর্ণনা থেকে।[১] উক্ত অংশের ভণিতা, চিন্তিয়া চৈতন্যচান্দের চরণকমল। দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

এছাড়া, কৃষ্ণমঙ্গলের কোনো কোনো পুথিতে ভণিতা পাওয়া যায় —কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার। দ্বিজমাধব কহে কিঙ্কর তাহার। 'কলি-যুগে চৈতন্য প্রকাশে। কহে দ্বিজমাধব তার দাসের দাসে॥ —১১খ ; বি ভা পু—২২৯৬। এই সব উল্লেখ মাধবের চৈতন্য নৈকট্যই প্রমাণ করে।

দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল (সারদাচরিত) কাব্যের রচনাকালজ্ঞাপক পয়ার—'ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত' অবলম্বনে কালনির্ণয় সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে।[২] কবিপ্রদত্ত আত্মপরিচয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের আত্মপরিচয়ের সাদৃশ্য থেকে অনুমান হয় দুই মাধব অভিন্ন ব্যক্তি। পক্ষান্তরে, 'নবদ্বীপবাসী মাধব আচার্য ষোড়শ শতাব্দে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই আত্মপরিচয়ের অংশ মাধবের কাব্যে ঢুকিয়া পড়া বিচিত্র নয়।'[৩] এই রকম অভিমত প্রচলিত।

১ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—পদমেরু গ্রন্থ (বিশ্বভারতী)
২ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য বা. সা. ই. পৃ-৫২২-২৩
৩ তদেব—পৃ-৫২৫

চণ্ডীকাব্যে আত্মপরিচয় বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি পঞ্চগৌড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছেন—পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। মহানদী তটবাসী বর্ণনার উপর নির্ভর করে সপ্তগ্রাম বা নবদ্বীপে কবির বাসস্থান অন্বেষণ বৃথা। প্রচলিত ধারণা অনুসারে, কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক; পরে চাটি গাঁ অঞ্চলে চলে যান। তাঁর কাব্যের অধিকাংশ পুথি পাওয়া গেছে ওই অঞ্চল থেকে। এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যের সহায়তা গ্রহণ করা যায়। দ্বিজমাধব তাঁর শিষ্য কৃষ্ণদাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার। এথাতে গাহিতে গ্রন্থ রহিল্ আমার॥ এই বর্ণনার উপর নির্ভর করে আমি অনুমান করি কবি উত্তরবঙ্গের মহানদী তীরবর্তী অঞ্চলের লোক ছিলেন। শিষ্য কৃষ্ণদাসকে তাঁর কাব্য দক্ষিণবঙ্গে প্রচার করার আজ্ঞা দিয়েছিলেন। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন দ্বিজমাধবের পুথি উত্তর ও পূর্ববঙ্গে পাওয়া যায়।[১]

গঙ্গামঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজমাধব শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের কবির সহিত অভিন্ন তা অনুমিত হয় উভয় কবির ভণিতাগত সাদৃশ্য থেকে।[২]

বৈষ্ণব বন্দনার রচয়িতা মাধব কে? সে সম্পর্কে কোনো সর্ববাদী-সম্মত মত নেই। তবে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের বন্দনাংশে কবি স্বতন্ত্রভাবে বৈষ্ণব বন্দনা রচনার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—পুনশ্চ বন্দিব সর্ব্ব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। এক ঠাঁই বন্দি আমি সবার চরণ॥

কবির নাম নিয়ে কোনো সমস্যাই নেই। প্রকৃত নাম মাধব। সেকালের রেওয়াজ অনুসারে জাতি-বাচক 'দ্বিজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আচার্য শব্দটি 'জাতিবাচক' অথবা পাণ্ডিত্যের সূচক।

মাধব, মাধবদাস ভণিতায় বিভিন্ন পদ সংকলন গ্রন্থে অনেক পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬ জন মাধবের পরিচয় পাওয়া গেছে তারমধ্যে অন্ততঃ ৩ জনের পদ রচনা করার সম্ভাবনা ছিল।[৩] কিন্তু কোন্ পদ কোন্ মাধবের রচনা তা স্থির করা অসাধ্য।[৪] তবে দ্বিজমাধব ভণিতাযুক্ত ৬টি

১ মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম পৃ—১৭৬

২ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—গঙ্গামঙ্গল—ভূ. পৃ.-২-৫ (আব্দুল করিম সম্পাদিত)

৩ গৌ. প. ত। ভূ. পৃ-২২১-২৪

৪ প.ক.ত—৫ পৃ-১৮৬

অপরিজ্ঞাত পদ বিশ্বভারতী সংগ্রহ থেকে উদ্ধার করেছি; সেগুলি আলোচ্য মাধবের রচনা সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত। বংশীশিক্ষা বিষয়ক ১টি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো; অন্য ৫টি পদের প্রথম ছত্র 'অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহে' ভুক্ত হলো।

নিজ নামে নাগর পূরায় বাঁশী আধা।
নাহি ডাকে শ্যাম নাম ডাকে রাধা রাধা॥
ফিরাইয়া নিজ নাম বাজাইতে চায়।
শ্যামের বাঁশী শ্যামের মুখে রাধা নাম গায়॥
রাই কহে এক রন্ধ্রে দোহে···········ফুক।
না জানে কেমন বাজে দেখিব কৌতুক॥
এক রন্ধ্রেতে ফুক দেয় রাধা কানু।
রাধা শ্যাম দুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু॥
রসের হিল্লোল ওঠে দোহাকার গানে।
মহিনি সভারে নব নিকুঞ্জ কাননে॥
এক রন্ধ্রে দোহে দেয় মুখ।
হিয়ার উল্লাসে দেয় ফুঁক॥
ধনি ফুকে শ্যাম ফুকে বলে রাধা রাধা।
ও মোর গুণের প্রিয়া সাধা॥
ধনি ফুঁকে শ্যাম নাম গায়। বিনোদ লম্পট রস রায়॥
তা দেখিয়া জত সখিগণ। ঘন করে ফুল বরিষণ॥
আনন্দে দোঁহার কাছে কাছে। ময়ূর ময়ূরীগণ নাচে॥
সুখময় বৃন্দাবন স্থান। এ দ্বিজ মাধব রস গান॥ বি ভা পু—১৭৩১

॥ চণ্ডীদাস ॥

চণ্ডীদাস সমস্যায় অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি না করে চণ্ডীদাস সম্পর্কে চিরাচরিত গ্রন্থি মোচনের উদ্দেশ্যেই এখানে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে; তা না হলে আমার আলোচ্য যুগে (ষোড়শ শতক) যে কোনো চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন তার কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীনিকেতন সন্নিহিত বিনুরিয়া গ্রাম থেকে ধর্মদাস বণিকের লেখা 'নিরঞ্জন পুরাণ' নামে ধর্মমঙ্গলের একটি সম্পূর্ণ পুথি সংগ্রহ করেন। পুথির লিপি সমাপ্তির তারিখ ১৬২৬

শক (১৭০৩-৪ খ্রীঃ) এটাই কাব্য রচনাকালের নিম্নতম সীমা। পুথিটি বিশ্বভারতী সংগ্রহে সংরক্ষিত। শ্রীমতী সুমিত্রা কুণ্ডুর উদ্যোগে পুথিটি সম্পাদিত হয়েছে। ওই পুথির কাহিনীতে একজন চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে।

ধর্মঠাকুরের মায়ায় সোম ঘোষ নিঃস্ব হয়ে গৌড়েশ্বরের কারাগারে বন্দী হলেন। একদিন গৌড়েশ্বর সোম ঘোষের দুর্গতি দেখে সমস্ত ঘটনা অবগত হলেন এবং সোম ঘোষকে মুক্তি দিয়ে ত্রিহট্টের অধিকারী করে দিলেন। সপরিবারে সোমঘোষ ত্রিহট্টে উপস্থিত হলেন। সেখানে সভা করিঞা বৈসে রাজা যথাযোগ্যস্থলে। নগর সমস্ত লোক হাস্যে কুতুহলে ॥ মুক্ষ দক্ষ লোক সব আইলা তরাতর। মিশ্রি চণ্ডীদাস আইলা সভার ভিতর ॥ (৯ক) তিনি রাজাকে আশীর্বাদ করে উপবেশন করলেন। সোমঘোষ তাকে দেশের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে চণ্ডীদাস মিশ্র জানালেন—এ গড়ে সর্ব্বকাল দেবী অধিষ্ঠান। শ্যামারূপা নাম দেবীর তাম্রের প্রতিমা। দিব্যমূর্তি দশভূজা রূপে অনুপমা ॥ অসুরমর্দ্দিনী দসভূজা চণ্ডীদেবী। নগরের সমস্ত লোক......তাহারে সেবি ॥ (৯খ)

জয়দেবের স্মৃতি বিজড়িত কেন্দুবিল্ল গ্রামে অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে ইছাই ঘোষের দেউল এবং গড়জঙ্গলের দেবী শ্যামারূপার অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। কিন্তু এই মিশ্রি চণ্ডীদাস কে? ইনি কিংবদন্তির চণ্ডীদাস ছাড়া আর কে হতে পারেন।

কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন এক সময় অনুমান করেছিলেন এই চণ্ডীদাস মিশ্র বড়ু-চণ্ডীদাস। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এই রকম—ইছাই ঘোষের পিতা সোমঘোষ ছিলেন শ্যামারূপার উপাসক। সেনভূম পরগণার মধ্যে ইছাই ঘোষের দেউল এবং শ্যামরূপার স্থান এখনও প্রসিদ্ধ। শ্যামরূপার পুরোহিতের নাম চণ্ডীদাস রাখিয়া শ্রীশ্যাম পণ্ডিত (কবি) বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন কি না কে জানে।[১]

পরবর্তীকালে কাজোরা অঞ্চলে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদাবলীর পুথি আবিষ্কারের পর এই অনুমান জোরালো হয়। কারণ কাজোরা অঞ্চলের সঙ্গে ঢেকরীর স্থাননৈকট্য আছে। এমন হওয়াও কিছু বিচিত্র নয় যে বড়ু চণ্ডীদাসের নিবাস ছিল কাজোরা সন্নিহিত কোনো গ্রামে; পরে তিনি ঢেকরীতে গিয়ে শ্যামারূপা দেবীর পূজারী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১ বাং. সা. ই—পৃ ৫১৩

পরবর্তীকালে স্থানীয় কবি ধর্মদাস বণিক তাঁর কাব্যকথায় এই স্মৃতি ধরে রেখেছিলেন।

কাজোরা অঞ্চলে প্রাপ্ত পুথিতে বড়ু চণ্ডীদাসের পদটির আরম্ভ— 'তাহারে তেমতি করি বালা।' পদটির প্রথমদিকের কিছু অংশ খণ্ডিত। এই পদটি মনীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের দীনচণ্ডীদাসের পদাবলীর ১ম খণ্ডের পরিশিষ্টে এবং পদকল্পতরুতে (পদসংখ্যা—১৯৩৩) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে।

বিশ্বভারতীর অপর একটি পুথিতে (অধিগ্রহণ সংখ্যা—১৯৪) বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় পদ আছে ৩টি। পদগুলি আদ্যন্ত উদ্ধৃত হ'লো—

আগুনি জালিয়া মরিব পুড়িয়া কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া মো মেনে মরিব লউ বা না লউক সমন॥
সই আনল সাজহ চিতা।
সে মতি নিঞা কেস মার্যাইয়া সিন্দুর দেহ যে মাথা॥
তনু তেয়াগিয়া সিদ্ধি জে হৈব সাধিব মনের ব্রত।
মরিলে সে পতি আসিবে সংহতি আমারে সেবিবে কত॥
তখনি জানিবে বিরহ বেদনা পরের লাগিয়া জত।
তাপিত নহিলে তাপ কি জানএ তাপিতের সুখ কত॥
বিরহ বেদনে না জানে আপনে দরদের দরদী নয়।
পর দরদীর দরদ জানিলে সেই সে দরদী হয়॥
আপনি মরে কি করয়ে পরে কভু দরদ না জানে।
কাহার কারণে কে সহে মরণ বড়ু চণ্ডীদাসে ভণে॥ —৪৩খ
কেনে বা পিরিতি কৈলুঁ কালা কানু সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুনে॥
কত ঘর বাহির করিব দিবারাতি।
বিসম হইল মোর কানুর পিরিতি॥
না রুচে ভোজন পান তেজিলাম সয়নে।
বিষে মিসাইল জেন এ··················॥
·········গুরুত্রুজন ননদিনী লাগি।
দুই আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে কানু লাগি॥
আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ জাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিব এথাই॥ —৪৫খ

কেনে বা কানুর সনে পিরিতি করিলুঁ ।
না ঘুচে দারুণ নেহ ঝুরি ঝুরি মলুঁ ।।
ঘরে জ্বালা সহিতে না ষত উঠে তাপ ।
বচন বিসাল্য জেন বুকে খালো সাপ ।।
জন্ম হৈতে কুল গেল ধর্ম বৈল দূরে ।
দিবানিসি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে ।।
নিসেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার ।
জানিলুঁ পিরিতি হয় সতন্ত্র আচার ।।
করমের দোষ এ জনমে কি বা করে ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলির বরে ।। —৪৫খ[১]

[১] শেষোক্ত পদটি হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে (পৃ-৬৫-৬৬) মুদ্রিত।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণব-প্রভাবজাত পরিবর্তন ও পরবর্তী কালে তার পরিণতি

পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব (খৃঃ ১৪৮৬ ১৫৩৪) বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়ে বাঙ্গালী জাতি অখণ্ড রূপ গ্রহণ করল। বাঙ্গালীর জনজীবনে এল নব জাগরণ। অধ্যাত্মচর্চায় আর সাহিত্যের অনুশীলনে এই জাগরণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় সঙ্গীতে অর্থাৎ কীর্তন গানের বিকাশে। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেষ পরিপূর্ণ হলো। তারপর আড়াইশ তিনশ বছর ধরে বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণবতার ছাপ অক্ষুণ্ণ রইল। ষোড়শ-শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিরা প্রায় সকলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এবং যাঁরা তাঁদের মধ্যে প্রধান তাঁরা প্রায় সকলেই শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিকর অথবা পরিকরের শিষ্য-অনুশিষ্য ছিলেন।

তখনকার দিনে সাহিত্যের অবস্থা অর্থাৎ সাধারণ লোকের সাহিত্যিক রুচি কেমন ছিল সে বিষয়ে চৈতন্যভাগবতে[১] এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে[২] যা বলা হয়েছে তা বিশেষ মূল্যবান্। রামায়ণ-কাহিনী, মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরির পাঁচালী এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-কাহিনী নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে গীত হ'তো। সেকালে রামলীলা কি ভাবে অভিনীত হ'তো তার কিছু আভাস পাওয়া যায় চৈতন্য-ভাগবতে।[৩] কালিয়দমন গীত এবং দুর্গা

---

১ ... ... নিমাইপণ্ডিত। করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডির গীত॥ ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডির গীত করে জাগরণে॥ কুম্ভ করি বিষহরি পূজয়ে কোন জনে।... ... ... বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥

... ...

যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব। তাহারা হো না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব - আ-২

২ ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে। মোজা পাএ নাড়ি হাথে কামান ধরিবে॥ মসনবি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর। ইত্যাদি - পৃ-১৩১

৩পূর্ব্বে দশরথভাবে এক নটবর। রাম বনবাসী শুনি এড়েন কলেবর॥ ইত্যাদি আ-৩

ও লক্ষ্মীর গীত প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্যে আনন্দের যোগান দিত। বৃন্দাবন দাস আরও বলেছেন যে, তখনকার দিনে লোকে পাল-রাজগণের কীর্তিগাথা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করত।[১] এতদিন বাঙ্গালীর সাহিত্য ছিল ব্রতকথা উপকথা নিয়ে, বড় জোর রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা অবলম্বন করে। শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর চরিত্র বাঙ্গালীর মনপ্রাণ অভিভূত করে দিত। ছেলে ভুলানো-ছড়া ও উপকথার মোহ ত্যাগ করে বাঙ্গালী কবির লেখনী সমসাময়িক মহাপুরুষের পবিত্র জীবনকাহিনী নিয়ে মেতে উঠল। কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় ঘটনা।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর জীবনে এক অপূর্ব প্রেরণার অভ্যুদয় হয়। তার প্রতিচ্ছায়া সমকালীন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে নিতান্ত একটি প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য সাহিত্যকে সর্বজনীন সাহিত্যের পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালী ঘরের কোণ পরিত্যাগ করে সমগ্র ভারত বর্ষের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হ'ল। পূর্বে বাঙ্গালী যে-সকল প্রদেশ থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি লাভ করেছিল, এখন বাঙ্গালী সেই-সকল প্রদেশবাসীকে তার নিজের অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির অংশীদার করে সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। বাঙ্গালীর ইতিহাসে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘটনা আর কিছু ঘটে নাই।

শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর পারিষদ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, সনাতন, রূপ-প্রমুখের চরিত্র ও চেষ্টায় এবং পরবর্তিকালে শ্রীনিবাস আচার্য নরোত্তম দাস শ্যামানন্দ প্রমুখ মহাত্মাগণের ভাবোন্মাদনায় বাঙ্গালীর জীবন বৈষ্ণব ভাবাবেগে রঞ্জিত হ'ল। ফলতঃ বাঙ্গালা সাহিত্য একেবারে বৈষ্ণব বা ভক্তি সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করল। এমন কি যে সকল কাব্য বিশেষতঃ 'বৈষ্ণব'-বিষয়ক নয় সে গুলিতেও বৈষ্ণবীয় ভক্ত মনোবৃত্তি ও কল্পনার ছাপ সুস্পষ্ট দেখা দিল।[২]

শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালা দেশে যে ভক্তিধর্মের প্রবর্তন করলেন তা অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা অগ্রগামী হলেও এটি একটি বিবিক্ত ও আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়। ভারতবর্ষের অন্যত্রও এই নবজাগরণের আভাস সূচিত হয়েছিল। গুজরাট, কামরূপ ইত্যাদি প্রান্তীয় অঞ্চলে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে যে ভক্তি ধর্মের উদ্দীপনা তথা সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা দেখা দিল তাতে শ্রীচৈতন্যের গৌণ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বল্লভাচার্যের উপর শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ

১ যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত। ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোকে আনন্দিত॥ - পৃ-৩-৪

২ বা-সা-ই – পৃ- ১৫৭

প্রভাব এবং তাঁর শিষ্য সুরদাস প্রমুখ ব্রজভাষার কবিদের উপর বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় মহান্তগণের প্রভাব মানতেই হয়।[১]

হিন্দু-অহিন্দু, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তি-ধর্ম প্রচার করেন। একে ইংরেজি মতে Religion বা ধর্ম-মাত্র বললে সম্পূর্ণ হয় না; নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বলাই সঙ্গত। জনসাধারণের জন্য শ্রীচৈতন্যদেব যে-শিক্ষা দান করেছিলেন তা সার্বজনীন চিরন্তন আদর্শের অনুগত। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি উদ্দীপনের জন্য নাম-সংকীর্তন —এই মৌল আদর্শের উপর শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। জাতি-বর্ণ-নির্বিচারে সকল মানুষই যে সমান আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হতে পারে, একথা তিনি স্বীকার করতেন। তখনকার দিনের হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা দূর করে সমাজে সার্বিক ঐক্যের মাধ্যমে অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়ে ওঠার পক্ষে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ ও প্রভাব অসামান্য সহায়তা করেছিল। অভূতপূর্ব প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙ্গালী-প্রতিভা কি ধর্মে কি দার্শনিক চিন্তায় কি সাহিত্যে কি সঙ্গীতকলায় সর্বত্র বিচিত্র রূপে স্ফূর্ত হতে লাগল। বাঙ্গালী জাতির এই প্রথম জাগরণ।

অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র ছিল অনুশাসন-মূলক। এই রকম ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা যে আদর্শ নির্দেশ করা হয়ে থাকে তা প্রধানতঃ সুপ্রাচীন কালের কিংবদন্তি অথবা উপাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুপ্রাচীন সত্যযুগ থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা দুর্গতির স্রোত বেয়ে চলেছি এবং শাস্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করলেই আমরা আবার উজানে ফিরে যাব --এই বিশ্বাস শুধু প্রাচীন হিন্দুধর্মের নয় সকল ধর্মেরই বিশেষত্ব। শ্রীচৈতন্য যে প্রেম ধর্মের প্রবর্তন করলেন তাতে বর্তমান-কাল এবং জীবিত মানব প্রথম সুমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সত্যযুগের কল্পিত-মরীচিকার প্রত্যাশায় মানুষ বর্তমানকে আর উপেক্ষা করতে পারল না। তত্ত্বদর্শী-বৈষ্ণব বললেন— বর্তমান কালই তো কাল, যা করবার তা এখনই করতে হবে; অতএব 'প্রণমহো কলিযুগ সর্ব যুগ সার।[২] সৃষ্টির পর্যায়ে প্রাণের বৃহত্তম প্রকাশ ঘটেছে মানুষের, দেবতা তো মানুষের আদর্শেই গড়া। সুতরাং "কৃষ্ণের যতেক খেলা 'সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু

১ বা-সা-ই - পৃ- ১৭৮;

২ বা-সা-ই - পৃ- ৩২৫

তাঁহার স্বরূপ।"[১] এই রকম আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সুদূর অতীত থেকে ফিরিয়ে বর্তমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করে শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় আধুনিকতার প্রবর্তন করলেন।[২]

বাঙ্গালা সাহিত্যের যা চিরন্তন ধারা গীতিকাব্যে বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা বিশেষরূপে অনুশীলিত হতে লাগল। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব গীতিকাব্যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্যকলার চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পেলো। এই গীতি কাব্য কেবল বাঙ্গালা ভাষাতেই রচিত হয় নাই, কিছু কিছু জয়দেবের অনুকরণে সংস্কৃতে লিখিত হয়েছিল। কিন্তু বেশীর ভাগই লেখা হ'তো এক নবসৃষ্ট মিশ্রভাষা ব্রজবুলিতে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। মৈথিল ভাষায় লিখিত বিদ্যাপতি-রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকবিতা বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। শ্রীচৈতন্য-ও বিদ্যাপতির গান শুনে পরম প্রীতি লাভ করতেন।[৩] বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির কবিতার ঝংকারে ও অলংকারে আকৃষ্ট হয়ে ওই ভাষায় কবিতা রচনা করতে লাগলেন। মৈথিল ভাষা তাঁদের মাতৃভাষা নয় সুতরাং তাঁদের রচনার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব কিছু না কিছু থেকে গেল। মৈথিল এবং বাঙ্গালা মিশ্রিত কৃত্রিম ভাষা ষোড়শ-সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গীতি কবিতার অন্যতর মুখ্য বাহন হয়ে উঠল।[৪] উনবিংশ শতাব্দীর শেষ[৫] এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও কোন কোন বাঙ্গালী কবি ব্রজবুলিতে কবিতা রচনা করেছেন।[৬] রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র[৭] ভাষা ব্রজবুলি।

বাঙ্গালায় এবং ব্রজবুলিতে কেবল রাধাকৃষ্ণ-লীলা কাহিনী অবলম্বন করেই পদ রচনা হ'ল না শ্রীচৈতন্যের জীবন কাহিনী এবং তাঁর প্রধান প্রধান

১ চৈ. চ ২/২১
২ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা - পৃ- ৩১
৩ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে গায় শুনে পরম আনন্দ॥ - চৈ চ ২/২
৪ হি-ব্র-লি - পৃ- ৪১৪
৫ হি-ব্র-লি - পৃ- ১৮
৬ হি ব্র-লি - পৃ- ১৮
৭ বিশ্বভারতী প্রকাশিত

পারিষদগণের মাহাত্ম্য বিষয়েও প্রচুর গীতি-কবিতা রচিত হতে লাগল। দেবতার বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে বিশেষতঃ জীবিত মানুষ নিয়ে কাব্য-রচনা করা শুধুমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এক নবযুগের অবতারণা করল। বাঙ্গালা সাহিত্য এতদিন ছড়া, গান, ব্রতকথা ও দেবতার পাঁচালী বড জোর রামায়ণ ও মহাভারত কাহিনী নিয়েই ব্যাপৃত ছিল; এ ছিল প্রায় লোক-সাহিত্যের গোত্রভুক্ত; এখন এই সাহিত্য ধ্রুপদী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হ'ল। যে কোন যুগের পক্ষে এ এক অসামান্য ঘটনা।

প্রাগাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য সর্বাঙ্গীণ ও বিশিষ্ট রূপ লাভ করে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে। ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র কেবল জাতিকে না তার ধর্মবিশ্বাসকে নয়, তার সামগ্রিক মনোভাব ও সাহিত্যকেও যে গড়ে তোলে, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে। শ্রীচৈতন্য যখন আবির্ভূত হন তার কিছু পূর্বে থেকেই হিন্দু-সমাজ ও বাঙ্গালী জাতি তিন শ বছরের আলোড়ন বিক্ষোভ থেকে স্থিতি লাভ করে সংহত মূর্তি ধারণের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এই নব-গঠিত জাতি নিজস্ব স্বরূপ চিনতে পারল; বাঙ্গালার সাহিত্যেরও মোড় ফিরল; বাঙ্গালা সাহিত্যে গীতি-কাব্যের স্রোত প্রবলতর হ'ল। আরও নতুনত্ব এই যে, অলৌকিক দেব কাহিনীর পাশাপাশি লৌকিক দেবকল্প মানব-চরিত্র-ও সাহিত্যের বিষয় হ'ল। উপরন্তু, পূর্বাপর প্রচলিত পৌরাণিক-কাহিনী গুলিরও রঙ বদলে গেল। বাঙ্গালী ছিল অপদেবতার পূজারী; উপদেবতার উপাসক; এখন হ'ল দেবতার লীলা সহচর ও দেবকল্প মহাপুরুষের ভক্ত। বাঙ্গালা সাহিত্য উপকথার পর্যায় থেকে কাব্যের স্তরে উন্নীত হ'ল।

শ্রীচৈতন্যের "তৃণাদপি সুনীচ" "তরোরিব সহিষ্ণু" ভক্তি-ধর্মের প্রভাব সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল, এবং সেইজন্য জনসাধারণ তৎকালীন রাজনৈতিক দুর্গতি কতকটা ঈশ্বরের বিধান বলেই মেনে নিয়েছিল। মুকুন্দরাম তাই লিখেছেন, "প্রজার পাপের ফলে ডিহিদার মামুদ সরিফ।"[১] সাহিত্যেও তাই বৈষ্ণবতার জয়জয়াকার; শাক্তকাব্য চণ্ডীমঙ্গলেও বৈষ্ণবোচিত ভক্তি-উচ্ছ্বাসের সুর একটানা। এই ভক্তির রঙ পরিবর্তিকালে ফিকে হয়ে গেছে কিন্তু কখনও

১ ক. ক. চ - পৃ- '

মুছে যায় নাই। অষ্টাদশ-শতাব্দীতে তথাকথিত শাক্ত-পদাবলী বৈষ্ণব পদাবলীরই রকমফের মাত্র।[১] বৈষ্ণব-পদাবলীর রস-গাম্ভীর্য শাক্ত পদাবলীতে অর্থাৎ মাতৃরূপ-ভগবদ-ভক্তি-উচ্ছ্বসিত গীতাবলীতে তরলিত হয়ে গেছে।

কোচবিহার এবং মল্লভূমির রাজারা প্রথমে বৈষ্ণব ছিলেন না। কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাব এঁরা এড়িয়ে চলতে পারেন নাই। কোচবিহার রাজসভা উৎপীড়িত শঙ্করদেবকে আশ্রয় দিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বৈষ্ণব ধর্মের দীপটি সযত্নে প্রজ্বলিত রেখেছিলেন। বিষ্ণুপুর রাজসভা শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে বৈষ্ণবতার প্লাবন এনেছিল। মল্লরাজারাও বাঙ্গালা সাহিত্যের পোষকতা করেছিলেন সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে।

সঙ্গীতকলায় বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ দান রস-কীর্তন পদ্ধতি যোড়শ শতকের শেষে প্রবর্তিত হয়। এই কৃতিত্ব নরোত্তম দত্ত এবং তাঁর সহযোগী মার্দঙ্গিক দেবীদাসের হলেও শ্রীচৈতন্যদেবের হাতেই তার প্রথম সূত্রপাত। খেতরী গ্রাম যে পরগনায় অবস্থিত তার নাম অনুসারেই বোধ হয় নরোত্তম-প্রবর্তিত পদ্ধতি 'গড়ানহাটী' নামে প্রসিদ্ধ। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বিপ্রদাস 'রানীহাটী' বা 'রেনেটি' পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। রানীহাটী পরগনা মধ্যরাঢ়ে; অধুনাতন বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে। তারপর এল 'মনোহরশাহী' পদ্ধতি। মনোহর শাহী পরগনা উত্তররাঢ়ে। ঝাড়খণ্ডে এবং মানভূমে অর্থাৎ দক্ষিণে-পশ্চিম রাঢ়ে যে কীর্তন-রীতি উদ্ভূত হয়েছিল তার নাম 'ঝাড়খণ্ডী' বা 'মান্দারনী।' মল্লভূম সরকার মান্দারণের অন্তর্গত ছিল।

পাঠান-আমলের গোড়ার দিক থেকেই বাঙ্গালা দেশে মুসলমান পীর ও সুফী সাধকদের গমনাগমন ছিল। হোসেন-শাহের আমলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তি ধর্মের প্রাবল্যে সুফী-পীর ও সাধকদের সঙ্গে বাঙ্গালী বৈষ্ণব বাউলদের যোগাযোগ ঘনিষ্টতর হয়। এই সূত্রে সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের পাঠান প্রধান অঞ্চলে বিশেষত বর্ধমান হুগলী বাঁকুড়া মেদিনীপুরের সীমান্ত ভূমিতে সুফী পীর ও মুসলমান যোদ্ধার স্মৃতির উপর ভিত্তি করে সত্যপীর সত্যনারায়ণ ঠাকুরের উদ্ভব হয়েছিল। সত্যপীরকে কেন্দ্র করে এক বিচিত্র

১ বা-সা-ই - পৃ- ৩০১

সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয় এবং এর প্রভাব ওড়িষ্যা উত্তর প্রদেশাদি বৃহত্তর বঙ্গে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

'রূপ' প্রমুখ বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীগণের গ্রন্থের এবং সংস্কৃতে লেখা অপর বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদ ষোড়শ-শতকের শেষদিক থেকে আরম্ভ হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীতেও সে ধারা অপ্রতিহত ছিল। পৌরাণিক শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ এই সময়ে প্রচুরভাবে হতে থাকে। এই গ্রন্থ প্রায় সবই বৈষ্ণব মতের। ভাগবতের ভাবানুবাদ পঞ্চদশ শতকেই আরম্ভ হয়।

সপ্তদশ শতকে রচিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে প্রধানতঃ রূপ-গোস্বামীর অনুকরণে ভাগবতোক্ত কাহিনীই অনুবৃত্ত হয়েছিল। দানলীলা ও নৌকাবিলাস কাহিনী একেবারে বাদ না-গেলেও তাতে আদিরসের জৌলুস ম্লান হয়ে আসছিল। সুবল মিলন, গোপী গোষ্ঠ ইত্যাদি কয়েকটি নূতন মিলন-কাহিনী পরিকল্পিত হ'ল। তথাপি রাধাকৃষ্ণ কাহিনীতে আর পূর্বতন নবীনতা ও রস রইল না। অক্ষম নকল-নবীশ কবিদের লেখনী কেবলই গতানুগতিক বিষয় পুনরাবৃত্তি করে চলেছিল। লেখকদের ভক্তিরসেও আর সে প্রাণ ছিল না। কিন্তু সাধারণ পাঠক-শ্রোতাদের কাছে এই সব লঘু রচনা ক্রমশই জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল। ফলতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের বাজার বৈষ্ণব কাব্যের সস্তা মালে ছেয়ে গিয়েছিল।[১]

ষোড়শ-শতকের শেষ দিকে রামায়ণ-পাঁচালী গীত হতে থাকে কীর্তনের ঢঙে। বলা বাহুল্য রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর প্রভাব তাতে পড়েছিল। তার ফলে ষোড়শ শতক না-হোক সপ্তদশ শতকের দিকে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালা রাম-লীলার পদ অল্প-স্বল্প রচিত হতে থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর জের অষ্টাদশ-শতাব্দীতে চলেছিল পূর্ণ মাত্রায়। পদাবলী ও কৃষ্ণলীলার কাব্যের ধারায় কিছুমাত্র ভাটা পড়ে নাই; তবে নূতনত্বের পরিচয়ও তেমন কিছু নাই। এ বিষয়ে শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা পদাবলী সংকলন। 'পদামৃতসমুদ্র'[২] 'পদকল্পতরু'[৩] পদমেরুর[৪]-মতো সংহিতাই বৈষ্ণব গীতিকাব্যকে পরিপূর্ণভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল।[৫] বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্ব ও

১ বা-সা-ই - পৃ- ৪২৬

২ রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত

৩ বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত; ৪ পদমেরু গ্রন্থ (বি. ভা. পৃ- ১৫০)

৫ বা. সা. ই-৬০৩

রসসাধনা সম্বন্ধে বহু ছোট-খাটো মৌলিক ও অর্ধ-মৌলিক নিবন্ধ লেখা হয়েছিল ; তন্মধ্যে আবার তান্ত্রিক সহজ-সাধন-ঘটিত রচনাগুলিও সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকখানি চৈতন্য-জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিল সেগুলিতে শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কে নূতন কথা বড় কিছু পরিবেশিত হয় নাই এবং ধারাবাহিকতা-ও সম্পূর্ণতা প্রায় নাই। অধিকাংশই ছোট-নিবন্ধ। শ্রীহট্ট অঞ্চলে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর জ্ঞাতিবর্গ সম্পর্কে কয়েকটি নিবন্ধ রচিত হয়েছিল।[২] অষ্টাদশ-শতাব্দীতেও বিস্তর পদ রচিত হয়েছিল কিন্তু সে গুলির অধিকাংশই নিতান্ত গতানুগতিক অক্ষম রচনা। তন্মধ্যে দু'চার জন পদকর্তা কিছু অভিনবত্ব দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। পদ সংগ্রহগুলি একটি ছাড়া[৩] প্রায় সবই অষ্টাদশ শতাব্দীতে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ-পনের বছরের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল। এ গুলি পূর্বতন আলংকারিক রসবিচার নিবন্ধেরই পরিণতি। কেবলমাত্র উদাহরণ গুলি বর্জিত হয়ে মূল বক্তব্যকে সূত্রমাত্রে পরিণত করেছে।

পদাবলীর প্রভাব যে কতটা ব্যাপক-রূপ লাভ করেছিল তা বোঝা যায় নিম্নে উদ্ধৃত গনিত-সমস্যা পদটিতে। পদটি আছে বিশ্বভারতী-পুঁথিতে[৪]—

সত্য করি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ। দিব্য করি গেলা দুটি শিরে দিয়া হাথ ॥
বিরহে ব্যাকুল চিত না শুনে বারণ। নিঠুর হইয়া নাস্ত্রি আলা প্রাণধন ॥
তিলে শতবার মরি লেখা দিব কত। দণ্ডকে সহস্রবার হই মূর্ছাগত ॥
রাগ রস বাণ বসু একত্র করিয়া। গরাসি তেজিব প্রাণ বাণ ঘুচাইয়া ॥
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ বলে শুন সখি। জে কহিলে তাই দিব্যানিসি বুঝ্যা দেখি ॥

বাঙ্গালা সাহিত্যে পদাবলী রচনা পূর্বাপর চলেছে। এই পদাবলীর সূত্র দিয়েই প্রাচীন ও নবীন ধারার সংযোগ হয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অখণ্ডতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে এবং তা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাগর-সঙ্গমে চরিতার্থতা লাভ করেছে।

১ বা. সা. ই- ৬৩৯
২ বা. সা. ই- ৬৪৪-৪৯
৩ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামনি'।
৪ পুঁ. প. ৪খ -পৃ-১০

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলী ও পদসংকলনের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও পূর্ববৎ যথারীতি বৈষ্ণব পদ রচনা অব্যাহত ছিল। রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের পিতা জন্মেজয় মিত্র 'সঙ্কর্ষণ' ভনিতায় অনেক পদ রচনা করেন।[১] ১৮৬০ খৃঃ তিনি 'সঙ্গীত-রসার্ণব' নামে স্বরচিত পদগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন।[২] উক্ত গ্রন্থে তাঁর পিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর রচিত কয়েকটি পদও সন্নিবিষ্ট করেন। জন্মেজয় মিত্র প্রাচীনপন্থী পদকর্তাদের মধ্যে শেষ কবি। এঁর সমসাময়িক রঘুনন্দন গোস্বামীও অনেক গুলি পদ রচনা করেছিলেন।[৩] উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ইংরাজী-শিক্ষিত কবির দ্বারা বৈষ্ণব-পদ রচনায় নূতন ধারার সূত্রপাত হয়। এই ধারার প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।[৪] ১৮৬১ খৃঃ প্রকাশিত 'ব্রজাঙ্গনা'-কাব্যে যে আঠারোটি কবিতা আছে সে গুলিকে পদাবলী বলে চিহ্নিত করতে না পারলেও তাতে যে ঐকান্তিকতা ও আবেগ আছে তা পদাবলী ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি-ঠাকুর এবং গোবিন্দদাসের অনুকরণে কিশোর রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলিতে যে কবিতাদি রচনা করেছিলেন তার অধিকাংশই 'ভানুসিংহ-ঠাকুরের-পদাবলী' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এখানেই ব্রজবুলিপদাবলীর ধারার সুমধুর পরিসমাপ্তি।[৫]

১ হি-ব্র লি -পৃ- ৩৬৮-৬৯
২ হি-ব্র লি -পৃ- ৩২৮-৩৯
৩ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪৪ - পৃ- ১০-১৬
৪ হি ব্র-লি -পৃ- ১৩
৫ বা. সা. ই -পৃ- ২১৪

॥ অপ্রকাশিত-পদসংগ্রহ ॥ সংকলন ॥

বিশ্বভারতী সংগ্রহের বিভিন্ন পুথির সূত্রে প্রাপ্ত পদনিচয় বর্তমান অধ্যায়ে সংকলিত হ'লো। অপ্রকাশিত প্রকীর্ণ এই পাঁচ-শতাধিক পদই ষোড়শ-শতকের রচনা কি না, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া তুলনামূলক আলোচনা সাপেক্ষ। বর্তমান কার্যক্ষেত্রে আমার সে অবকাশ নাই। পদগুলি এ-যাবৎ অপ্রকাশিত বিবেচনায় বর্তমান অনুচ্ছেদে এগুলিকে একত্র-সংকলন করা গেল। তুলনামূলক আলোচনার নিকষে যাচাই করে এই প্রকীর্ণ পদগুলির প্রকৃত-পদকর্তা-নিরূপণ ও কালানুক্রমিক-বিভাজন পরবর্তী বৃহত্তর গবেষণা-কর্মের অপেক্ষায় রাখা গেল।

আকর-পুঁথির পাঠ-গ্রহণে 'যদৃষ্টং তল্লিখিতং'-রীতি অনুসৃত হয়েছে ; কাজেই লিপিকর-প্রমাদ-জাত ভ্রান্ত পাঠ কিছু থেকে গেছে, গায়নদের স্বাভাবিক আখর জনিত প্রক্ষেপ-ও আছে যথেষ্ট। সম্পাদন-কালে সে-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে।

॥ শ্যামাদাস আচার্য ॥

১। একে তণু সুন্দর আরে নব কৈসর আর তাহে বৈদগধি বেস।
-বি. ভা. পুঁ. ২৯৮৭

২। মধু রজে বৃন্দাবনে খেলত হরি। বি.-ভা. পুঁ.-১৭৭৫

॥ অনন্তদাস ॥

১। চূড়ায় চান্দ কপালে চান্দ চান্দের উপরে চান্দা। -বি. ভা. পুঁ-৩৫৪৬

২। তুমি কি না জান হে বধু তুমি কি না জান। ঐ -২৮৩৯

৩। দাড়াইয়া তরুর মূলে আকুল করিল মোরে ইসত বঙ্কিম দিঠি চাইয়া।
বি. ভা. পুঁ-৫৩০৯

৪। সিঙ্গা পাচনি বাধা আমরা নিবে বঞ্চা-৫৩ক ; বি. ভা. পুঁ-১৭৩২

॥ বংশিঃ বংশীবদন ॥

১। আর কিছু বল না হে কয় বা হে কথা শুনি। -বংসিবদন-
বি. ভা. পুঁ-১৭৩৪

২। দেখ দেখ অগো সখি ঝোলনা তরঙ্গ। ব'শী -বি ভা পুঁ-১৭৩২

৩। ফুল ঘর ফুল বন ফুল ঝারা তায়। " " "

৪। বিন্দাবন মাঝে সকল সখীগন। " " "

৫। মধুর বসন্ত শ্রীবৃন্দাবনে শোভা। " " "

৬। সাম ধনে করতহি কুসুম ডুলোল। " " "

৭। হেরি দেখ অগো সখি পানে চেএ। " " "

।। নরহরি ।।

১। আপুনি গড়িলে আপুলি ভাগিলে দোষ দিবে আর কায়। -বি ভা. পুঁ-
২৯৮৭

২। চন্দ্রাবলি কুঞ্জ তেজিয়া বর কান। -৬২খ-বি ভা. পুঁ-১৭৩২

৩। চন্দ্রাবলি সনে কুসুম শয়নে সুতিয়া আছেন শ্যাম। -২:খ-বি ভা. পুঁ-
৫৪০৬

৪। ধনি নাচে রে আপনা বেশে। -পুঁ-প ২-পৃ-১৭৬ (পদমেরুগ্রন্থ)

৫। পীরিতি পীরিতি পীরিতি বিসম হিআয় জাগএ শেল। -বি ভা পুঁ-
২৯৬৭

—এই পদটি 'বৈষ্ণবপদাবলী' (পৃ-৬৮) গ্রন্থে 'চণ্ডীদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে ; কিন্তু গ্রন্থকার আকর-গ্রন্থ উল্লেখ করেন নাই। বিশ্বভারতী-পুঁথি অন্তত দু'শ বছরের পুরাতন কাজেই উক্ত পুথির সাক্ষ্য অনুসারে 'নরহরি'-ভণিতাই সঙ্গত বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক।

৬। পিরিতি বলিআ একটি কমল ফুটিল হিআর মাঝে। —

—এই পদটি বিশ্বভারতী-সংগ্রহের ২৯৬৭ সংখ্যাক পুঁথিতে ভণিতা আছে—"কহে নরহরি সন গো সুন্দরি পিরিতি রসের সার" এবং ৪২৬৫ সংখ্যাক পুঁথিতে "কহে নরহরি সুন হে সুন্দরি পিরিতি রসের সার"—এই ভণিতায় পাওয়া যায়। প ক. ত (প সং-৮৯১), বৈ.

প (পৃ-৬৮) এবং বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি (পৃ-৩৮৯) নামক একখানি পদ-সংকলন গ্রন্থে 'চণ্ডীদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। মুদ্রিত পাঠ :—"পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সায়র মাঝে।"

৭। বিনদিনি বেরি এক কর অবধান। -বি ভা পুঁ-৭০ (পুঁ-প-২-পৃ-২১২)

৮। মাধব বুঝিনু মরমকি ভাঙ্গ।

... ...

নরহরি পহু চরত গিরত রাই আঙ্গিনার মাঝে। -বি. ভা. পুঁ -২৯৮ (পুঁ. প. ১-পৃ-১৫৭)

—এই পদটি পরিবর্তিত রূপে 'নীলাম্বর'-ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে-বৈ প -পৃ-৭০৯

৯। যুগল পিরিতি কোথা উপজিল পিরিতি বলিব কারে। -বি ভা পুঁ-৫৩১ (পৃ-২১২)

॥ বাসু ঘোষ ॥

১। আজু জতনে জাহে লাভ। -বি ভা পুঁ-৩৬৪৩

২। আজু মুঞি কি পেখিলু গৌরাঙ্গ সুন্দর। বি ভা পুঁ-১৭৩৩

৩। আনন্দ সমুদ্রে শচী রহেন ডুবিয়া। -বি ভা পুঁ-৩৬৪৩

৪। আলো সই আহা মরি মরি। ঐ -৫৬৮৮

—প ক. ত-(প সং ২১৭৫) গ্রন্থে 'বাসু ঘোষের' ভণিতায় একটি পদ আছে—'আহা মরি মরি সই আহা মরি মরি।' —দুটি পদ সম্ভবত মূলে এক ছিল। কীর্তনীয়াদের আখরের ফলে পরবর্তিকালে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে—এরূপ ধারণা অসঙ্গত নয়। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দুটি সমগ্র পদের তুলনামূলক বিচারের অপেক্ষা রাখে।

৫। ইহারে কপিন কে পরালে গ। বাঁশি চূড়া কোথা। -বি ভা. পু-৮৭৬

৬। কত দীনহীন জনে তুমি কৈলে প্রেমদানে। -বি. ভা পুঁ-৫৩৫৩

৭। কানু সে পরাণ মোর জাতি জীবন ধন। ঐ -৩৩৫৪

—এই পদটি বৈ. প. (পৃ-৫৯) গ্রন্থে 'চণ্ডীদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। পাঠ—"কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন"। 'বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি'-গ্রন্থে পদটি একবার 'জ্ঞানদাস' ভণিতায় (পৃ-২০১), আরেক বার

'চণ্ডীদাস' ভণিতায় (পৃ২২৫) মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ধৃত পাঠ 'বৈষ্ণবপদাবলী' গ্রন্থের পাঠের অনুরূপ।

৮। কি এ অপরূপ রূপ গৌরঙ্গ কিশোর। -বি. ভা. পু-১৭৩৩, ৫৬৮৮

৯। কি কর গৌরাঙ্গ চাঁদ নিশ্চিন্তে বশীয়া -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৪

১০। কি করিব গোরা রূপ না জায় পাশরা। „ -১৭৩২

১১। কি দেখিলু গোরা আজু বরণ সুন্দর। „ -৫৬৮৮

১২। গোরা গুনে প্রাণ মোর কান্দে। „ -৩৬৩৩

১৩। গৌউর আমার আসিবে নদ্যাপুরে। „ -৮৭৩

১৪। গোরা জব আয়ব নবদ্বিপ মাঝ। „ -৩৪২

(পুঁ প-১-পৃ-১ ৬৬)

১৫। গৌরাঙ্গ চান্দের মনে খেদ উপজিল। -বি. ভা পুঁ-২৭৩৩

১৬। গৌরাঙ্গ লাবণ্য রূপে কি কহব একমুখে। „ -৫০৪৬

—পদটি প ক ত-(প. সং-২৯০। ৭৮৭), ও বৈ প (পৃ-৪৮৬) গ্রন্থে 'নয়নানন্দ' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে; কিন্তু ভাবের আন্তরিকতা থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে পদটি মূল বাসু-ঘোষের রচনা; পরবর্তিকালে নানান কারণে ভণিতা বিভ্রাট ঘটেছে।

১৭। চল চল দেখি গিয়া মন কেমন করে। -বি. ভা পুঁ-২৭৩৩

১৮। জে দিনে মাধব করল পয়ান। „ -১২৮৮

১৯। দেখ তরুন গউর চন্দ অপরূপ দ্বিজমনিঞা। „ ৩৩৪৪

—'বাসুঘোষের পদাবলী' গ্রন্থে (প. সং-৩০) পদটির প্রথম ছত্র এইরূপ—

"দেখত ঝলত (পা. অরুন) গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজমনিঞা"।

২০। দেখ সখি আওত গোরা নটরায়। -বি. ভা পুঁ-৫৬৮৮, ১৭৩৩

২১। পেঁখিলু গৌর সুন্দর দ্বিজমনিঞা। „ -১৭৩৩

২২। বল মোরে ও জন কে গো সজনি। „ - „

২৩। বিমল গোরা তণু বিমল হেম জনু। „ - „

২৪। মহারাস বৃন্দাবন-লীলা মনেত পড়িল। „ -২৩৬ (পুঁ প-১-পৃ-১২৮)

২৫। মান বিরহ জরে পহু ভেল ভোর। „ -১৭৩২

পদটি প ক ত (প. সং-৩৩২), বৈ. প (পৃ-৯০৫), পদামৃতমাধুরী (২০১)-ইত্যাদি গ্রন্থে 'রাধামোহন' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থত্রয়ে

ধৃত পাঠ—"মান বিরহ ভাবে পহু ভেল ভোর।" ভাবের আন্তরিকতা হেতু পদটি বাসু-ঘোষের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। বিশ্বভারতী-পুথি দুই শতাধিক বছরের প্রাচীন; সুতরাং উক্ত পাঠ উপেক্ষনীয় নয়।

২৬। শচী মায়ের অঞ্চল ধরি নাচে বিশ্বম্ভর। -বি. ভা. পুঁ-২৮৩৫

২৭। শ্রীবাসে অঙ্গণে গোরারায়। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩১

—বাসুঘোষের পদাবলী (পদ সং-৪০) গ্রন্থে ধৃত পাঠ—"শ্রীবাস মন্দিরে গোরারায়।" কিন্তু তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় বিশ্বভারতী পুঁথির পাঠ অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ এবং মূলানুগ।

২৮। শ্রীবৃন্দাবন বলি মনেত পড়িল। -বি. ভা. পুঁ-৩৩৪৫

—'বাসুঘোষের পদাবলী' গ্রন্থের ২১নং পদর প্রথমছত্র—"বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল।" বিশ্বভারতী-পুথিতে প্রাপ্ত পদটি উক্ত মুদ্রিত পদের পাঠভ্রংশ কিংবা স্বতন্ত্র পদ—তা দুটি পদের সামগ্রিক তুলনামূলক বিচার-সাপেক্ষ।

২৯। শ্যামল সুন্দর তনু মিলিবর। -বি. ভা. পুঁ-৫৬৮৮

৩০। সই এই দেখিলু সচির নন্দন। " - "

৩১। সজনি কি না মোরে ভেল। " -১৭৩৩

—বি. ভা. পুঁ-৩৬৪৩ সংখ্যাক পুঁথিতে এই পদটির প্রথম ছত্রের পাঠ "সজনি কি মোরে হইল"। —এ পাঠ সম্ভবতঃ পরবর্তিকালের। কীর্ত্তনানন্দের (পৃ-২৭৬)—"আলো সই কি না মোর হলো" পাঠ আরও অর্বাচীন কালের। 'বাসুঘোষের পদাবলী' গ্রন্থের "সই না জানি কি মোর ভেল" বা প. ক. ত (প. সং-২২১০) গ্রন্থের "না জানি কি জানি মোর ভেল"—ইত্যাদি পাঠও গায়কদের প্রক্ষেপ বলে মনে হয়। তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, বিশ্বভারতী ১৭৩৩ সংখ্যাক পুঁথির পাঠ অপেক্ষাকৃত মূলানুগ—এবং পরবর্তিকালে পদটি বিভিন্ন লিপিকর বা গায়নের হাতে নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে।

৩২। সুন সুন প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। বি. ভা. পুঁ-৩৩৪৪

৩৩। সুরধনি তীরে গদাধর। " -১৭৩১

৩৪। হেরি দেখ অপরূপ শয়ন মন্দিরে। " -৩৩৪৪

॥ বলরাম দাস ॥

১। অরুনিম ডম্বর অম্বর শোভিত হরিগুণে মর্দ্রিত ভার। -৬ক বি ভা পুঁ-১৭৬৪

২। এ সখি অপরূপ পেখলু গোরি। -২০ক ; বি. ভা পুঁ-১৭৬৪

৩। কর পদ সুন্দর নব অনুরাগ। ৫ক " "

৪। কি খেনে দেখিল সে লেগে রইল চিতে। ১৭খ ; " "

৫। কি খেনে কো বিধি রূপক সায়র নায়র কৈল নিরমান। ১৭খ ; বি. ভা পুঁ-১৭৬৪

৬। কি ক্ষণে তুরঙ্গ নয়ানে চাহিলে হানিল বিশের বান। ১৬ক ; বি ভা পুঁ-১৭৬৪

৭। কি বলিলা নন্দরাণী হারাঞাছে নিলমনি। -বি ভা পুঁ-৩৩৪৪

প. ক ত (প সং-১৯৬৬) গ্রন্থে পদটি মুদ্রিত হয়েছে, ভণিতা 'অজ্ঞাত'।

৮। কি বে সব নাম (?) কি বা শে সন্ধান কিবা সে নাগরপনা। -১৩খ ; বি ভা পুঁ-১৭৬৪

৯। খাইতে সুইতে আকুল পরাণ সোয়াস্তি নাহিক চিতে। -১৭ক ; বি. ভা পুঁ-১৭৬৪

১০। চন্দন পড়িয়া কি বা ফোটাটি পরে। -৩২খ ; " "

১১। জত জত পিরিতি কে বা ছে (?) মোরে। ৩৬খ ; " "

১২। জমুনা সিনানে জাইতে কি খেনে। ১২ক, খ ; " "

১৩। জানলি হরি হরি কব শ্রীচরণ সম্ভাই ; -২ক ; " -৪৩৯৯

১৪। ঢল ঢল অতিনব সজল জলদ তণু শোহন মোহন। -১০খ ; " -১৭৬৪

সংকীর্তনামৃতে (পদ সংখ্যা-১৯৩) পদটি 'গোবিন্দ দাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। মুদ্রিত পাঠ ঃ—"ঢল ঢল সজল জলদ তণু শোহন মোহন আভরণ সাজ।"

১৫। দেখিতে দেখিতে অমিয়া উথলে। -১২খ ; ১৭৬৪

১৬। নদিয়া নাগরী কান্দে। -পৃ-২খ ; বি ভা. পু-১৭৬৪

১৭। নড়িহাতে নন্দরাণী জায় খেদারিয়া। -পৃ-১খ ; বি ভা. পুঁ-৩৩৪৪

১৮। নাগরি মোহন ফান্দ। ১১ক ; ১৭৬৪

১৯। নিরবধি পাপ চিত নাহি জানে আন। -৩২খ ; বি. ভা. পুঁ-১৭৬৩

২০। নিরবধি ধক ধক চিতে। -৩৪ক; ১৭৬৪

২১। নিসি অবশেষে সকল সখীগণ রাই কানু সঙ্গে ভোর। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩১

—প. ক. ত (প. সং-২৫০৪) বৈ. প (পৃ-২২৪) গ্রন্থে পদটি 'যদুনন্দন' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

২২। পিঠে খেনে রাখে দিঠে দিঠে কভু মোরে সে জে না খুআয়ে।

-বি. ভা. পুঁ-২৩৮ (পুঁ. প-১ পৃ-১৩১)

২৩। বন্ধুর অভিলাসে সুতিরা থাকিএ ভুমে। -৩৪ক; ১৭৬৪

২৪। বিন্দাবনে সে প্রমহি তোরনা। -বি. ভা পুঁ-১৭৩২

২৫। বুকে বুকে মুখে চখে লইএে থাকে তবু মোরে সদাই হারায়।

-বি. ভা পুঁ-২৩৮ (পুঁ প ১ পৃ-১৩১)

'কীর্তনানন্দে' পদটি 'বলরামের' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। পাঠ—"বুকে বুকে মুখে চোখে লইয়া থাকি তভো মোরে সতত হারায়"—৩। ৫২; পৃ-২৬৩-৬৪ আবার 'রসকল্পবল্লী' (পৃ-১৭৩-১৪) গ্রন্থে পদটি 'কৃষ্ণদাস' ভণিতায় পাওয়া যায়। পাঠ:—"বুকে বুকে মুখে লাগিয়ে থাকয়ে তভু মোরে সদাই হারায়।" 'রসকল্পবল্লী' সপ্তদশ-শতাব্দীতে রচিত। সুতরাং প্রাচীনতার দিক্ দিয়ে উক্ত গ্রন্থের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে, বিশ্বভারতীর প্রাচীন-পুঁথি কীর্তনানন্দের পাঠও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষণীয় নয়। এমতাবস্থায় পদটির প্রকৃত পাঠ ও পদকর্তা নিরূপণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সম্ভবতঃ এই কারণে অর্বাচীন কালের পদসংকলন গ্রন্থগুলিতে পদটি বর্জিত হয়েছে।

২৬। বৃন্দাবনহু জেট ফুকারই মুক পিক সারিক পাঁতি। -২খ; ৪৩২৯

২৭। মৃগমদ চন্দন গন্ধ মুলেপণ বিকশিত চম্পকদাম। বি. ভা পুঁ-১৭৩১

২৮। রহিয়া সকল লইএগ তোমার যুবতি দুয়ারে আলা। -৩৮ক; ১৭৬৪

২৯। রহিয়া রহিয়া বাসিটী বাজায় অঙ্গ মোড়া দিয়া হাটে। ৩২খ; „

৩০। রাই চান্দ মুখ মণ্ডল হেরই চর চর লোচন লোর। -বি. ভা পুঁ ৩৩৪৪

৩১। শ্রীরাস মণ্ডলে কিশোরী কিশোর দোহে মেলি নাচেরে। „ -২৯৪৭

৩২। সজনি রিপু হঞা আইল অক্রুর। „ „

৩৩। সহজে সুন্দর অঙ্গের ঠাম। -১৪খ; ১৭৬৪

৩৪। সহজে মুরতি ভুবন মোহে তাহে। ১৫খ; ১৭৬০

৩৫। সুনইতে কোটি মদন মুরছই। ১৮খ ; ১৭৬০
৩৬। সুনি তনু মোরি গোরি পর সুতলি। -বি. ভা. পুঁ-৩৩৪৪
৩৭। সোঙরিতে তুয়া রূপ বুক জেন চির। -৩৬ক ; ১৭৬৪
৩৮। হাথে ধরিয়া মোর কোলেতে বসাইতে অবস হইয়া গেলো সুখে।
-৩৪খ ; ১৭৬৪

॥ দীন বলরাম ॥

১। অেক দিষ্টে দেখে রাণী মাটি নাই মুখে। -বি. ভা. পুঁ ২০০০
২। জননির অগে আল দেখি চক্রপানি। „ „

॥ আত্মারাম দ্বিজ ॥

১। রূপ না গেল পাসরা রে। নেওর (?) গোরা রূপ ক্ষেনে ওঠে ক্ষেনে
বসে। বি. ভা. পুঁ-৮৭৩ (পুঁ প ২-পৃ-৮৭)

॥ নয়নানন্দ মিশ্র ॥

১। অঙ্গ গদ গদ রসে অঙ্গ গদ গদ। -বি. ভা. পুঁ-.৭৩২
২। মুখ চান্দ কি বর্ন্নিব নিতি। „ ৪২৯৯-৪৩৩৪

॥ রামানন্দ বসু ॥

১। প্রথম ছত্র নেই
আরম্ভ, চন্দনের বিন্দু লেহু ভালে।
... ...
ভণিতা, বসু রামানন্দ কয় জুবতি জিবার নয় বাঁসী হইল্যা অবলা
বধিতে ॥ -বি. ভা. পুঁ-৫৪৪৭
২। নিধুবোন কানন মন্দ সমিরণ সিতল কালিন্দি তির। -বি. ভা. পুঁ-১৯৯৪ ;
লিপিকাল সন ১২৯৫ সাল

৩। য়্রামার গৌরাঙ্গ নাচিছে সিবাসের পাঙ্গনে। -বি. ভা. পুঁ-২৩৬ (পুঁ. প-১-পৃ-১২৮

॥ জগন্নাথ দাস ॥

১। আমী কী হইলাম শোনার গাছ। দানী না ছারএ আমার কাছ।
-বি. ভা. পুঁ-৫৪১৯

—একই পুঁথিতে পদটি "হইলাম সো [না]র গাছ দানী না ছাড়এ কাছ" —রূপে পাওয়া যায়।

২। আর বার্যা কে দানে গো ব (?) জাই কীশের লাগি। -বি. ভা. পুঁ-৪৩৮৮

৩। এস এস গো..............এস ঘর জাই। „ ৫৪১৯

৪। ও রূপ দেখিয়া বড়াই কদম্বের তলে। „ „

৫। কোরে মিললি রাজদুলালি পড়ু মুরলি খসিএ। „ ১৭৩২

৬। তখন নাগর হরি। „ ৪৩৮৮

৭। তরাসে সুন্দরি দুবাহু পাসরি। „ ৩৮২৩

৮। নাথ হে রহিতে উচিত নহে আর। বি. ভা. পুঁ-২৫৭ (পুঁ. প-১ পৃ-১৩৬)

৯। ॥ নৌকাখণ্ড ॥ ফিরে জাইবার বেলে হেটুয়া না ডুবে জলে কোথা হতে আইল এত পানি। -বি ভা পুঁ-৩৮২৫

১০। বড়াই দেখ দেখি চেএ। -বি ভা পুঁ-১৭৪৩

১১। বোঁধু ভিনু না বাসিহ তুমী। „ „

—পদটি অ. প. র গ্রন্থে 'চণ্ডীদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

১২। ভালাই নই(?) আশাস ছার নাগর। -বি. ভা. পুঁ-৫৪১৯

১৩। ভুবনি মোহন তণু নবঘন। „ ১৭৪৩

১৪। ॥ নৌকাখণ্ড ॥ মথুরায় বিকেইতে ফিরিঞা ঘরকে জেতে। বি. ভা.পুঁ-৪৩১০

১৫। মথুরার হাট হতে ফিরিআ আসিতে পথে। „ „

পদটি বৈ. প (পৃ-২০৮) গ্রন্থে 'যদুনাথ দাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু কোন পুঁথিতে উক্ত ভণিতা পাওয়া যায়; সে পুঁথির প্রাচীনত্ব, প্রামাণিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো হদিশ সম্পাদক মহাশয় দেন নি।

১৬। রাইক কবরী বান্ধ সখী। বি. ভা. পুঁ-৩৩৪৪

১৭। রোজিএ বড়াই করি সাথে। বি. ভা. পুঁ-১৭৪৩

১৮। ॥ নৌকাখণ্ড ॥ শুন হে [খে] আরি পে। আমরা সকলে জাইব গোকুলে। -বি. ভা. পুঁ-৪৩৯০

॥ পরমানন্দ ॥

১। শচীর নন্দন গোরাচান্দ। -বি ভা. পুঁ ১৭৩১

॥ চন্দ্রশেখর ॥

১। আজু অবধি হাম কথি নাহি জায়ব। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৭
২। ইহ বিদই চলল হরি পাতরে চন্দ্রাবলি পরবোধি। " ১৭৪৩
৩। উয়ল দিনকর কিরণ বিথারি। "
৪। করতলে বেনু নিহারিতে কোপ ভরে কাঁপই রাই। " ১৭৩৩
৫। কাঁচ কাহা লাখবান কাঞ্চন কাঁহা কাঁহা। " ১৭৩৪
৬। কানু কহে বেনুদান দেহ সুন্দরি। " ১৭৩৩
৭। কাণু প্রেম ঘোরে রসের সাগরে সদাই ভাসিএ আমি। " ২৮৯ (পুঁ. প-১-পৃ-১৪৫)
৮। কি কর বিরস..................। -বি. ভা. পুঁ-২৩০৭
৯। কি তুঁ কমলা মুখি কোপ পরিহর। " ১৭৩৪
১০। কুঞ্জেতে নিকসল মানিনি রাউ। " ২৯৮ (পুঁ প-১ ; পৃ-১৫৮)
১১। কৈছন বাজি কিয়ে গুনেশ্বর রাজকুমারি। " ১৭৩৩
১২। খত করি হাতে শ্যাম করি সাথে। " ১৫৩৪
১৩। গোরখ নাথ চরণে লাগি তেরা। " "
১৪। চম্পকবল্লরি.........কহসি প্রিয় সখি। " "
১৫। চল চল মাধব মোহে সঙ্গ করি কুবুজিনী মুন্দরী পাস। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৩, ৩২২৫
১৬। জো ভেল সো ভেল ইহ রে মাধব খেমনু সব অপরাধ। -বি. ভা পুঁ-১৭৩২, ১৭৩৪, ৬০৩৯
১৭। জৈছন রাজকুমারী কহাওয়সি বোললি তৈছন বানি। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩২, ১৭৩৪, ৬০৩৯

১৮। তুহু গেলে বিসাখা বসিতে নাহি বোলব। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৪
১৯। তোহে ছোড়ি মাধব হাম। -২০৩ক ; ৩৩৪৪
২০। দূর সঞে কাণু হেরি সোই সহচরি ঠমকি ঠমকি চলি জায়।
বি ভা. পুঁ-১৭৩৪
২১। নবনী হেন নবনী দেহ—চন্দ্রসখি। বি ভা পুঁ-৭৫০ (পুঁ প-২-পৃ-২২২)
২২। পদুমা করতলে বেনু নিহারিতে। „ ৩৩৪৪
২৩। পাতরে পদুমা পন্থে চলি যাওত। „ ১৭৩৪, ১৭৩৩
২৪। বদয় তুয়া দ্রি্দয় বিহি কুলিস কিএ গরল হে। বি. ভা. পুঁ-২২৩, ৭৫০
(পুঁ প ২-পৃ-২২২)
২৫। বাজিকর নহে ব্রজপতি নন্দন অন্তরে জানল রাই। -বি ভা. পুঁ-১৭৩৩
২৬। বুঝল মরমকি ভাব। „ ৩২২৫
২৭। মোথুরা নগরে প্রিয়া গো সখি। „ ২৩০৭
২৮। মোরি মাগো তুঙ্গবিদ্যাক আসে। „ ১৭২৪
২৯। মোহে মন্থ করি লেহ। „ ১৭৩৩
৩০। যত ততহি কোপকি করিতে সমুচিত। „ ১৭৩৪
৩১। রে রে সহচরি কাঁহা চলি জায়সি। „ „
৩২। ললিতে আমারি দণ্ডবত তোয়। —চন্দ্র ভনে — „
৩৩। ললিতে কি সখি কহই। „ „
৩৪। ললিতে বেরি বেরি কহন খ তোই ; „ „
৩৫। ললিতে রেরি বেরি কহলম তোএ। „ ৫১০৮
৩৬। লেখনি ডরুনা করি রাধা প্রেআরি। „ ৩২০৮
৩৭। সব সখিগণ করায় সিনান। „ ১৭৩৪
৩৮। সমন উরু রমন মোঝে ভুলল রে প্রিয় সখি। চন্দ্রসখি „ ৭৫০
(পুঁ. প-২-পৃ-২২২), ২৩০৭, ৫৪৫৪
৩৯। সরল জানি কুটিল জনে ভজিল রে। —চন্দ্রসখি-বি. ভা. পুঁ-৭৫০
(পুঁ. প-২-পৃ-২২২)
৪০। সামকি সঙ্গে রঙ্গে রসে রাই। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৩
৪১। সুন্দরি তুঁহারি মরম জান ভাল। „ ১৭৩৪
৪২। হা হা রঙ্গ রঙ্গ মেরে ভায়া। „ ১৭৩৩
৪৩। হে নিরলজ লম্পট। „ ৫১০৮

৪৪। হের জব কাই খিন রাই তনু দুবরি পিরিতি। -২২ক, ৭৫০

৪৫। প্রথমাংশ খণ্ডিত, শেষ দুইছত্র—

হাতকী কঙ্কণ সাথে পর জায়ই জামীনি বিরহ দুখ ধামে।
আরা……সঙ্গিণী ঘোট (?) নাহি পাওই চন্দ্রশেখর পরমানে।
-বি. ভা, পুঁ ৫০৮৫

॥ গদাধর ॥

১। থর থর কহত সুনহ লোলিতা সোখি সুমুখি বিমুখি জব ভেল।
–বি. ভা. পুঁ-১৭৫৪

২। সব সখি কৃষ্ণগুণ গাও। ” ”

॥ দ্বিজ গদাধর ॥

১। উণ্মন হঞা সভা সঙ্গ পুয়া ইন্দুরেখা সহচরি। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৪

॥ উদ্ধব দাস ॥

১। এস এস এস আধ আচরে বোস নয়ন ভরিঞ তোমা দেখি।
-বি. ভা.পুঁ-২৩০৭

২। গোবিন্দ হে পিবিতি য়ঙ্কুর জেন না ভাঙ্গে হে। ” ৬৭৭
[পুঁ. প-২, পৃ-২১৯]

॥ জগদানন্দ ॥

১। দমিত দামিনী দাম দরপন দেহদীপতি উজোর। -বি. ভা. পুঁ.২৫১৬

২। গুরুজন নয়ন পরহিগণ চৌদিকে। ” ৫০৯৬

৩। চাঁচর চারু চিকুর চোহ চোর্চিত চুড়হি। ” ১৭৩৪

৪। জাগয়ে বৃসভানু নন্দিনী মোহন জুবরাজ। ” ১৭৭৫

৫। দেখ দেখ আরোতি করে নন্দরানি। -বি ভা পুঁ-১৭৭৫
৬। দেখ মাই মোহন গিরি-বরধারি। " ১৭৩১
৭। বৃসভাণুনন্দিনী মহান ব্রজরাজ। " ২৩৬৪-৬৬
৮। ॥ শ্রীরাগ ॥ মিলিত সুললিত নীর মলয় সমীর বহ অতি মন্দ।
-বি ভা. পুঁ-২৫৬১
৯। হরি উপরে হরির জনম তাহার উপরে প্রেম। " "
—পদটি প্রহেলিকা-জাতীয় সহজিয়া-গন্ধী রচনা। এটি কোন্ জগদানন্দের রচনা জানা যায় না।

॥ জ্ঞানদাস ॥

১। অবলা কি জানি গুন ধরে। -বি ভা. পুঁ-১৭৩৩
—পদটি কীর্তনানন্দ (পৃ-২:৭) ও প ক ত (প সং-৬৮১) গ্রন্থে 'গোবিন্দদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। বৈ. প (পৃ-২৯৩) ও 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে (প সং-৭৪৪) পদটি 'গোবিন্দ আচার্য'—রচিত বলে স্থির করা হয়েছে।
২। অসুরা সুর নরমুনি গণ কিন্নর। -বি ভা পুঁ-১৭৩৩
৩। এ কথা বড় মনেতে হইল। " ১৭৩৪
৪। একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি জায়। " ১৭৫৩
—প ক ত (প সং-২৩৮) ও বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি (পৃ-১৪০) গ্রন্থে 'বিদ্যাপতি'-ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু রচনা-শৈলী থেকে মনে হয়, পদটি জ্ঞানদাসের-রচিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।
৫। ও হেন গোকুলপতি। -বি ভা. পুঁ-১৭৩৩
৬। কণ্ডলজ কউন (?) চরণ রজ রঙ্গে ভব নিরবুধি। " "
৭। কানু অভিসারে চলু বিনদিনি রাধা। " ১৭৩২
৮। কানুর জত রূপ আজি দেখিলু " ১৭৩৩
৯। কালা অঙ্গের ছটা। " "
১০। কি খেনে শ্যামের অঙ্গে। " ৩৩৪৪
১১। কি গুরু গরবিত না লএ পাপচিত। " "
১২। কি বলিব রাঙ্গা পাএ। " ১৭৩৪

১৩। কি বা সে কানুর প্রেম। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৩
১৪। কি হৈল্য মোর নন্দকিশোর। " ৩৩৪৪
১৫। কি হেরিলাম নব জলধরে। " "

—পদটি 'বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি' (পৃ-২১৯) ও বৈ. প (পৃ২১৪) গ্রন্থে 'যদুনন্দন' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থদ্বয়ে আকর-গ্রন্থ বা পুঁথির কোনো উল্লেখ নেই।

১৬। কী না সে কানুর প্রেম। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩২, ৩৩৪৪
১৭। গোরাচান্দ নাচে গায় মব নীরবন্ধে। " "
১৮। চন্দনে লেপিত গৌর কলেবর। " ১৭৩৩
১৯। জব তুহু সুন্দরি ৬েটবি নেহা। " "
২০। ধনি পরবোধল গৃহজন বৃন্দ। " "
২১। নিধুবনে কি বা শোভা। " ১৭৩২
২২। পদ আধ আধ। " "
২৩। পিয়ার পিরিতি সকলি কহিতে। " ১৭৩৩
২৪। বড় পরমাদ গো সই বড় পরমাদ। " ৩৩৪৪
২৫। বন্ধু চিত নিবারল তুমি। " ১৭৩৪, ৫৪০৬
২৬। বন্ধু মোর পরাণ কানাঞি। " "
২৭। বন্ধু হে কি আর অধিক মোর। " ৫৪০৬
২৮। ভাল হৈল কান। " ১৭৩৩
২৯। ভাল হৈল এলে আমার প্রেমময়ি রাধা। " ৩৩৪৪
৩০। ভালে হাম কলাবতি। " ১৭৩৩
৩১। ভুবন সুন্দর কনয়া কলেবর। " "
৩২। মঞ্জুল হাস সরস রস বোলনি। " "
৩৩। মধুর মধুর বিলাস নিনোদা মধুর ভাঁতি গতি অতি লালা।
-বি. ভা. পুঁ-১৭৩৩
৩৪। রসে সমান অঙ্গে নবরঙ্গিনী সাজল। " ১৭৩২
৩৫। রাই কহে রস কথা পুলকিত তনু। " ১৭৩৩
৩৬। শুন রে সুবল ভাই বলি রে তোমারে। " ১৭৩৪
৩৭। শুন শ্যাম বিনোদ নাগর। " ৫৪০৬
৩৮। শুন হে নাগর রসের সাগর। " "

৩৯। শুন হে নাগরি রসের সাগরি। -বি. ভা. পুঁ-৫৪০৬
৪০। শ্যাম শরীর হার হিয়ে লম্বিত। " ১৭৩৩
৪১। যুন সুন্দরি পরাণ পুতলি। " ৫৪০৬
৪২। সই কে বলে পিরিতি ভালো। " ৩৩৪৪
৪৩। সজনি কেনে কৈলাঙ। " ১৭৩৩
৪৪। সহজই শ্যাম কলেবর। " "
৪৫। সে বড় রসিক প্রিয়ার পিরিতি। " "
৪৬। সুনি সখি সো চরণ মনে অনুমান। " ৩৩৪৪
৪৭। সোঙরি সোঙরি খিনা দেহা। " "
৪৮। সোন সোন তোরে মরম কহি। " "
৪৯। হেদে ও তরুর মূলে কি রূপ দেখিয়া আলু। " ১৭৩৩
৫০। হেথা রাধা বিনোদিনি। " ১৭৩৪
৫১। হেম বরনি মৃগ নয়নি জলকে জেছে কে। " ৩১৭৫

নিম্নলিখিত পদগুলি শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জ্ঞানদাসের পদাবলী'-গ্রন্থে খণ্ডিতরূপে মুদ্রিত হয়েছে কিন্তু বিশ্বভারতীর ১৭৩৩ সংখ্যক পুঁথিতে পদগুলি সম্পূর্ণ আছে।

১। কাচ কনক রুচিবর বিগ্রহ। -বি ভা. পুঁ-১৭৩৩ (জ্ঞানদাসের পদাবলী-পৃ-৩০০)
২। চলনি চাহনি দোলনি হেন। " " (" " ৩০১)
৩। চৌদিকে ঘন ঘন চকিত নিহারিতে। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৩ (,, ,, পৃ-৩০৫)
৪। নব কুবলয় দল কি এ অতসীফুল। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৩ (,, ,, পৃ-৩১১)
৫। নীল কমল বয়ান নিরমল। " " (,, ,, পৃ-৩১০)
৬। বরিহা মুকুট মৌলি মন শোহন। " " (,, ,, পৃ-৩০৯)
৭। শ্যাম মোহন ঘন কুঞ্চিত। " " (,, ,, পৃ-৩০৮)

॥ লোচন দাস ॥

১। অগো দিদি কোন দেশে ছিলা তুমি। -বি. ভা. পুঁ-৪৬৬৪-৮৫
২। অরুণ আঁখি করুন আলয়। " ৬৭২ (পুঁ-প-২; পৃ-২১৮)
৩। আর ডর নাঞী সই আর ডর নাঞি। " ২৭২৭

৪। আইস আইস বৈসসিঞা মোর প্রাণের সই। „ ২৮৬৫

৫। আর কি বলিব সই আর কি বলিব। „ ৪৬৬৪-৮৫

৬। আর সুন্যাছ আলো সই অবধ মতির কথা। „ „

৭। একদিন ঘরে আনন্দ বাড়ল। „ ৩৮২৮

৮। এক নাগরি দয়া করি বল্যেছে এমন কেনে।

ফনির মাথায় মনি দিয়ে ভেটগ। রূপের সনে ॥ „ ৪৮৬১

৯। এ সখি প্রাণ কেমন করে। „ ৪৬৬৪-৮৫

১০। এত রাতে আমার ঘরে কপাট ঘুচায় কে। „ „

১১। ঐ গোরা কে বটে চেনা নাঞি যায়। „ ৬৫৭

১২। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর শোক-সন্তপ্তা শচীদেবীকে সান্ত্বনা-দান সম্পর্কিত একটি অপ্রকাশিত সুদীর্ঘ পদ আছে বিশ্বভারতীর ৩১২০ সংখ্যক পুঁথিতে। পদটির আদি খণ্ডিত। ভণিতাংশ,—

এ বোল সোনিঞা সচি করএ রোদন।
বেথিত হিদএ কহে দাশ লোচন। -পৃ-১০খ ; বি. ভা পুঁ-৩১২০

১৩। কনক কুমুদ দেহের মাধুরি। -বি ভা পুঁ-২৩০৭

১৪। কত লাবণ্য অঙ্গ সাজাঞা। „ ৪৬৬৪-৮৫

এই পদটি অ প র (প সং-১৭১) ও বৈ প (পৃ-৪৩৭) গ্রন্থে ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে 'জ্ঞানদাসের'-ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। পদটির প্রকৃত-পদকর্তা-নিরূপন তুলনামূলক আলোচনা-সাপেক্ষ।

১৫। কাঁচা কাঞ্চন জ্যোতি জিনি গোরা অঙ্গখানি। -বি ভা. পুঁ-২৭২৭

১৬। কানাঞা রে সাঁজের বেলায় জাইব। „ ৪৬৬৪ ৮৫

১৭। কাল হেন ডুগডুগাটি কদম্ব তলায় থাকে গো। „ „

১৮। কি এ কাঁচা কাঞ্চন স্ফুট চম্পকদল। -বি ভা পুঁ-২১৫ (পুঁ প-১ ; পৃ-১২১), ২৭২৭

কি করিব অগো সই হিয়ায় জাগে গোরা। „ ৬৫৭ (পুঁ প ২ পৃ)

১৯। কি হৈল আরে সখি গোরা বরণ খানি। „ „ („)

২০। কি হে হৈল কি হে হৈল গোরা কেনে না জায় পাসরা। -বি ভা. পুঁ-৬৭৯ (পুঁ. প-২ ; পৃ-২২০)

২১। কি হৈল কি হৈল সখি গোরার বরণ খানি। -বি ভা. পুঁ-২৭২৭

২২। খেলাইতে জাবি গোরাচান্দ। „ ২৩০৭

২৩। গড়ের আটে হাটে ঘাটে জলকে জাওয়া ভার। ,, ৪৮৬১

২৪। গোরা রূপ অমিয়া পাথার। ,, ২৭২৭

২৫। গৌরাঙ্গ চান্দে[র] বরণ জেন যাম্বনদ স্বর্ণ। ,, ২৩০৭, ৬০০৩-৬০২৮

২৬। [ঘ]রেতে কেহ নাই একা ছিল রাই। ,, ৪৬৬৪-৮৫

২৭। ঘূর্ণিত অরুন আখি রসে মাতোয়ারা। ,, ৫৫৫৫

২৮। ঢর ঢর কাঞ্চন জিনি গোরা অঙ্গ খানি। ,, ২৭২৭

২৯। ঢরত সোনার বরণ এলু'ঞা পড়িছে গা। ,, ৬৭৯ (পুঁ প-২ ; পৃ-২২০

৩০। তোমরা নাকি বল আমি কানুর সঙ্গে আছি। ,, ৪৬৬৪-৮৫

৩১। তোমাতে আমাতে জে পিরিতি। ,, ,,

প ক ত (প. সং-৭৫৭) গ্রন্থে পদটি ঈষৎ-পরিবর্তিতরূপে 'রসময়ী' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। মনে হয়, মূলে পদটি লোচনদাসের রচনা ; পরবর্তিকালে অখ্যাত মহিলা-কবি 'রসময়ী' এই পদটি অবলম্বন করে পদ রচনা করেন।

৩২। দয়া কর গৌর নিতাই দয়া কর মরে। -বি ভা পুঁ-২৩০৭

৩৩। দণ্ড রে পাড়ার লোক চোর সেন্ধালো ঘরে। ,, ৪৬৬৪-৮৫

৩ । দিদি কৈলি বটে রসের ঘাটে বুকের পাটা তোর।

৩৫। দেখস্যালো গোরাচান্দ কামিনী মোহন ফান্দ। ,, ২৭২৭

৩৬। রূপ সাধনে মন হল্য নাই মদন রশে ভোর ॥ ,, ৪৮৬১

৩৭। ননদিনি গো বাতাসে পাতিয়াছে ফান্দ। ,, ৪৬৬৪-৮৫

৩৮। নবীন বএসে গোরা নৌতন নাগর। ,, ৩৪৭ (পুঁ প-১ ; পৃ-১৬৮), ৬৭৯ (পুঁ. প-২ ; পৃ-২২০)

৩৯। নবদ্বীপ নাগর অগোর গোরা। -বি. ভা পুঁ-৩১১৭

৪০। নয়নের পুথলি গোরা না জায় পাসরা। ,, ৫০৩ (পুঁ প-২ ; পৃ-২১০)

৪১। নাচে রে নাচে রে গোরা হেম কমলিআ। ,, ২১৫ (পুঁ. প-১২১), ২৩৬ (পুঁ. প-১ ; পৃ-১২৮), ৬৭৯ (পুঁ. প-২ ; পৃ-২২০), ২৭২৭

৪২। পাট শাড়ি পরনে নেতের কাঁচুলি। -বি. ভা পুঁ-৩৭২৯-৩৬

৪৩। পুরূবে আছিল ঐ নন্দ ঘোষের বেটা। ,, ৬৫৭

৪৪। পুরট সুন্দর দ্যুতি তরুন কুঞ্জর গতি। ,, ২৭২৭

৪৫। প্রেমনির ধারা বহে নয়নের জলে। ,, ৩৬৭২

৪৬। বন্ধু হে এ বেসী জানিলাম তোমা। ,, ৩১৭৫

—বৈ. প (পৃ-১০৪৫) গ্রন্থে পদটি 'ধনঞ্জয়'-ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থে আকর-পুঁথির উল্লেখ নেই।

৪৭। বিকাল বেলে গেলি জলে কলসী লইঞে। বি. ভা. পুঁ-২৬১ (পুঁ প-১; পৃ-১২৭)

৪৮। বিধি দিএছিলো তোরে

... ...

দাস লোচনে বলিএ ফারাগ ডিবি ডুবিল য়াপন দোসে। -বি ভা পুঁ-৫০৩ (পুঁ প-২, পৃ-২১০)

৪৯। বেলি অবসানে সুরধনির জলে। -বি. ভা. পুঁ-২৭২৭

৫০। ভাতার ছাড়্যা ভাতার করে ভাল খাবার তরে। ,, ৪৬৬৪-৮৫

৫১। ভাল জানি পুত্রর বধূ মুখে মুখে কথা। ,, ,,

৫২। মকর কুণ্ডল কানে বনমালা গলে। ,, ২৭২৭

৫৩। মনমথ রঞ্জিত বেণু সুধাকর। ,, ১৭৩৪

৫৪। মনোরথ কোটী কোটী জিনি গোরাতনু। ,, ২৭২৭

৫৫। মরিব মরিব সই নিশ্চয় মরিব। ,, ৪৬৬৪-৮৫

এ নব জৌবন আমি কার তরে থোব ॥

৫৬। রশিয়া নাগরী জে।

মদনমোহন গৌরাঙ্গ বদন দেখিয়া মজ্যাছে সে। -বি. ভা. পুঁ-২৭২৭

'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে পদটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে মুদ্রিত হয়েছে। ভণিতা—"গোবিন্দদাসের চিতে। গৌরাঙ্গ চাঁদের চরণ নখর তাহার মাধুরী পিতে।" পদ সং-৭৬৫

বৈ. প (পৃ-৮৫৮) গ্রন্থেও পদটি রূপান্তরে মুদ্রিত হয়েছে—ভণিতা, "গোবিন্দদাসিয়া চিতে। গৌরাঙ্গ চাঁদের চরণ নখর বাসনা মাধুরী পিতে।"

বি. ভা পুঁ.র ভণিতা, —"লোচনদাসের চিতে। গৌরাঙ্গ চান্দের চরণ নখর তাহার মাধুরি প্রীতে॥" ২৭২৭। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, বি. ভা. পুঁ-র ভাষা প্রাচীনতর।

৫৭। রাগের ভজন বিসম বড়। -বি. ভা' পুঁ-১৯৩৯

৫৮। রাধা চন্দ্রাবলি দোহে জল ভরনে জায়।

… … …

লোচন বলে অগো দিদি কি বলহ মুখে।

শ্যামের সনে রাধা আছে জানে জগত লোকে। -বি. ভা. পুঁ-৬৪৭

(পুঁ. প ২ ; পৃ-২১৮)

৫৯। রূপ নাঞি তার গুন নাহি তার সুধই চিকন কালাটী। -বি. ভা. পুঁ-৪৮৮৪-৮৫

৬০। লোক সকল সজাগ পহিলে সাজ রাতি। ,, ,,

৬১। শুন গো সকল সই সপনের কথা কই। ,, ২৭২৭

৬২। সখীগণ সঙ্গে চলিল বর রঙ্গিনী। ,, ৩০৪৪

৬৩। সখী হে মোর মনের কথা শুন্যা জা। ,, ৪৮৮৪-৮৫

৬৪। হইল……[গো]রা……না জায় পাসরা। ,, ২১৫

(পুঁ. প-১ ; পৃ-১২২)

৬৫। হলদ বরণ গোরাচান্দ পড়ে গেল মনে। -বি. ভা. পুঁ-২১৫ (পুঁ. প-১ পৃ ১২১)

৬৬। হাশী বলে সুন ওগো সে মোর মনের দুখ। -বি. ভা. পুঁ-১৯৫৩

৬৭। হাসি হাসি দিদি দেখাইল। ,, ৪৮৮৪-৮৫

৬৮। হাসিঞা নাগরী কহে ধিরি। ,, ,,

৬৯। হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া বিরলে বসিয়া কব। ,, ১৭৮০

৭০। হেই গো গৌরাঙ্গ জেন হেম। ,, ২৩০৭

৭১। হের সুন্যাছ হিরা মাসি আমার মাথা[র] কিরা। ,, ৪৮৮৪-৮৫

৭২। হেদে ল রাধে বিনদিনি বড় মানুষের ঝি। ,, ,,

৭৪। হের সুনস্যা আ[মা]র কথা বিরলে পাঞা কই। ২১৫ (পুঁ. প-২ ; পৃ-২২০)

৭৫। হেম কমলিয়া গোরা প্রেম। -বি. ভা. পুঁ-১৮৫৫ (পুঁথি কীটদষ্ট ; অত্যন্ত জীর্ণ)

৭৬। য়ার সুন্যাছ কালিকার কথা কই তোরে। —২১৫ (পুঁ. প-১ ; পৃ-১২১)

৭৭। আলো ছি ছি তুঞি কলি কি। বি. ভা. পুঁ-৩১৭৫

—বৈ. প (পৃ-৪৭০) গ্রন্থে পদটি মুদ্রিত হয়েছে। পাঠ—"ছি ছি আগো মৈলাম লাজে তুই করলি কি।"

৭৮। আর সুন্ধা জা অগো সৈ দণ্ড চারি রেতে। -বি ভা পুঁ-২৯১৫
—বৈ প (পৃ ৪৭১) গ্রন্থে পদটি মুদ্রিত হয়েছে। পাঠ—"শুন শুন ও গো সই দণ্ড দুই চাইর রাইতে।" —এই পাঠ অপেক্ষা বিশ্বভারতী পুঁথির পাঠ অপেক্ষাকৃত মূলানুগ বলে মনে হয়।

॥ বৃন্দাবন দাস ॥

১। ॥ মঙ্গল-আচরণ ॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পর তিন ধামের। -বি ভা পুঁ-২৩৭৭

২। অরুন নয়নে প্রেম বরিখএ অবনি মণ্ডল সিঞ্চই। ১৬৬খ ; ১৭০৩, ৩৩৪৪

৩। আলসে অরুন আঁখি কহ পীআ কি না দেখি। -পৃ-৬৪ ; ১৭৩২, ১৭৩৪, ৩৩৪৪

বৈ প (পৃ ৪৮১) গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ—"আলসে অরুন আখি কহ গৌরাঙ্গ একি"– অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম।

৪। কদম্ব কেসর জিনি………… বিন্দু বিন্দু ঘাম। -বি ভা পুঁ-৩৩৪৪

৫। কর দেখোইল নয়নে ভিজত। ধ্রু। ,, ২৮৬১, ৩৮২৭

৬। কীর্ত্তন আনিয়া নিতাই নদীয়া নগরে। ,, -২৩৬(পুঁ প ১ ; পৃ-১২৮)

৭। গমন মন্থর গতি জিনি ময়মত্ত হাতি। ,, ৩৩৪৪

৮। দাস দাসী সখা কান্ত পিতা। ,, ৬০০৩-৬০২৮

৯। নাচ নাচ নিতাই গৌর দ্বিজমনিঞা। ,, ২২৬২

১০। নিতাই চরণে সরন লহিঞা জে জন ভজিবে গোরা। ৫৪৭৮

১১। পুছইতে বাত হাত লেই চিরহি। ,, ৬৭৬(পুঁ.প-২ ; পৃ-২১৯)

১২। ভোর অভোর লোর দিঠি পঙ্কজে সুবল পুছয়ে। ,, ৬৭৬(পুঁ প-২ ; পৃ-২১৯)

১৩। মন হে দেখ না সদাই ভুল। -২২৬২

১৪। সুন রাধে এই বস। -৩৮২৭

১৫। …………জিনি তণু অনুপাম রে। -২৩০৭

॥ শ্রীনিবাস-আচার্য ॥

১। রাধা শ্যাম দোহে রহু নিকঞ্জ ভুবনে ॥ চিনিবাস ॥ -১ ১ ক খ; ৩৩৪৪

॥ নরোত্তম দাস ॥

১। অগোচর বেদ বিধি আথা (?) দিয়া নিরবধি। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৩

২। আর কবে মোর হবে সুভদিন। „ ৫০৬ (পুঁ প-২ ; পৃ-২১০)

—প ক. ত (প সং-২১২), বৈ প পৃ-২৯৮), বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি (পৃ-১৮) ইত্যাদি গ্রন্থে পদটি 'কবিরঞ্জন' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। ভাবগত ঐক্যের বিচারে পদটি নরোত্তম-রচিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। নরোত্তম রচিত অন্যান্য পদের ন্যায় এই পদটিতেও ভক্ত প্রাণের আর্তি সুস্পষ্ট। বিশ্বভারতীর ৫০৬ সংখ্যক পুঁথিতেও পদটি নরোত্তমের' ভণিতায় পাওয়া যায়। পাঠ কবে মোর হইব শুভদিন" (পুঁ-প-২ পৃ-২১১)

৩। এমন বিহিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয়। -বি. ভা. পুঁ-৩৩৪৪

৪। এস্য বন্ধু আধ আচরে আসি বস্য নয়ান ভরিয়া। „ ৪৬৬৪-৮৫

৫। কি না হইল কালা কানুর পিরিতি। „ „

৬। গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখ নিজ পথে। „ ৫০৬ (পুঁ. প-২ : পৃ-২১১), ৬০০৩-২৮

৭। চল চল মাধব বিদগধ রাজ। -বি. ভা. পুঁ-৩৩৪৪

৮। চলিলা রসিক রাজ ধনি দেখিবারে। „ ৪৬৬৪-৮৫

—প. ক. ত (প. সং-৩২২), বৈ. প (পৃ-৫৫১), বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি (পৃ-১৬০, ৩৫২, ৪৫৬) ইত্যাদি গ্রন্থে পদটি মুদ্রিত হয়েছে। পাঠ—চলিলা নাগর রাজ ধনি দেখিবারে।" ক্ষণদায় পদটি মুদ্রিত হয়েছে—চলিলা রসিকরাজ ধণী দেখিবারে। পৃ-১৮১

৯। তুয়া প্রেম পদ সেবা এই ধন মোরে। -বি. ভা. পুঁ-৫০৬ (পুঁ. প-২ ; পৃ-২১১)

১০। দয়া কর ললিতা গোরি শ্রীরূপমঞ্জরি। „ ৫০৬

১১। ধাইয়া চলিল দূতি নাগরের পাশে। „ ৩৩৪৪

১২। প্রাণের হরি হরি এবার মোরে করহ করুণা। -বি ভা পুঁ ৫০৬ (পুঁ প-২ ; পৃ-২১১)

১৩। পিরিতি বেদাদি (?) লাগি সব তেয়াগিল। „ ৪৬৬৪-৮৫

১৪। মোনে পড়িল চাঁদ মুখানি। ৩৩৪৪

১৫। সকল ভকত লঞা ফাগুয়া খেলায়। ২২৬২

১৬। সুনইতে আক (?) মরম মরি জাত। ৩৩৪৪

১৭। হা হা প্রভু কর দয়া করুণা তোমার। ৫০৬ (পুঁ প-২ ; পৃ-২১১)

॥ রামচন্দ্র দাস ॥

১। নিরবধি রাইর কানুর ভাবনা মনে। বি. ভা. পুঁ-১৭৩৩

২। সজনি তোরা কত জানবি মুরিত। ১৭৭ক ; ৩৩৪৪

॥ রায়শেখর ॥

১। আমার বন্ধু সে পিরিতি জানে। -সিখর। বি. ভা. পুঁ-১৭৩২

২। এবে কি করব হরি করহ বিচার। শেখর। „ ২২৬২

৩। এ তুয়া চরণতলে হাম। কবিসেখর। „ ৩৩৪৪

৪। এ সখি রঙ্গিনি কি কহিব তোয়। কবিসেখর। „ ৩৩৪৪

—বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি (পৃ-১৪০) গ্রন্থে পদটি 'বিদ্যাপতি' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

৫। এলা ছান্দে কে না বান্ধে চুল। -রায়শেখর। বি. ভা. পুঁ-১৭৩৪

—কীর্তনানন্দ (পৃ-৩১৪), বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি (পৃ-৪৩৯), বৈ প (পৃ-৪০৭) ইত্যাদি গ্রন্থে পদটি 'জ্ঞানদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। —পাঠ— "এ না ছান্দে কে না বান্ধে চুল।"

৬। কেহ হঅ দাম শ্রীদাম সুদাম সুবলাদি প্রাণসখা। রায়শেখর। বি. ভা. পুঁ -১৭৩১

৭। জাবট স্থান পরম নির্জন। রায়-শেখর। বি. ভা পুঁ-৩৩৪৪

৮। তৈল আমলকি দিল সব সখি। শেখর। „ ৪৬৬৪-৮৫

৯। দুর হইতে সুস্বর সুনিতে পাইল কানু। সেখর। „ ১৭৩১

১০। বেণু লঞা জুথে জুথে চলিল ভাণ্ডীর পথে। রায়-সেখর। -বি. ভা পুঁ-১৭৩৩
১১। নাচত বিধুমুখি অঙ্গ বিভোল। সিখর „ ১৭৩২
১২। পতুমা দূতত্র বেগে পলাইতে বানরী……পায়। সেখর। „ ১৭৩৩
১৩। বিকশিত কুসুম ঝরই মকরন্দ। শেখর। „ ১৭৩১
—প. ক. ত (প. সং-২৪৯৮), বৈ প (পৃ-৭৫৩) গ্রন্থে পদটি 'বলরাম' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।
১৪। মাজল জতনে রসন দষনে শোধন মরিচ চুরে। শেখর। বি. ভা. পুঁ ৪৬৬৪ ৮৫
১৫। রাই অঙ্গ পরসিল বিদগধ রায়। রায়-শেখর। ৩৩৬৪
১৬। শ্রীরাধা কুঞ্জের সোভা মনোহর মনলোভা। সেখর। ১৭৩১
১৭। সখি রি তুমারি দুখের নাহি ওর। শেখর। বি. ভা. পুঁ-১৭৩৩
১৮। হরি হরি জীবন রহয়ে কত লাগি। রায়-শেখর। „ ১৭৩৩

॥ দীন কৃষ্ণদাস ॥

১। অবধৌত সঙ্গে পুত্র অম্বিকা নগরে। বি. ভা. পুঁ-২৩০৭
২। উদ্যান মাঝে অট্টালিকা সাজে। „ ১২৯৩ (পুঁ. প-৩ ; পৃ-৩৮৫-৮৮
৩। এই কৃপা কর মোরে অদ্বৈত নিতাই „ „ „
৪। কৃষ্ণলীলামৃত সার তার মত সত ধার। „ ৬০০৩-২৮
—এই পদটি গৌ প. ত (পৃ ২৩) 'কৃষ্ণদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।
৫। গর্ব্বহারি গৌর দীপ্ত গোরচনা। বি. ভা. পুঁ-১২৯৩ (পুঁ. প-৩ ; পৃ-৩৮৫-৮৮)
৬। গৌরদাস পণ্ডিতের বাড়ি নাচে গৌর। „ ৬০০৩-২৮
৭। ধরি লাক্ষারসে চিত্র করি। „ ১২৯৩ (পুঁ প-৩ ; পৃ-৩৮৫-৮৮)
৮। রঙ্গিনী মন্দিরে আনন্দ। „ „ „
৯। সুন শ্যামা সখি তুমার। „ „ „
১০। হা হা বিধুমুখি তুয়া সেবার লাগিয়া। „ „ „
১১। হে রূপমঞ্জরি সে দিন কি। „ „ „

॥ বল্লভ দাস ॥

১। আইশহ হারুয়া শ্যাম খেলাব ফাগুয়া। বল্লভ দাস। বি. ভা পুঁ-২২৬২
২। ঝুলত হে রাধা মাধব নিধুবন মাঝে। কবি বল্লভ। „ ১৭৩২
৩। হরি হরি বড় বিস্ময় মোর মনে। বল্লভ দাস। „ ১৭৩৩

॥ শিবরাম দাস ॥

১। ইহার লাগিয়ে বড়াই লোয়ে এলি সাথে। বি. ভা. পুঁ-১৭৩৪
২। কি কন মুরে বা (?) কি কন গো নন্দের গোবিন্দ। বি. ভা. পুঁ-২৩১
(পুঁ প-১ ; পৃ-১২৭)
৩। গৌউর হরি রে নদে চাঁদ রে
মায়ে সতো দণ্ডবত প্রণাম করিয়ে। বি. ভা. পুঁ-৮৭৩ (পুঁ প-২ ; পৃ-৮৭)
৪। বাজে গিরি গির দিমিদাং দিমি দাং। „ ২৯৪৭
৫। লাজ নাহি বাস কানাই লাজ নাহি বাস। „ ২৯৮ (পুঁ. প-১ ; পৃ৫৭)

॥ চম্পতি ॥

১। জলধর হেরি চান্দোয়া টাঙ্গায়ল। চম্পতি নাথ। -বি. ভা. পুঁ-৪০৫৫
২। মাধব তুজ্জ'য় মানিনি জানি। চম্পক নাথ। „ ৪৩৯৪
৩। রাধে কেমন কঠিন মন তোর। চম্পতি। „ ১৭৩২

—প. ক. ত (প. সং-৪৭৮) গ্রন্থে 'ভূপতি নাথ'-ভণিতায় একটি পদ আছে—"মাধব নিকট কঠিন মন তোর।" বিশ্বভারতী-সংগ্রহে প্রাপ্ত চম্পতির পদটি এই পদের প্রত্যুত্তর হওয়া সম্ভব।

৪। রাধে বুঝল তুয়া প্রতিভাতি। চম্পতি নাথ। বি. ভা পুঁ-৪০৫৫

—প্রায় অনুরূপ একটি পদ বিশ্বভারতীর ৬৭৮ সংখ্যক পুঁথিতে 'ভূপতি নাথ' ভণিতায় "সুন্দরি বুঝল তুয়া পিরিতি ভাতি"—রূপে পাওয়া যায়। (পুঁ প-২ ; পৃ-২২০)। আবার, বি ভা পুঁ-র ৫৪০৬ সংখ্যক পুঁথিতে 'ভূপতি-নাথ' ভণিতায় পাওয়া যায়। পাঠ—"সুন্দরি বুঝই

তুয়া প্রতিভাতি।" বি. ভা. পুঁ-৪৬৬৪-৮৫ সংখ্যাক পুঁথির পাঠ—'সুন্দরি বুঝলু তুয়া প্রতিভাতি"। ভণিতা—ভূপতিনাথ।

৫। হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথ। চম্পতি-পতি। -পৃ-৬৯খ; ৩৩৪৪

॥ ভূপতি ॥

১। অধর সুধারসে লুবধক মানস। সিংহভূপতি। -৩৯খ; ৩৩৪৪
—প. ক. ত (প. সং-১৯৮৮) ও বৈ. প (পৃ-৬৫৪) গ্রন্থে পদটি 'গোবিন্দ-দাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

২। গোসানি বেসে জাব সেই দেশে খুজিব জোগিনি হয়া। ভূপতি নাথ।
-বি. ভা. পুঁ-৪৭৫৬

৩। প্রথম ছাড় আড় রে অবহু গগন গম্ভীর। সিংহ ভূপতি। ৬২খ; ৩৩৪৪

৪। রাই ধরল জব গাড়.........মান। ভূপতি। বি. ভা পুঁ "

৫। সতবর পুটপাক তাপক সার। নরনারায়ণ ভূপতি বিজয়-নারায়ণ।
-বি. ভা পুঁ-৩৩৪৪, ৫৪৭৮

৬। সম্মুখে সুনাগর হেরি রহু রাধা। ভূপতি নাথ। -৩৩৪৪
—প ক. ত (প সং-২৮৮১), বৈ প (পৃ-৮৪০) গ্রন্থে পদটি 'কৃষ্ণকান্ত দাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। 'বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি' (পৃ-৩২৫) গ্রন্থেও পদটি 'কৃষ্ণকান্ত'-ভণিতায় পাওয়া যায়।

৭। সুন্দরী বুঝি কহবি কটু ভাসা। বি ভা পুঁ-১৭৩৩, ৫৪০৬
—পদটি বি ভা. পুঁ-র ৪৬৬৪-৮৫ সংখ্যক পুঁথিতে পাঠ আছে—"সজনি বুঝি কহসি কটু ভাসা।" এবং বি. ভা পুঁ-র ৬৭৮ সংখ্যক পুঁথির পাঠ—"সহচরি বুঝি কহবি কটু ভাসা।" -পুঁ. প ২; পৃ.২২০

॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

১। অনুভবি মালতি পরিমল রেহ। বি. ভা. পুঁ-৩৩৪৪

২। অপরূপ রূপ হেরি দুর সঞে। " "

৩। অষ্ট সখি পরে কুঞ্জয়ে নিকসল কান। " "

৪। আকুল অলক বেড়ল মুখশোভা। " "

৫ক। আচম্বিত জামিনিক পন্থ। -বি ভা. পুঁ-১৭৩২
৫খ। ইন্দুরেখা সখীগণে অম্বর দেই চরণে। „ „
৬। এ সখি কাহে তু পেখলি কান। „ ৩৩৪৪
৭। এ সখি কাহুক মুখ নাহি চাহ। „ ১৭৩৩
৮। কতএ বেরিব চরণে জরি সরস সরসিজ পাঁতি। „ ৩৩৪৪
৯। কহতহি সুন সুন যুগল কিশোর। „ „
১০। কহল মু তৈখনে·········দেখে কান। „ ১৭৩৪

—সংকীর্তনামৃত (পৃ-৪১২) 'গোবিন্দ দাস' ভণিতায় অনুরূপ একটি পদ আছে—"কহল মো খলজন দোখল কাহ।" বৈ প (পৃ-৬২৮) পদটি "কহলম খলজন দোখল কান।" —রূপে মুদ্রিত হয়েছে। পদটির শুদ্ধতর পাঠ নির্ণয় তুলনামূলক বিচার সাপেক্ষ।

১১। কটি তটে পিত পটাম্বর। বি ভা পুঁ ৩৩৪৪
১২। কনকাঙ্গদ সুন্দর বাহু যুগলে। „ „
১৩। কাঞ্চ[নি] উপেখি রাই খেতিতলে। „ „
১৪। কাঞ্চন নিঠুর চলতহি মধুপুর মঝুমনে এ বড় সন্দেহা। „ ১৭৩২
১৫। কানুক চিত থির করি সুন্দরি। „ „
১৬। কানু করে ধরি কহতঁহি কিসোরি। „ ১৭৩৪
১৭। কাঞ্চন কজ্জল পরণে তু লুটাওল। „ ৩৩৪৪
১৮। কি কহব রে সখি রজনীবিলাস। „ „
১৯। কুঞ্জয়ে নিকয়ল কান। „ ১৭৩২
২০। কোটী কুসুম শর জাহা পরি বরিখত। „ ৩৩৪৪
২১। গগনহি দিড়িক চান্দ। „ ১৭৩২
২২। গুরুআ নিতম্বভরে গতি অতি মন্থর। „ ৩৩৪৪
২৩। গোঠে গোঠ বলিচ গোপাল। „ „
২৪। গোরা লাখবান কাঞ্চন জিনি প্রেমে অঙ্গ গর গর। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৩
২৫। গুনে গুনে রে দোঁহার রূপ নয়নে গুনে। „ ১৭৮০
২৬। ঘন ঘন সুন্দরী তুয়া পথ জোই। „ ১৭৩৩
২৭। ঘন আন্ধিয়ার রজনি কাজর গরজত। „ ৩৩৪৪
২৮। চম্পক লতি য়তি সুমতি সুরিদ গতি। „ „
২৯। চান্দ উদয় কিএ কুমুদিনি মুদিত। „ „

৩০। চিত অতি চপল পিরিতি রিতি তোরী। -বি. ভা. পুঁ-৩৩৪৪
৩১। চিত্রা চকিত অতি সুশীতল বচনে। ,, ১৭৩২
৩২। জব রাই বিহুরল নাগর সঙ্গ। ,, ৩৩৪৪
৩৩। জগজন তারল সকল সংসার। ,, ,,
৩৪। জয় জয় নব নাগরী নিন্দি ইন্দি। ,, ,,
৩৫। জাগর পুনফলে প্রাথরে। ,, ,,
৩৬। জিবইতে জুবতি জপয়ে তুয়া নাম। ,, ,,
৩৭। টলমল অলকা তিলক ঝলমল। ,, ,,
৩৮। ডগমগি লোচন কমল ঢুলায়ত। ,, ,,
৩৯। ঢর ঢর পড়ু নয়নক লোর। ,, ,,
৪০। তরখি তরখি হর পরস করত গোরি। ,, ,,
৪১। তদধর মধুর মধু নিপিরন্তু। ,, ,,
৪২। তু পেখলি রাই জানি বর নাগর। ,, ,,
৪৩। তুঙ্গ ভঙ্গি করি তুঙ্গ বচন কহি। ,, ,,
৪৪। তু হো বর সুন্দরি। ,, ,,
৪৫। তুয়া হিয়া হার তটীনি তট কুচঘট। ,, ,,
৪৬। তুয়া রস সাগরে ডুবি মরত জনু। ,, ,,
৪৭। তুয়া মধু কমল চান্দ। ,, ,,
৪৮। তুহু জদি নী…………রসি মোয়। ,, ,,
৪৯। দণ্ডবৎ করি মায় চলিলা জাদবরায়। ,, ,,
৫০। দুর কর বহু দিন দুখ। ,, ,,
৫১। দুতি আসিঞা কহে কি করসি সোন্দরি। ,, ১৭৩২
৫২। দ্রুম পসু পাখিকুল পরম ব্যাকুল। ,, ৩৩৪৪
৫৩। ধনি ধরম নিজমন ধনি তোর। ,, ,,
৫৪। ধনি আশা আসী চলল বর চতুরিণী। ,, ১৭৩৪
৫৫। নটন হিলোল লোল মনিকুণ্ডল। ,, ৩৩৪৪
৫৬। নন্দ মোহন পুর বৈঠল অক্রুর। ,, ,,
৫৭। নাগর পড়িয়া নিপতলে। ,, ,,
৫৮। না জানিএ মাতল তাহা হরি কাহি জিউ কাঁপ। ,, ,,
৫৯। নিকেতনে বৈঠলি করতলে মুখশশি। ,, ,,

৬০।	নিসি দিশি সয়নে।	-বি. ভা. পুঁ-৪২৯৯	৪৩০৪
৬১।	নিরুপম হেম জোতি জিতিব বালা।	„	৩৩৪৪
৬২।	পুন উৎকণ্ঠিত করইতে কোর।	„	„
৬৩।	প্রাতরু জবহু চলব মথুরাপুর জব শুনব ব্রজনারি।	„	১৭৩২
৬৪।	পিঅ সখি তবহি কহত সব বিবরণ।	„	„
৬৫।	ফাগুশরে জর জর শ্যাম কলেবর।	„	১৭৩৪
৬৬।	বন্ধুআ বল এ ধনি।	„	৩৩৪৪
৬৭।	বিমুখ ভাবং পরিহরি সুন্দরি।	„	১৭৩১
৬৮।	বোলসি বোলহ কিএ হাম বলব।	„	১৭৩৪
৬৯।	ভাহু ভঙ্গিম নীপ সঙ্গীম ভাতি রঙ্গিম আনন।	„	১৭৩৩
৭০।	ভিতক নিত পুতলি হেরি।	„	৩৩৪৪
৭১।	মদন ভাণ্ডার তঞ্চ লুটাইলা।	„	১৭৩২
৭২।	মনরথে চড়লা সোই	—	„
৭৩।	মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন কুসুম গন্ধ মাধুরি।	„	৩৩৪৪
৭৪।	মাধব ইথে জনি বোলব আন।	„	„
৭৫।	মাধব অব তোহু সঙ্কর দেবা।	„	১৭৩১
৭৬।	মাধব অব নাহি জিঅত রাধা।	„	৪২৯৯-৪৩০৪
৭৭।	রাই অনাদরে কাতরে সুনাগর।	„	১৭৩২
৭৮।	রাইক কাতর বানি সুনইতে সহচরি।	„	৩৩৪৪
৭৯।	রাইক সঙ্গিনী রঙ্গ রসে রঙ্গিনী।	„	„
৮০।	রিতু পতি রজনি উজোর নহি।	„	১৭৩২
৮১।	লুনিক পুতুলি বালা।	„	৩৩৪৪
৮২।	সজনি কুসুম সেজ পুন সাজাই।	„	১৭৩২
৮৩।	সজনি সুনবি বচন হামারি।	„	৩৩৪৪
৮৪।	সব সখি মেলি সমুখে।	„	„
৮৫।	সব সখি মেলি সব সখীগণে······লাখ লাখ।	„	১৭৩২
৮৬।	সখী গণ বচনে শুনহি নাগর বর।	„	„
৮৭।	সহচরি সঙ্গে চলল বর নাগর।	„	„
৮৮।	সন্দেষ বেষ বলি আওত সঙকেত কলি নিকুঞ্জে।	„	„
৮৯।	সরে জর জর সাম নাগর বর।	„	„

৯০। সুরম্য রম্য নির্জন বনে। -বি. ভা পুঁ-১৭৩২
৯১। সো বহু গরবি গোপী মাঝে রমই। ” ১৭৩৪
৯২। সুন্দরি তুহে ভেল চণ্ডি বিভঙ্গ। ” ১৭৩১
৯৩। সেশ রজনি কুসুম শয়নে বৈঠলি দুহু জাগী। ” ১৭৩৩
৯৪। সমরয় বেস ভুসন ভুসিত। ” ৩৩৪৪

—‘বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি’ (পৃ-২৩৮) গ্রন্থে পদটি ‘রাধামোহন’ ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

৯৫। সখীগণ বাতে পুনহ নাগর বর। -বি. ভা. পুঁ-৩৩৫৪
৯৬। সুন সুন প্রাণবন্ধু নিবেদন করি। ” ”

—‘বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি’ (পৃ-৩২১) গ্রন্থে পদটি ‘বৈষ্ণবদাস’ ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

৯৭। হরি হরি ব্রজপুর সম্পদ কান। -বি. ভা. পুঁ-৩৩৪৪
৯৮। হরি হরি নিঠুর রসময় দে। ” ১৭৩২
৯৯। হে সখি মুঝে পরিখন কর দূর। ” ১৭৩৩
১০০। হিমবাহ নিসি দিসি বহ বাত। ” ৩৩৪৪

॥ গোবিন্দ দাস ॥

॥ সন্দিগ্ধ-পদ ॥ (গোবিন্দ দাস নামধেয় একাধিক অর্বাচীন কবি-রচিত)

১। আর গৃহে জাব না গো আর। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৪
২। এ বড়ি দারুন শেল ফুটিয়াছে বুকে। ” ৩৩৪৪
৩। কুবোল বলিবে জোদি মাথাতে ঢালিব দধি। ” ১৭৩৪
৪। কেনে কান্দহ গোপাল রে। ” ৩৩৪৪
৫। চল চল আর কেনে বিলম্ব। ” ১৭৩২
৬। নব কিসলয় তুলি সেজ বিছাহই। ” ৩৩৪৪
৭। নিতাই আর কত দূরে বিন্দাবোন। ” ১৭৩৪
৮। বাঁসী রব লাগিল কানে চিত্তে না ধৈরজ মানে। ” ১৭৮০
৯। বেজের হাট কি ভেঙ্গে এল্যা হে। ” ১৭৩২
১০। মাধব পিরিতিক ওর নাহি পাই। ” ৩৩৪৪
১১। সখির মাঝে রতন আসনে। ” ১৭৩১

১২। সজনি কো কহু আমার মাধাই। „ ৩৩৪৪
১৩। সাত পাঁচ সখির সঙ্গে নানা কথা কহে রঙ্গে। „ ১৭৩২

—'বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি' (পৃ-১৪৫, ৩৭৮) গ্রন্থে 'চণ্ডিদাস' ভণিতায় অনুরূপ একটি পদ মুদ্রিত হয়েছে—"সাত পাঁচ সখি সঙ্গে বসিয়া ছিলাম রঙ্গে।"

॥ ভণিতা-বিভ্রাট ॥

১। অনুখন কোনে থাকি বসনে আপনা ঢাকি। -বি. ভা পুঁ-১৭৩৩

—প. ক ত (প সং-৮৩৯) এবং 'বৈষ্ণব-গীতাঞ্জলি' (পৃ-৩৬৯) গ্রন্থে পদটি 'অজ্ঞাত' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। বৈ প (পৃ-১০৫৯) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে 'শ্রীনিবাস আচার্য' ভণিতায়। কিন্তু কোন্ পুঁথিতে উক্ত ভণিতা পাওয়া গেছে গ্রন্থে সে-সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। বিশ্ব-ভারতী সংগ্রহের (১৭৩৩) একখানি আদ্যন্ত-খণ্ডিত প্রাচীন পদ সংকলন গ্রন্থে পদটি 'গোবিন্দ-দাস' ভণিতায় পাওয়া যায়।

২। খেলারসে ছিলা কানাই রাখালের সনে। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩৪

—প. ক. ত (প. সং-১৩৫৪) ও বৈ. প (পৃ-৩১৮) গ্রন্থে পদটি 'রায়শেখর' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। বিশ্বভারতী পুঁথিতে পদটি 'গোবিন্দ-দাস' ভণিতায় পাওয়া যায়। 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে পদটি রূপান্তরে মুদ্রিত হয়েছে 'গোবিন্দদাস' ভণিতায়। পাঠ—"খেলারসে ছিল কৃষ্ণ ছিদামের সনে।" -প সং-৭৯০। গ্রন্থকারের মতে, পদটি 'গোবিন্দদাস' নামধেয় কোনো অর্বাচীন কবি-রচিত। আবার, 'রায়-শেখরের-পদাবলী' গ্রন্থে পদটি 'রায়-শেখর' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। পাঠ—"খেলারসে ছিলা কানাই শ্রীদামের সনে।" -পৃ ১৯। এমতাবস্থায় পদটির প্রকৃতি পদকর্তা নিরূপন তুলনামূলক আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

৩। ঘন ঘন নিপ সমিপঁহি শুনিয়ে। -বি. ভা. পুঁ ১৭৩২

—পদটি ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি (১৯।৯), গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁর যুগ' (প সং-৪০৭) গ্রন্থে 'গোবিন্দদাস'- ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। বিশ্বভারতীর প্রাচীন-পুঁথিতে পদটি 'গোবিন্দদাস' ভণিতায় পাওয়া

যায়। পক্ষান্তরে, বৈ. প (পৃ-২৯৪) গ্রন্থে পদটি 'গোবিন্দ-আচার্য' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে আকর-গ্রন্থ বা পুঁথির কোনো রূপ নামগন্ধ নেই। প্রাচীন ও প্রামাণিক সংকলন গ্রন্থগুলির পাঠ অস্বীকার করে বিশেষ কোনো পুঁথির পাঠ গ্রহণ করলে প্রমাণ করা উচিত যে, ওই পুঁথি পূর্বোক্ত মুদ্রিত প্রাচীন সংকলন গ্রন্থগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং পাঠ বিশুদ্ধতর।

তিল আধ সয়নে সপনে জোই। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩২ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

৪। ঝীঝলি বাজ নগরে মাহা তোই। -বি. ভা. পুঁ-৩৩৪৪
ঝীঝলি বাজ নগরে মাহা তোহি। " ১৭৩৩

—পদটি প. ক. ত (প. সং-১৮৯৫) ও 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে "ঝীঝলি রাজ নগর মাহা তোই" (প. সং-১৪৫) মুদ্রিত হয়েছে। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহের ২৪৪৩ এবং স ৩৩৯ সংখ্যক পুঁথিতে উক্ত পাঠ পেয়েছিলেন। বিশ্বভারতী সংগ্রহের দু'খানি প্রাচীন পদ সংকলন গ্রন্থে উপরোক্ত পাঠ পাওয়া যায়। উভয় পুঁথির লিপিকাল অজ্ঞাত হওয়ার কোন পাঠ বিশুদ্ধতর এবং মূলানুগ নির্ণয় করা যায় না।

৫। দেখ সখি অষ্টমী কি রাতি। -বি. ভা. পুঁ-১৭'১, ১৭৩২

—পদটি বিশ্বভারতীর একাধিক পুঁথিতে 'গোবিন্দদাস' ভণিতায় পাওয়া যায়। 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে 'গোবিন্দদাস' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে (প. সং-৪১)। পক্ষান্তরে বৈ. প (পৃ-২৯৫) গ্রন্থে পদটি 'গোবিন্দ আচার্য' ভণিতায় উদ্ধৃত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যরত্ন মহাশয় কোন্ পুঁথিতে এই ভণিতা পেয়েছেন—তার কোনো উল্লেখ নেই। রচনারীতির সাদৃশ্যহেতু পদটি গোবিন্দদাস-কবিরাজ রচিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। পদটির মুদ্রিত পাঠ—"দেখ সখি অটমীক রাতি।" বিশ্বভারতী পুঁথির পাঠ—"দেখ সখী অষ্টমী কি রাতি।" সম্ভবতঃ মূল পাঠ ছিল 'দেখ সখি অটমিক রাতি' পরবর্তি-কালে সংস্কৃতানভিজ্ঞ লিপিকরদের হাতে 'অটমিক রাতি' 'অষ্টমী কি রাতি'তে রূপান্তরিত হতে পারে। আবার, বিপরীত রীতি অনুসৃত হওয়াও অসম্ভব নয়।

৬। বিনোদিনী বিনোদ নাগর। -বি. ভা. পুঁ-১৭৩২

—এই পদটি প. ক' ত গ্রন্থে যথাক্রমে 'শেখর' (প সং-২৭৯০) 'রাধা-মোহন' (প. সং-১৫১৯) এবং 'যদুনন্দন' (প. সং-২৮৩৭) ভণিতায় উদ্ধৃত হয়েছে। বৈ. প (পৃ-২২৪৪) গ্রন্থে পদটি 'যদুনন্দন' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পদটির প্রকৃত পদকর্তা নিরূপন তুলনামূলক বিচারসাপেক্ষ।

॥ গোবিন্দদাসিয়া ॥

১। তুহু কাহে বিরস বচনে মোহে। পামরী গোবিন্দ। পৃ-১১৪;
বি. ভা. পুঁ-১৭৩২

২। সাম গেল মধুপুরি সঙ্গে বলরামে। পৃ-৮১; " "

॥ বংশীদাস ॥

১। কিসরি খেলএ ফাগু লঞা গোপীগণ। -বংসিদাস। -বি. ভা. পুঁ-৩৭৭০

২। চেতন পাইয়া রাই হিআ পানে চায়। " " ১৭৩২

৩। তেমনে পাইলাম পুরস্কার। " " ৩৩৪৪

৪। নিধুবন মাঝে তবে সব সখি মেলি। " " ১৭৩২

৫। বড়াই সে ধনি কহ কেহ বটে। " " ১৪৫৫

৬। বিনদিনি খানিক জুড়াহ তরুছায়। " " ১৭৩৪

৭। ব্রজভুমি মনে করি কান্দে পুন গৌরহরি। " " "

৮। মোহন বিজই বনে ঃ দুরে গেঁও সখিগণে। " " ৬৭৬

—সংকীর্তনামৃতে (প. সং-২৬২) পদটি 'যদুনাথ' ভণিতায় মুদ্রিত হয়েছে।

৯। রাজ আভরন লএ গোপীগণ কহে সুমধুর বাণী। বংসিদাস। বি.ভা. পুঁ-১৭৩২

১০। সরদ সুখদ সশী প্রফুল্লিত। " " ১৭৩৪

॥ অকিঞ্চন দাস ॥

১। ব্রজনারি বলিহারি হারিলে মুরলি। বি. ভা. পুঁ-৬০১৬

২। ......হাসে সব ব্রজনারি হারিলে সামবধূ। " "

॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ স্বরূপ ॥

১। এ হরী ব্রজপুরী নাগরী নাথ। -বি. ভা. পুঁ-২১৭১
২। নিরমল খলজন উজ্জ্বল চৌদিশ শারদ ঋতু পরকাশ। " "
৩। পহিলহি আঘন ভেল পরবেষ। " "
৪। বংশীবট যাবট যমুনাতট নিকট প্রকট কেলি কুটির। " "
৫। বিমল কমলদল আনন মণ্ডল কুণ্ডল শ্রুতি জুগ সাজ। " "
৬। মথুরা মণ্ডল শ্রীলা খণ্ডন যদুকুল কমল দিনেশ। " "
৭। যশোমতি অতি ক্ষীন লোচন বিহিন প্রতিদিন চৌগুন রোই। " "

॥ দ্বিজ মাধব ॥

১। বঙ্গে মদন রসে রসিক কানাই। দ্বিজমাধব -বি. ভা. পুঁ-২৩০৭
২। হেরি হাম জগ অনুপাম। " " "
৩। না বুঝিয়া নায় কেনে চড়। " " "
৪। এই সব রূপে জল বেহার করিয়া। " " "
৫। হোথা বড়াই গোপী সঙ্গে খুজে ঘরে ঘরে। " " "

॥ নির্ঘণ্ট ॥